নিশীথ কুহু

শুজা রশীদ

১

এবার শরৎ এসেছে খুব তোড়জোড় করে। হঠাৎ করেই যেন চারদিকে কেমন একটা রঙের বাহার ছড়িয়ে পড়লো। আলীর বাসায় মন টিকছিলো না। তেমন কোথাও যাবার জায়গা নেই; কিন্তু বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতেও ভালো লাগে বছরের এই সময়টাতে। চারদিকের সবুজ অরণ্য যেন কি এক জাদুবলে সাঁঝ আকাশের সবগুলো রঙ হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নিজ শরীরে সযত্নে প্রলেপ বুলিয়েছে। গাছের পাতায় পাতায় এতো যে রঙের বাহার হতে পারে তা এই শীতের দেশে না এলে কেউ জানতেও পারবে না।

খুব চুপচাপ পাড়াটা। ছিমছাম। শহর থেকে খানিকটা দূরে, প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে গড়ে উঠেছে এই জনবসতি। পাঁচ বছর আগে যখন এখানে বাড়ী কিনে এসেছিলো তখন সবেমাত্র গড়ে উঠছিলো, এখন যেন উপচে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমনে টরোন্টো ফুলে ফেপে উঠছে প্রতি বছর, মানুষ বেরিয়ে পড়ছে মূল শহর থেকে দুরে, ঘাটি পাতছে কাছের ছোটো ছোটো শহরে। তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ভীড় ভাট্টা ছেড়ে আলীও এই শহরে এসেছিলো। ছোট শহর - এজাক্স। মাত্র নব্বই হাজার মানুষের বাস। ঢাকায় বোধহয় ছোট এক পাড়াতেই তার চেয়ে বেশী মানুষ থাকে।

বাড়ীটা ছোট, কিন্তু সুন্দর। আলী পছন্দ করে। সে একা মানুষ, তার জন্য বিশাল বাড়ীর কোন প্রয়োজন নেই। বিশাল বাড়ী যার পছন্দ ছিলো সে আজ আর তার সাথে নেই। আলী সে সব কথা ভাবতে চায় না। সে বরং চারদিকের এই মনোরম প্রকৃতি উপভোগ করবে।

দরজায় তালা দিয়ে সামনের ছোট্ট আঙিনায় এসে দাঁড়ায় সে। বাড়ীর যত চাহিদা বাড়ছে ততই বিল্ডাররা জমির পরিমাণ ছোট করে আনছে। বাড়ীগুলোও চওড়ার চেয়ে উচ্চতায় বাড়ছে। তাদের লাভ বাড়ছে। নিজ বাড়ীর সামনের এই ছোট্ট আঙিনা দেখে মাঝে মাঝে একটু রাগ-ই হয়। সব মিলিয়ে হয়তো পনেরো ফুট বাই আট ফুট। কেন্টাকি ব্লু গ্রাস ভেদ করে অসংখ্য আগাছা উঠেছে। সকালে পরিষ্কার করলে বিকালে আবার গজিয়ে ওঠে। বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। গজা, যত পারিস গজা। সে ওসব নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবে না। আজ তো নয়ই।

সতেজ এক ঝটকা বাতাস মুখে নরম প্রলেপ বুলিয়ে যায়, কাছেই এস্পেনের (Aspen) জঙ্গলে ঝিরি ঝিরি ছন্দের দোলা ওঠে, সাদা কয়েক টুকরো মেঘ অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবার ব্যস্ত হয়ে তারা পাখা মেলে দিলো। বুক ভরে শ্বাস নেয় আলী। এখনো বাতাসে হীমটা আসেনি, কিন্তু গ্রীষ্মের সেই উষ্ণতা আর নেই। শ্বাস নিলে ঠান্ডা একটা অনুভুতি হয় গলায়, ভালো লাগে।

হাত বাড়িয়ে ঝাকিয়ে ওঠা লম্বা ফিদার রিড ঘাসের শরীরে পরশ বুলিয়ে দেয় ও। মানুষ সমান উঁচু ঘাসের উপরে শত সোনালী শিষের দুলুনি, হঠাৎ হঠাৎ ওর গালে আলতো করে ছুঁয়ে যায়। ভালো লাগে। সব কিছুতেই ভালো লাগার মত কিছু না কিছু আছে, নিজেকে বোঝায় ও। ভালো লাগাটাও গুণ। শুধু শুধু মন খারাপ করে থাকার কোন অর্থ নেই।

বাসার সামনে ছোট্ট বাগান। ডে লিলির ঝাঁক, নানান জাতের ব্লাক আই সুজান, কয়েক জাতের ডেইজী আর বেশ কয়েক ধরনের ওরনামেন্টাল ঘাস। শরতের শুরুতে ঠান্ডা পড়তেই অধিকাংশ ফুলই ঝরে পড়েছে। পড়শী কারো কারো আঙিনায় ডালিয়ার বাহার চোখে পড়েছে। একেকটা ফুল একেক রকমের চেহারায়, বর্ণে, বৈচিত্রে। নজর আটকে যায়। পরের বছর লাগাতে হবে। আলীর পছন্দ লম্বা ঘাস। বাতাসের দোলায় চিকন পাতার ঝাঁক যখন নানান ছন্দে এপাশ ওপাশ দোলে তখন তার ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ে যায়। দাদুর বাড়ীর পাশেই খালের কিনারা ধরে কাশবনের মাঝে পাগলা হাওয়া কেমন এক বন্য আবেগের সৃষ্টি করেছিলো। একবারই গিয়েছিলো, কিন্তু দৃশ্যটা চোখে লেগে আছে।

বিকেলটা যেন হঠাৎ করেই গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ছেলেমেয়েদের স্কুল খুলে গেছে। স্কুল থেকে ফিরে অধিকাংশই বাসাতেই থাকে। গ্রীষ্মের স্কুল বন্ধের দিনগুলোতে সমস্ত শহরটা যেন শিশু কিশোরদের ছুটাছুটি আর কলকাকলীতে সর্বক্ষণ মুখরিত হয়ে থাকতো। এখন তার কিছুই নজরে পড়ে না। শুধু কিছু বয়সী মহিলা ও পুরুষদেরকে ঢিমে তালে ফুটপথ দিয়ে হাঁটতে দেখে। আলী নিজেও তাদের পদাংক অনুসরণ করে। ওর বাড়ীর সামনের রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই বেশ বড়সড় পার্ক। নানান জাতের, নানান আকারের গাছ-পালায় ছেয়ে থাকা পার্কের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে পায়ে চলা পথ। মিনিট দশেক হাঁটলেই অন্য পাশের জনবসতিতে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

আলী এই এলাকার প্রতিটি গাছকেই কম বেশী চেনে। পড়শীর মানুষ সমান উঁচু জাপানীজ মেপলের পাতা রক্তিম হয়ে এক অপূর্ব রূপ নিয়েছে। সে ইচ্ছে করেই আলতো করে পাতার ঝাঁক ছুঁয়ে যায়। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা এতো গাছের ভীড়। ওদেরকে ঘিরে অন্তরে বাইরে কত ঘটনার প্রবাহ নিরন্তর বয়ে চলেছে, তার কিছু কি ওরা বুঝতে পারে? এই যে মহিরুহের মতো সুগার মেপল গাছটা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাতায় পাতায় টকটকে লাল থেকে দর্শনীয় কমলা রঙের বাহার, সে কি জানে তাকে দেখলেই আলীর কেমন একটা ভালো লাগার অনুভূতি হয়, অথবা ঐ বল্ড সাইপ্রাস গাছগুলো? কত ধরনের কত প্রকৃতির গাছ-ওক, এশ, পাইন, ডগউড, বার্চ, উইলো। সবার নাম ও জানেও না। কিন্তু প্রথম দেখাতেই তাদের প্রত্যেকের মাঝে ব্যক্তিত্ব দেখেছে সে, এক ঝলক বাতাসে তাদের সবাই নানান সুর ও ছন্দে দোলে, প্রখর সূর্যজ্বলা দিনে কেউ ঝকমকিয়ে হেসে ওঠে, কেউ আবার ঘন কালো মেঘলা দিনে।

দু'টি তরুণ-তরুণী ঘনিষ্ঠভাবে বসেছিলো ঘাসে, তাকে দেখে তাদের কোন বিকার হয় না। ছেলেটি আলতো করে মেয়েটির গোলাপ রাঙা ঠোটে আদর করে। চোখ ফিরিয়ে নিতে কষ্ট হয় আলীর। উষ্ণ, কোমল রমনীয় আদরের স্পর্শ কেমন সেটা সে একরকম ভুলতেই বসেছে। ছোট দু'টি চঞ্চল বালকের পিছু নিয়ে পাশ দিয়ে ছুটে যায় এক স্বর্ণালী চুলের যুবতী মা, তার পারফিউমের পুষ্পিত গন্ধে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে, অনাহারী শরীরের রক্তে আবেগের তাড়না জাগে, স্মৃতির পাতায় আতিপাতি করে খুঁজে সে পরিচিত কোন গন্ধকে মনে করতে চায়। কিন্তু পারে না। পিয়ার শরীরের গন্ধ এবং স্পর্শ তার আর মনে পড়ে না। তার ফেলে যাওয়া পারফিউমের বোতল সব পাড়ি জমিয়েছে আর্বজনায়। পিয়ার কিছুই নেই তার কাছে, শুধু স্মৃতি ছাড়া। সব কিছু সযত্নে বিদায় করেছিলো এক অহংকারী, কঠিন, দৃঢ়চেতা মহিলা। বানু মীর্যা। আলীর মা। সে অন্য কাহিনী। আলী মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তার স্রোতটাকে সরিয়ে দিয়ে আবার প্রকৃতিতে ফিরে যাবার চেষ্ঠা করে। বানু মীর্যা অথবা পিয়া মীর্যা সে কারো কথাই ভাববে না আজ অথবা কাল বা পরশু। অতীত কি পেছনে ফেলে যাওয়া যায়? চল্লিশ পেরিয়ে এসে কি নতুন করে আবার জীবন শুরু করা যায়?

সেল ফোনটা বাজছে। রিক্রুটার। আলী আই.টি.তে কাজ করে। টেকনোলজি। প্রযুক্তি। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং। টেস্টিং। সার্ভার। ক্লায়েন্ট। একই সাথে অনেকগুলো শব্দের স্রোত ওর মাথায় যেন জগা-খিঁচুড়ি পাকিয়ে তোলে। মাস দুয়েক ধরে সে কোন কাজ করে না। সাব-কন্ট্রাক্ট হিসাবে ছোট ছোট প্রজেক্ট করে। তিন মাস, ছয় মাস, তার উপরে নয়। একই পরিবেশ, একই কাজ, ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। রিক্রুটাররা নাছোড়বান্দা। ফোন করে উত্যক্ত করে। কেন কাজ করছো না? কত প্রজেক্ট আছে, জানো? ঘন্টায় ভালোই দেবে। ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করবো?

মনিকা সিং ভারতীয়। গুজরাটি। সুরেলা গলা। শুদ্ধ, সুন্দর ইংরেজি। কণ্ঠে একটা মোলায়েম তোষামোদি রয়েছে। হয়তো এভাবেই সে সবার সাথে কথা বলে। আলীর ভালো লাগে। গলা শুনে মনে হয় ত্রিশের উপরে হবে না বয়স। সুন্দরী? আকর্ষণীয়া? কোন কোন রিক্রুটার মুখোমুখি পরিচিত হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনিকা সিং সে প্রসঙ্গ কখনও তোলেনি।

"টিম লীড। করবে?" মনিকা তরঙ্গ তোলে কানে।

"সবাই মিলে যেভাবে জ্বালাচ্ছে, কাজে না ফিরে আর উপায় নেই।" আলী হালকা গলায় বলে। মনিকার সাথে দেখা হলে হয়তো মন্দ হতো না। "পেমেন্ট কেমন?"

"গত বারের মতই। তবে খুব তাড়াতাড়ি ইন্টারভিউ দিতে হবে। বহু ক্যান্ডিডেট আসছে। কাল বিকালেই ম্যানেজারের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারি।"

কাঁধ ঝাঁকায় আলী। আগে ঘরে বসে থাকার কথা চিন্তাও করতে পারতো না। ইদানীং কাজে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু জমানো টাকায় কতদিন আর চলবে? বাড়ীর মর্টগেজে অনেক টাকা গুনতে হয়।

"করো। কাজ হলে তোমাকে কফি খাওয়াবো।" লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলে আলী। কাউকে কফি খাওয়ানো দোষের কি আছে? যদিও বুদ্ধিমতী মেয়েদের ফন্দি বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

"দেখা যাবে। আগে তো ইন্টারভিউ দাও। তুমি যে খামখেয়ালি।" খিল খিল করে হাসে মনিকা।

বুকের মধ্যে তবলা বেজে উঠে আলীর। জীবন কি আবার নতুন করে শুরু করা যায়? খুব কি বয়স হয়েছে? দেখে কি বুড়ো মনে হয়? জুলফীর পাকা চুলে কি কলপ লাগাতে হবে? এক ঝলকের জন্য মাথার মধ্যে বেদনার একটি তীর এফোড় ওফোড় হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে- স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় ভালোবাসায় ঘেরা একটি সংসার থাকবে তার, অথচ তার কিছুই নেই। শুধু নিঃসঙ্গতা। আজ রাতে কি পিয়াকে আবার একবার ফোন করবে? পিয়া কখনই ফোন ধরে না। তার বাবা-মা ভদ্র ভাষায় পরে ফোন করতে বলেন। বানু মীর্যার এই যাত্রা শেষ হয়েছে তিন বছর আগে। তার পর বহুবার ফোন তুলে নিয়েছে আলী, কিন্তু পিয়ার মন গলেনি। সে কি তার মতই নিঃসঙ্গ? অনেকবার ভেবেছে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবে, মুখোমুখি দাঁড়াবে আবার। হয়তো তার মান ভাঙবে, অহংকারে চিড় ধরবে। সাহস হয় নি। দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেলো।

"ম্যানেজারের সাথে কথা বলে তোমাকে ইন্টারভিউয়ের সময়টা পরে জানাবো।" মনিকা সুললিত গলায় বলে, ফোন রাখার আগে।

আলী কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যায়। মনিকা ছেড়ে দিয়েছে। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। এই বয়সেও একজন অদেখা নারীর কণ্ঠ তাকে এভাবে কাঁপিয়ে যেতে পারে তার ধারণা ছিলো না। মাথা থেকে এই অযাচিত অনুভূতিটাকে তাড়ানোর জন্য হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। নিজের জন্য তার খানিকটা করুণাই হয়। চারদিকে এতো সুখী, পরিতৃপ্ত মানুষের মাঝে নিজেকে অবাঞ্চিত মনে হয়। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দূরে, অনেক দূরে কোথাও চলে যায়। অজানা কোন খানে, অচেনা কোন বনানীতে, জনবসতি থেকে দূরে। ইদানীং এই জাতীয় অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় জাকিয়ে বসছে, লক্ষ্য করে আলী। খুবই খারাপ লক্ষণ। ঘর-বাড়ী ছেড়ে সাধু-সন্যাসী হবার তার বাস্তবিক কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু চিন্তার স্রোত কি আর বাধা মানে।

বাসায় ফিরতে ফিরতে চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। এক ঝাঁক হাঁসের দল মহা শোরগোল তুলে ঠিক তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো। আনমনে কিছুক্ষণ তাদের উড়ে যাওয়া দেখলো আলী। কোথায় চলেছে কে জানে? গরমের দেশে পাড়ি জমাচ্ছে? নাকি এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে রাত-টুকুর জন্য নীড় পাতবে? বহু দিন আগের সামান্য একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। হেসে ফেলে আপন মনে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের গাছগাছালিতে ছেয়ে থাকা চত্বর ধরে হাঁটছিলো ওরা, সে এবং নিশি, পাশাপাশি, হাতে হাত ছিলো না কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ছুঁয়ে যাচ্ছিলো, নীল ফিনফিনে ওড়নার প্রান্ত আচমকা বাতাসের ঝট্‌কায় পিঠে বাড়ি দিচ্ছিলো, বাতাসে গন্ধ

ছিলো, হৃদয়ে ফুরফুরে অনুভূতি ছিলো, কোন এক হিংসুটে যুবকের মন্দ উক্তি পিছলে বেরিয়ে যায়। ঠিক তখন মহা শোরগোল তুলে দু'টি কাক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো, কিছু বুঝবার আগেই নাকের ডগায় নরম, উষ্ণ পদার্থটার স্পর্শ পায় আলী। নিশি কলকলিয়ে হেসে ওঠে। হাত বাড়িয়ে নাকের ডগা ছুঁতেই বিপদটা বুঝতে পারে আলী। হারামী কাক, আর জায়গা পেলো না। লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠেছিলো সেদিন। আজ কেমন একটা অসম্ভব ভালো লাগার অনুভূতি হলো। মনে পড়ে যায় হাসি থামতে নিশি তার নীল ওড়নার প্রান্ত দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দিয়েছিলো সেই বিষ্টা। আর কেউ কখনো তার জন্য এমন কিন্তু করেনি। শুধু তার মা ছাড়া, মা তো মা-ই। তার সাথে কারো তুলনা চলে না। বিশেষ করে সে যদি হয় বানু মীর্যা।

ভেতরে ঢুকে সবগুলো আলো জ্বেলে দেয় আলী। জীবন না থাকুক আলোয় ভরপুর হয়ে থাক। পিয়া আবার ভয়ানক হিসাবী ছিলো। একটার বেশী দুটা আলো জ্বালালেই বিরক্ত হতো, জ্ঞান দিতে শুরু করতো। *'সে কি জানে বিদ্যুৎ কত মুল্যবান? বিদ্যুতের অপচয় করাটা আদৌ উচিৎ নয়। কয়েক বছর আগেই সমগ্র টরোন্টো জুড়ে বিশাল ব্লাক আউট হয়েছিলো, সেই কথা কি মনে আছে? আবার তেমন হলে কি ভালো লাগবে?'* আলী আদর করে ডাকতো মাস্টারনী। পিয়া খুব রেগে যাবার ভান করতো কিন্তু কখনো মানা করেনি ডাকতে। স্কুলের শিক্ষিকা ছিলো, মাস্টারনী তো বটেই।

মাথা ঝাকিয়ে পিয়ার চিন্তা দূর করে। একা থাকার এটাই সমস্যা। অকারণে শুধু নানান জাতের স্মৃতি উঁকি দিতে থাকে। কারো সাথে কথা বললে ভালো লাগতো। বন্ধু কিছু আছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে কথা বলার মানুষ একজনই। বশীর ভাই। বয়সে কিছু বড়, আচরণে বাল সুলভ। স্বামী-স্ত্রীর ভয়াবহ ঝগড়ার মাঝে হো হো করে হেসে উঠে বলে উঠেন-নাটকীয় গলায় "রাগলে তোমায় কিন্তু ভারী ভালো লাগে প্রিয়াংকা"। ভাবীর নাম প্রিয়াংকা নয়, তার নাম লতা। প্রিয়াংকা বলিউডের নায়িকা, ভাবীর অপছন্দ। স্বভাবতই তার রাগের প্রকোপ বাড়ে। চমৎকার মানুষ।

আলী বশীরকেই ফোন করে। "বশীর ভাই! কেমন আছেন"?

উত্তর দেবার আগে কিছুক্ষন ঠা-ঠা করে হাসলো বশীর। "আর বলো না। জীবনটাকে বারো ভাজা করে ফেললো প্রিয়াংকা"। ঝমঝম করে কিছু একটা মেঝেতে পড়ার শব্দ হলো। "পাতিলের ঢাকনা। মিস। বাই টু ফুট।"

"বাবা তুমি থামবে? আমি পড়ছি।" ধমকে ওঠে একটা বালিকা কণ্ঠ। পরী। গ্রেড ফোর। মেজাজে সে তার মাকেও ছাড়িয়ে যায়।

বশীর ভাই মনে হয় ঝুলন্ত বারান্দায় বেরিয়ে আসে। "বলো ভায়া, খবর কি? মাঝে মাঝে এমন ডুব দাও কেন?"

"মনটা ভালো নেই ভাই।" একমাত্র বশীরের কাছেই নিজেকে মেলে ধরে আলী। ভাই-বোন বলতে তার কেউ ছিলো না, থাকলেও সে তাদেরকে কখনো জানেনি, দেখে নি। টরোন্টোতে ঘটনা চক্রেই বশীরের সাথে পরিচয় হয়। তার সহজ ব্যবহার ভালো লাগে। বছর ঘুরে গেছে তার পরে। চমৎকার একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে।

"চলে আসো। রাতে খেও এখানে।" বশীর আমন্ত্রণ জানালো।

"আজকে না।" সন্ধ্যা বেলার অতিথি দু'চোখের বিষ লতা ভাবীর, সে জানে। বাচ্চাদের লেখা পড়ার সময় কোন হুজ্জত তার পছন্দ নয়।

বশীর জোরাজুরি করে না। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সম্মেলন হচ্ছে, শুনেছো? খুব বড় অনুষ্ঠান হবে। হোমড়া-চোমড়া লোকজন আসবে। এই শনিবার। আসছো তো?"

"বাংলা কাগজে দেখেছিলাম। আপনি যাবেন?"

"সন্ধ্যায়। তখনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হবে। অনেক স্থানীয় শিল্পীরা থাকবে। আমি তোমার ভাবী আর পঙ্গপালকে নিয়ে যাবো।" পেছন থেকে ছেলেমেয়েদের তীব্র প্রতিবাদ কানে এলো। নুর এবং পরী পঙ্গপাল। বড় ছেলে নুর, গ্রেড সিক্সে। বশীর হা-হা করে হাসলেন। ছেলেমেয়েদের সাথে মধুর সম্পর্ক তার।

আলী জনসমাগমে সাধারণত যায় না। আচমকা কার মুখোমুখি পড়ে যায়, কি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এই সব ঝক্কি ঝামেলা সে চায় না। কিন্তু বশীর পরিবার কোথাও গেলে সে অবধারিত সেখানে হাজির হয়। নিজেকে এই পরিবারের একজন ভাবতে ভালো লাগে। বাচ্চাগুলোর সঙ্গ উপভোগ করে। লতাভাবী ভ্রু কুঁচকে যখন বলেন, "সখের দেউলিয়া!" তখন সে দু'কান পর্যন্ত হাসে। এতো বড় এই শহরে, লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে, এই তার ছোট্ট একখানি দ্বীপ। এরা তার নিজের মানুষ।

"শুনেছি দলাদলি আছে। ঝামেলায় জড়াতে চাই না।"

"তুমি যাবে গান শুনতে, দলাদলিতে তোমার কি?" বশীর জোর দিয়ে বললো। "কেউ তোমাকে জোর করে দলে ভেড়াবে না। চলে এসো। যাবার আগে ফোন দিও। এক সাথেই যাওয়া যাবে।

"ঠিক আছে।"

"আর সব ভালো? আবার কাজ নিয়েছো? ক'দিন হলো একেবারেই আসোনি। এই বাসায় আসার জন্য তোমার অনুমতির দরকার নেই। তুমি তো জানোই। মন খারাপ হলে চলে আসবে। একাকী বেশীক্ষণ না থাকাই ভালো।"

"একটা গান লিখেছি ভাই। সুর করে দিতে হবে।"

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলায় বিষয়বস্ত বুঝতে এক মুহূর্ত যায়। হৈ চৈ করে ওঠে সে। "দারুণ! তুমি সৃষ্টিশীল মানুষ, লিখে যাও, কবি। গীতিকার! তবে আমাকে সুর দিতে বলো না। সবাই কানে হাত দেবে।"

"আপনার সুরের তুলনা হয় না। অকারণে নিজেকে ছোট করছেন কেন। আসবো এর মাঝে একদিন।"

"তুমিই আমার সুরের একমাত্র সমঝদার। তোমার ভাবীতো আমার গান শুনে ইনসমনিয়াতে ভোগে।" বশীর হা হা করে উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠে। "নিয়ে এসো। কিছু একটা করা যাবে। প্রথম কয়েকটি লাইন বলো।"

"মন চায় কাউকে পাশে নিয়ে বসি

মন চায় কাউকে কাছে ডেকে বলি

কেন কর ভাবনা, কেন এতো দুখী

হারিয়েছো পথ কি, গহীন এই বনানী"

বশীর আনমনে গুনগুনিয়ে ওঠে। "আবার বলো"।

২

খানিকটা অনিচ্ছা নিয়েই ইন্টারভিউতে এসেছিল আলী। টরোন্টো ডাউনটাউন। ইউনিয়ন ষ্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। গাড়ী নিয়ে আসেনি। পার্কিং খরচ আকাশচুম্বী। ভীড়-ভাট্টাও অতিরিক্ত। Go Train এজাক্স থেকে টগবগিয়ে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে এক দৌড়ে চলে আসে ইউনিয়ন স্টেশনে। এক্সপ্রেস ধরলে ত্রিশ মিনিট। উঁচু মহীরুহের মতো দালানটাকে খুঁজে পেতে বিশেষ দেরী হয়নি। বে স্ট্রিটের উপর। চৌদ্দ তলায় উঠে লবীতে আধ ঘন্টা বসে থাকতে হয়েছে। তার ইন্টারভিউ নেবে যে ডিরেক্টর সে আসতে দেরী করেছে। শ্বেতাঙ্গ। বয়স হয়তো পঞ্চাশের কোঠায়। চাছা-ছোলা কথাবার্তা। বিড়বিড়িয়ে দেরী হবার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আলীকে ছোট একটা কামরায় বসিয়ে কফি আনতে চলে গেলো। পনেরো মিনিট পরে ফিরলো। হাতে ধুমায়িত কফি।

"চা, কফি, পানি?" প্রশ্নটা আলীকে লক্ষ্য করে।

"না। কিছু লাগবে না। একটু আগেই খেয়েছি।" অনেকদিন পর আবার ইন্টারভিউ দিতে এসে সামান্য একটু ভয়ই লাগছে, অস্বীকার করলো না আলী। সাধারণত কোথাও হাজিরা দিয়ে কাজ না পাওয়ার মতো ঘটনা খুব একটা ঘটেনি তার জীবনে, তবুও সেই সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিছুটা হলেও সম্মানে লাগে।

ভদ্রলোকের নাম স্টিভ আইসল্যান্ড। ঢ্যাঙা লম্বা, বিবর্ণ সোনালী চুল। ঘোলাটে চোখ। সশব্দে চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসলো। আয়েস করে কফিতে চুমুক দেয়। "মনিকার সাথে পরিচয় হয়েছে? মুখোমুখি।" সামান্য অপ্রস্তুত হয় আলী। এই ধরনের প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। "ফোনে আলাপ হয়েছে। মুখোমুখি দেখা হয়নি।"

"দারুণ দেখতে। চমৎকার ফিগার। বউ না থাকলে নির্ঘাৎ ঝুলে পড়তাম।" স্টিভ মৃদু গলায় টেনে টেনে হাসে। "তোমাকে সে খুব পছন্দ করে। অনেক ভালো ভালো কথা বলেছে। তোমার দায়িত্ব কি হবে জানো তো?"

"অল্পই। প্রাক্তন ম্যানেজার চলে যাওয়ায় তুমি কাউকে সেই পদে কয়েক মাসের জন্য নিতে চাও। মনিকা এটুকুই বলেছে"। আলী সত্য কথাই বলে। সে এক্সিকিউটিভ কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ করে। ছোট-বড় টিম ম্যানেজ করে।

স্টিভ পরবর্তী এক ঘন্টা ধরে তাকে কাজের ইতিবৃত্ত শোনাল। কোন প্রশ্ন করবার প্রয়োজনও বোধ করলো না। বিদায় নেবার আগে সংক্ষেপে জানতে চাইলো, "আগামী সোমবার থেকে জয়েন করো। HR কাগজ পত্র মনিকাকে পাঠিয়ে দেবে। রেট যা চেয়েছো পাবে। ঠিক আছে?"

শ্রাগ করে আলী। "না করবার তো কোন সুযোগ দেখিনা।"

"এখানে তোমার ভালো লাগবে। টিম ছোট কিন্তু খুব কাজের। সোমবারে পরিচয় হবে।"

ফিরতি পথে গদি মোড়া আসনে শরীর এলিয়ে দিয়ে বিস্তৃত লেক ওন্টারিওর কুলহীন পানির রাশিতে সূর্যের ঝিকমিকি দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে পড়ে আলী। কাজে যেতে তার ভালো লাগে। ব্যস্ত থাকা যায়। মাথায় স্মৃতিদের বিচরণ কমে যায়। কিন্তু ক'দিন যেতেই আবার একঘেয়েমিতে ভুগতে শুরু করে। এক জায়গায় বেশীদিন মন বসাতে পারে না।

এই কাজটা শুরুতে ছয় মাসের। বাড়তে পারে। কতদিন করতে পারবে কে জানে। মনিকা কফি খেতে যাবে তার সাথে? মনিকার জন্যই না হয় কাজটা নিয়ে নেবে সে। অর্থেরও দরকার আছে। মনের দুঃখে বনবাসে যাবার তার কোন ইচ্ছা নেই।

কন্ট্রাক্ট সাইন ঘরে বসেও করা যায় কিন্তু আলী মনিকার অফিসে ঢু দেবারই সিদ্ধান্ত নিলো। স্টিভের মুখ থেকে শোনার পর মহিলাকে দেখবার আগ্রহ তার অনেকগুণ বেড়ে গেছে। স্বাভাবিক পুরুষালী আগ্রহ - যুক্তি দেখিয়েছে সে। সফটওয়্যার কনসালট্যান্ট নামে একটা হেড হান্টার কোম্পানীর একাউন্ট ম্যানেজার

মনিকা। মূলত রিক্রুটার। আলীকে এক নজর দেখা দিয়েই সে উধাও হয়ে গেছে। খুব ব্যস্ত আজ। স্টিভ মিথ্যে বলেনি। লম্বাটে গড়ন, মডেল ফিগার, লম্বা লাল স্কার্ট আর সাদা টাইট শার্টে ছুরির মতো ধারালো লাগছে। বড় বড় কালো চোখ, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট। যেন বলিউডের নায়িকা। জাতিতে ভারতীয়। আলী সাহস করে কফি খেতে যাবার আহবান জানাবে ভেবেছিলো কিন্তু সুযোগই পেলো না।

"সরি, সরি আলী, দম ফেলার ফুরসত নেই। কফি খাবার আমন্ত্রণটা আপাতত জমানো থাক। হঠাৎ করেই বাজার যেন গরম হয়ে উঠেছে।" মনিকার ফোন বেজে উঠে। বিড় বিড় করে অজানা ভাষায় কথা বলে। হাতে নজর পড়ে আলীর। বিশাল একটুকরো হীরা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে অনামিকায়। কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ? নিজের অজান্তেই হিংসাবোধ করে আলী। পিয়াও সুন্দরী ছিলো। আরেকটু খাটো, ভারী, নাদুস নুদুস; কিন্তু খুব মধুর একটা হাসি হাসি ভাব সারাক্ষণ লেগে থাকতো মুখ খানাতে।

"আমিনা, আমার সহকারী।" মনিকা একটি রোগা তরুণীকে পরিচয় করিয়ে দেয়। "ওই তোমার কন্ট্রাক্টটা দেখছে"। আমিনাকে বললো "কাগজপত্র সব ঠিক করেই রেখেছি। আমার ডেস্কে একটা খয়েরী এনভেলাপে ঢোকানো। যেখানে সাইন করতে হবে ক্রস চিহ্ন দিয়ে রেখেছি।" আলীর সাথে আগ্রহে হাত মেলায়। "একটু অফিসের বাইরে যেতে হবে। রাগ করো না। তোমার কাগজপত্র সব ঠিকঠাক। ক'টা জায়গায় সাইন করতে হবে। আবার দেখা হবে।"

মনিকা হন্ত দন্ত হয়ে সিকিউরিটি ডোর পেরিয়ে লবী ডিঙিয়ে বাইরের করিডোরে উধাও হয়ে যায়। আমিনা মিষ্টি এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে কাগজপত্র আনতে চলে যায়। এই মেয়েটিও সুন্দর দেখতে। চিকন লম্বাটে মুখ, মায়াময় চোখ। হঠাৎ হঠাৎ দু'চোখে ঝিকিয়ে ওঠে উপচানো কৌতুকে। কোমর সমান চুল। মনের মধ্যে কেমন একটা আনচান করে ওঠে। কার মত যেন লাগে মেয়েটিকে। অনেক আগের দেখা এক কিশোরী। কৌতুক উপচানো টানা টানা দু'চোখে কৌতুহলের ঝিলিক। তার প্রথম প্রেম। রুবীকে ভোলা সহজ নয়।

ড্যানফোর্থ এভেনিউ আর ভিক্টোরিয়া পার্ক এভেনিউয়ের জংশনে বাংলাদেশীদের বেশ বড় সড় একটা আখড়া তৈরি হয়ে গেছে। কাছেই ক্রিসেন্ট টাউন এবং টিসডেলের উপরে সারি বেধে বহুতল এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আছে। সেখানে সব মিলিয়ে হাজার খানেক বাঙালী পরিবারের বসবাস থাকা অসম্ভব নয়। কাছেই একটি মসজিদও আছে, বায়তুল মুকাররম। অনেক মুসলিম বাংলাদেশীরা মসজিদের কাছাকাছি বাড়ী কিনেছেন। ড্যানফোর্থ এভেনিউ ব্যস্ত সড়ক। তার দু'পাশেই ছোট-বড় দোকানে মহা সমারোহ। রাস্তার উত্তর পূর্ব পাশটাতে সারি বেধে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী দোকান। গ্রোসারি, খাবার-দাবার, কনভেনিয়েন্ট স্টোর। ছুটির দিনগুলোতে মোটামুটি ভীড় লেগে যায়।

আলী কদাচিৎ এই এলাকায় পা রাখে। এজাক্স থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের রাস্তা, প্রয়োজন ছাড়া আসা হয় না। যখন ঘটনাচক্রে এসে পড়ে তখন অবশ্য ভালোই লাগে। বাংলাদেশের এতো পরিচিত মানুষ এই শহরে ঘাটি পেতেছে যে কারো না কারো সাথে দেখা হয়ে যায়ই। স্বল্প পরিচিতদের সাথে দেখা হলেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ঘনিষ্ঠদের সাথে সাক্ষাৎ হবার অর্থই হলো অপ্রীতিকর আলাপে জড়িয়ে পড়া। অনেকেই তার হাড়ির খবর ভালোই রাখে। কেউ যখন পিয়ার খবর জানতে চায় তখন বিব্রতই বোধ করে সে। পিয়া যে বছর পাঁচেকের উপরে সীমান্তের অন্য পাশে বসবাস করছে সেটা বলা যায় না। বললেই আরো দশটা প্রশ্ন উড়ে আসবে।

বাংলাদেশীদের অনেক অনুষ্ঠানই নিকটবর্তী একটি অডিটোরিয়ামে হয়। ৯ ডওস রোড। বাইরে থেকে ইটের দালানটাকে সুবিধাজনক মনে না হলেও ভেতরের বিশাল হলঘর এবং সংলগ্ন মাঝারী আকারের মঞ্চটা একেবারে মন্দ নয়। স্থানীয়দের জন্য ঝট করে হাজিরা দেয়াটাও সহজ। অনেকেরই গাড়ী নেই, থাকলেও পার্কিংয়ের অসুবিধার জন্য দূরে কেউই যেতে চায় না।

এর আগে দু'একটা অনুষ্ঠানে এখানে এসেছে আলী। কম করে হলেও বছর খানেক আগে। অনেকের সাথেই দীর্ঘদিন পরে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ঝুঁকিটা নিতেই হলো। বশীর ভাই সপরিবারে আসছেন। তাকে বিশেষ করে আসতে বলেছেন। এই বিশেষ অনুরোধের পেছনে যে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে ধারনাও করে নি সে। ইচ্ছে করেই বাসা থেকে দেরী করে বেরিয়েছিলো। দেশী মানুষদের সময় জ্ঞান দুনিয়া খ্যাত। বিকাল তিনটা বললে রাত নয়টার আগে কাক-পক্ষীরও টিকি দেখা যাবার সম্ভাবনা কম। আজকের অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছিলো দুপুরে। সে যখন সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো তখন বিকেল পাঁচটা।

প্রবেশ মুখটা একটু ছোটই। কিছু কম বয়সী ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা পেটাচ্ছে। বারো-তেরো হবে। বাবা-মায়ের সাথে না এলেই নয় তাই এসেছে কিন্তু মঞ্চের কোন অনুষ্ঠানেই তাদের কোন আগ্রহ নেই। ওদেরকে কাটিয়ে হলঘরের দিকে এগুলো আলী। কিছু মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে, কাউকেই পরিচিত মনে হলো না।

"এতো দেরী করলে?" বশীর তাকে দেখেই ছুটে এলো। "দুপুর বারোটায় আসার কথা। আর এখন বাজে পাঁচটা।"

"কখনইতো সময়মত শুরু হয় না ..... " আমতা আমতা করে আলী। "ভাবীরা এসেছেন?"

"সবাই এসেছে। ভেতরে বসেছে। এদের অনুষ্ঠানও একটু আগে শুরু হলো। মেয়েটাকে আধ ঘন্টা ধরে আটকে রেখেছি। ভেবেছিলাম তুমি এলেই মঞ্চে তুলবো। তোমার টিকি না দেখে এই মাত্র পাঠালাম।"

আলী তখনও হলরুমের ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়নি। বশীরের কথাবার্তা তার কাছে রহস্যময় মনে হলো।

“কার কথা বলছেন? পরী?”

“না রে ভাই, পরী হবে কেন? কান পেতে শোন” একটু চারদিকে চাপা গুঞ্জনের মাঝ দিয়ে চিকন, সুরেলা একটি কণ্ঠ কানে এলো এবার। কেউ গান গাইছে। প্রথম কয়েকটি মুহূর্ত সে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলো না। কণ্ঠস্বরও পরিচিত লাগছে না।

“চিনতে পারলে?” বশীর আগ্রহ ভরে জানতে চাইলো। শ্রাগ করলো আলী। গান থেমে গেছে। হলরুম ভর্তি মানুষ করতালি দিয়ে উঠলো। আলী ভেতরে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিলো, বশীর তাকে ঠেকিয়ে দিলো। “দাঁড়াও বৎস। এবার চিনতে পারো কিনা দেখি।”

করতালি থেমে গেছে। আলীর বিস্মিত দৃষ্টি দেখে বশীর হাসলো। তর্জনী তুলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করবার সংকেত দিলো। একই গায়িকা নতুন একটি গান ধরলো। গানের প্রথম লাইনটা কানে আসতেই জমে গেলো আলী। এটা কি সম্ভব?

দাঁত বের করে হাসছে বশীর। “কেমন বুঝলে? বেশ একটা চমক দিলাম, ঠিক কিনা?” তার মুখভাব দেখেই বোঝা গেলো ভেতরে ভেতরে সে বেশ রোমাঞ্চিত। তাকে দোষ দেয়া যায় না। কথাচ্ছলে নিজের পুরানো দিনের কথা তাকে কিছু কিছু বলেছে আলী। গায়িকার সুরেলা, দীপ্ত কণ্ঠ গেয়ে চলেছে,

মন বলে কিছু নেই, আছে শুধু যাতনা

ভালোবাসার কথা বলো, অভিমান বোঝ না

আলীর লেখা গান। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের। সে খ্যাতিমান গীতিকার নয়। তার লেখা গান রেডিও টিভিতে গাওয়া হয় না। গান লেখা তার সখ। ঘনিষ্ঠ মানুষদের সাথে ছাড়া অন্য কারো কাছে এসব সে প্রকাশ করে না। বিশেষ করে এই গানটি শুধু একজনেরই জানার কথা। আজ এতো বছর পর, এই দূর ভূমিতে কোথা থেকে এসে হাজির হলো সে!

বশীর মুচকি হাসলো। “চিনতে পেরেছো?”

“কবে এসেছে এখানে? কোথায় দেখা হলো আপনার সাথে?” আলীর বুকের মধ্যে ধুকধুক করতে থাকে। কত বছর দেখা হয়নি। আবার দেখা হবে ভাবেও নি।

“শুনেছি অল্প কিছুদিন হলো এসেছে। ওর মামা আমার কাজের সুত্রে বন্ধু। কথাচ্ছলে মেয়েটার নামটা বলতেই বুঝে নিলাম। যাও, ভেতরে যাও। ওকে অবশ্য কিছু বলিনি।”

“ও জানে আমি আসবো?”

“তোমাদেরতো ঝুট ঝামেলা ছিলো। তোমার মুখেই শোনা। বললে হয়তো আসতোই না। তোমার ইচ্ছে হলে গানের পরে গিয়ে দেখা করো। ভেতরে চলো। তোমার ভাবী আবার আমাকে খোঁজ করবে।”

বুকের কাঁপুনিতে নিজের কাছেই অবাক লাগে আলীর। সারাটা জীবন ধরে দেখছে এই মেয়েটাকে। আজ হঠাৎ এতো ভয় পাবার কি হলো? কত বছর দেখা হয়নি? তেরো বছর। গুটি গুটি পায়ে জনপূর্ণ হলরুমের ভেতরে পা রাখে সে। উজ্বল মঞ্চের মধ্যমনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসম্ভব লাবন্যময়ী একটি মেয়ে, বয়স হয়েছে, কিন্তু তার ছাপ পড়েনি কোথাও। তারুণ্যের সেই রোগাটে শরীর আর ছেলেমানুষী ভরা মুখখানাতে ভাসা ভাসা চোখ, পাতলা ঠোটের ফাঁকে আলতো করে ঝুলছে এক টুকরো হাসি, না আনন্দের, না বেদনার। ঘন কালো চুলের রাশি পিঠময় ছড়িয়ে দেয়া, নীল জরির কাজ করা জর্জেটের শাড়ীর সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে। মাইক্রোফোনটাকে মুখের খুব কাছে ধরে নরম কণ্ঠে গাইছে সে, ভালোবাসা-বেদনা-অভিমানের অভিব্যক্তি তার শ্যামলা মুখখানিতে ঘনঘন প্রলেপ বুলিয়ে চলেছে, দোহারা শরীরের ছন্দময় নড়াচড়া নন্দনীয় লাগে। আলী চোখ ফেরাতে পারে না। এতোগুলো বছর পেরিয়ে গেছে, অথচ নিশির কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোট। বহু বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে এমন দরদ দিয়ে গেয়েছিলো- মন বলে কিছু নেই, আছে শুধু যাতনা.....

আলী চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। এই মেয়েটিকে সে আজও অসম্ভব ভালোবাসে। পৃথিবীতে যদি প্রেমময় অনুভূতি দিয়ে কাউকে সে সত্যিকারভাবে চেয়ে থাকে, সে নিশি। সেই প্রগাঢ় অনুভূতি চাপা দেয়া সহজ নয়। নিশির সামনে গিয়ে দাঁড়ানোটা কি ঠিক হবে? অদ্ভুৎ কিছু করে বসবে না তো? চারদিকে কত জুনিয়র ছেলেমেয়েদের ভীড়। সবার সামনে হেনেস্থা হবার কি কোন প্রয়োজন আছে?

গান শেষ হয়। করতালিতে মুখরিত হয় হলঘর। নিশি অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে থাকে। বশীর ওকে আলতো করে খোঁচা দেয়। "যাও, কথা বলো। মঞ্চের পেছনে শিল্পীদের বসার জায়গা আছে। ওখানেই থাকবে।"

আলী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। একদিকে তার ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে নিশির সামনে দাঁড়ায়, অন্যদিকে ভাবে হয়তো চুপিচুপি বেরিয়ে গেলেই ভালো হয়। এই মাঝ বয়সে এসে আবার নতুন করে নাটক শুরু করবার কি কোন দরকার আছে? নিশির নিশ্চয় সুখী, ছোট্ট একটা পরিবার আছে। তার কাছে নিজেকে হেয় করবার কি প্রয়োজন।

বশীরকে হাত নেড়ে ডাকছে লতা। সে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলো। লতা তাকে দেখে হাত নাড়লো। নুর এবং পরী মায়ের পাশে রুষ্ট মুখে বসেছিলো। এসব দেশী গান-বাজনা তাদের আদৌ পছন্দ নয়। ব্যান্ডের তাল না শুনলে তাদের কোন কিছুই ভালো লাগে না। তারাও আলীকে দেখে মহা উৎসাহে হাত নাড়লো। অধিকাংশ সময়ে আলীই তাদেরকে রক্ষা করে। বাইরে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশী সংস্কৃতির হাত থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়। সেও পাল্টা হাত নাড়ে।

একজন উপস্থাপক মঞ্চে উঠে এসেছেন। স্থানীয় কয়েকজন লেখকের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হবে এবার। লেখকদেরকে মঞ্চে ডাকা হচ্ছে। কেউই তার পরিচিত নয়। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে ছোট ছোট পায়ে মানুষ জনের ভীড় ঠেলে মঞ্চের পেছন দিকে এগিয়ে যায় আলী। কিই বা আর হবে? নিজেকে

বোঝায় সে। এতো বছর পর নিশির সাথে দেখা করতে লজ্জার কি থাকতে পারে? তার মতো কি আর নিশি অতীত নিয়ে জাবর কাটছে? নিশ্চয় নয়।

মঞ্চের পেছনে তিন-চারটি ছোট ছোট ঘর। সেখানে নানান বয়সী শিল্পীরা ভীড় করে বসে আছে। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচবে-গাইবে। তারা অস্থির প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে। ওকে দেখে অনেকগুলো কৌতুহলী চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে থাকে। নিশিকে কোথাও দেখা গেলো না। সে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না আলী। হয়তো হলরুমের ভেতরে তার মামাদের সাথে গিয়ে বসেছে। সে বশীরদের খোঁজে যায়। সারি সারি চেয়ার সাজানো। বশীররা বসেছে সামনের দিকে। ভেতরে ঢোকার কোন উপায় নেই। চেয়ার ফাঁকা নেই। বশীরই বেরিয়ে এলা। "ওরা তো চলে গেলো"।

শ্রাগ করলো আলী। "মন্দ কপাল। পরে দেখা করা যাবে। টরোন্টোতে বেড়াতে এসেছে?"

"নাহ। একেবারে ইমিগ্রেশন নিয়ে এসেছে। একটা মেয়েও আছে"।

"মেয়ের বাবা?"

"ডিভোর্সড।" বশীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওকে পরখ করলো "খবর নেবো?"

"না, না, না।" বিব্রত বোধ করে আলী। "সারাটা জীবন জ্বালিয়েছি, আর না। আমি যাই। পরে ফোন দেবো।"

"চলে যাবে কেন? থাকো। অনেকেই আসবে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো নাকি?"

আলী তার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে বেরিয়ে আসে বাইরে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। শান্ত, সুনসান। রাস্তায় কিছু গাড়ীর চলাচল। স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠছে। গাড়ীতে ফিরে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকে। পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে এই শহরেই এসে হাজির হলো নিশি। বলেছিলো আর কখনো আলীর মুখ দেখবে না। যা অভিমানী! একবার রাগ হলে যেতেই চাইতো না। একবার রাগ ভাঙাতেই ঐ গান লেখা।

তার খারাপই লাগছে। নিজের ঘর ভেঙেছে, ভাঙুক। কিন্তু নিশিরও একই পরিণতি কি করে হলো? দেশ ছেড়েছিলো তেরো বছর আগে, আর কখন ফিরে যায়নি। মাকে এনেছিলো এখানে। কে কিভাবে আছে জানতে চায় নি। না নিশির কথা, না রুবীর কথা, না মিঠুর কথা। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। অভিমান তারও কম নেই। নইলে এতো প্রিয় মানুষগুলোকে কিভাবে এতোগুলো বছর ভুলে থেকেছিলো?

৩

রাতে এমনিতেই ঝট করে ঘুম আসে না। ইদানিং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। মাঝরাত পেরিয়ে যায়, একাকী বিছানায় শুয়ে হাজারো চিন্তায় হারিয়ে যায় আলী। কত ছোট ছোট ঘটনা মনে পড়ে যায়। ছোট বেলার, তারুন্যের, যৌবনের। প্রৌঢ়ত্বের প্রথম সিড়িতে পা দিয়েও হৃদয়ে সে যেন জাপটে ধরে আছে অতীতকে, স্মৃতির পাতায় আটকে গেছে তার সময়। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, চোখ বুজে কত কথা কত ছবি বুঁদ হয়ে স্মরণ করে সে, মনের নিভৃতে ছায়াছবির মতো চলতে থাকে ঘটনা প্রবাহ। পিয়া চলে যাবার পর সে নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, মা মারা যাবার পর সম্পূর্ণ একাকী। ভাবনাতেই সময় কাটতো। এখন আর তাতেও কাজ হয় না। যার কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিলো, হয়তো অনেক খানি ভুলে গিয়েওছিলো, তার সব স্মৃতি হঠাৎ বিশাল শোরগোল তুলে তার হৃদয়ের দুয়ারে হানা দিতে থাকে। আলী অসহায় বোধ করে। সে বোঝে না কি করবে। কি করলে ভালো হবে?

নিশির সাথে দেখা করবে? নিশি কি কথা বলবে? এড়িয়ে যাবে? ভাগ্যের এমনই লিখন, এই মেয়েটার সাথে তার যখনই দেখা হয়েছে তখনই কোন একটি অঘটন ঘটেছে। এমন সব ঘটনা যা তাদের উভয়ের জীবনেই কুৎসিৎ পদচিহ্ন এঁকে গেছে। আবার কি সেই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে? বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে বিরক্ত হয়ে যায় আলী। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উঠে বাড়ীময় পায়চারি করতে থাকে। লম্বা করিডোর পেরিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি। করিডোরের পাশ ঘেষে পাশাপাশি তিনটা কামরা। মাস্টার বেডরুমটা একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত বড়। অন্য দুটি কামরা বেশ ছোটই। একটা কুইন সাইজ বিছানা ঢোকানোর পর খুব বেশী জায়গা থাকে না। সিঁড়ির পাশের কামরাটা সবচেয়ে ছোট। একটা সিঙ্গেল খাট পাতা, আসবাব পত্র বলতে আর কিছু নেই। তার মায়ের ঘর।

দরজাটা খুলে প্রবেশ মুখে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে আলী। মায়ের মৃত্যুর পর কিছুই বদলায়নি ও। তিন বছর হলো। তাপসীর জীবন যাপন করতো বানু। যেটুকু না হলেই নয়। সবচেয়ে কম মূল্যের কাপড় পরেছে, সামান্য খেয়েছে, ছেলের কাছে কখন কোন আব্দার করেনি নিজের কোন চাহিদা নিয়ে। দুঃস্থ মেয়েদের সেবা করবার জন্য নানান ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলো। সেই কারণেই মাঝে মাঝে হাত পেতেছে। আলী কখন জানতে চায়নি। জ্ঞান হওয়া অবধি একটি স্বল্পবাক, অভিমানী, অহংকারী নারীর সমস্ত জীবন তাকে ঘিরে আবর্তিত হতে দেখেছে সে। সেই মানুষটিকে আঘাত দেবার কথা, তার যে কোন অনুরোধে সম্মতি না দেবার কথা সে চিন্তাও করতে পারেনি।

নিঃশব্দে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে আবার পায়চারি করতে থাকে আলী। বানু ধর্মপ্রাণ ছিলো। পৃথিবীতে যা সে পায়নি তার প্রতিটি কণা অজানা কোন এক জগতে গিয়ে পাবার বাসনায় গভীর আগ্রহে সৃষ্টিকর্তার নাম জপেছে, কত রাতের প্রহর কাটিয়েছে চোখের জলে। কেউ দেখেনি। আলী বুঝেছে। সেও দেখেনি। বানু

ছেলের কাছে নিজের দূর্বলতা কখনও প্রকাশ করেনি। এমন দৃঢ়তা সে কোথায় পেত? আলী জানে না। গরীব বিনীত স্কুল শিক্ষকের ক্লাশ এইট পাশ মেয়ের এতো মনের জোর কিভাবে হতে পারে সে আজও বোঝে না। সাঁইত্রিশ বছর ধরে তাকে ঘিরে যার জীবন আবর্তিত হয়েছে তার কতটুকুই বা সে জানে?

রাত ভোর হয়ে যায়। পাখীরা ডাকতে থাকে। কাছের বনানীতে জেগে উঠতে থাকে আলো, শব্দ আর জীবনের সম্মিলিত মুর্ছনা। ভোর হচ্ছে। দোতালায় ছোট্ট একটা বেলকনি আছে। সেখানে বেরিয়ে আসতে এক ঝলক শীতল হাওয়া ঝাপটা দিয়ে যায়। ভালো লাগে। পৃথিবীর জেগে ওঠা দেখতে তার সবসময়ই ভালো লাগে। গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট সব কিছু যেন ঘুমের পর আড়মোড়া ভেঙে আরেকটি নতুন দিনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, নতুন কিছু ঘটবে সেই আশায় আঁধার পেছনে ফেলে নতুন আলোর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। কেন সে নিশির সামনে আবার দাঁড়াবে না? তেরো বছর পরেও চোখ বুজলেও যার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায় কেন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে না-ভালো আছো, নিশি?

আজ সূর্য ওঠে না, চারদিক উজ্বল রোদে ঝকমকিয়ে ওঠে না। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মুখ তুলে জমে থাকা কালো মেঘের সারিতে চোখ বোলায় আলী। হয়তো দু'এক পশলা বৃষ্টিও হবে। নিজের মনেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। আমরা চাই বলেই প্রতিটি সকাল আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠবে তেমন কোন কথা নেই। কত অসংখ্য বস্তু এবং নির্বস্তু দিয়ে গড়া এই মহাবিশ্ব, কত জানা-অজানা, চেনা-অচেনা, দেখা-নাদেখা অস্তিত্ব প্রভাবিত করে আমাদের প্রকৃতি, জীবন।

যা হবার হবে। নিশির সাথে তার দেখা হতেই হবে। আবার।

কাজে যোগ দেবার দু'ঘন্টার মধ্যেই আলীর মনে হলো, ভুল করেছে। কয়েক মাস বাসায় বসে অলস দিন কাটিয়ে হঠাৎ আবার ব্যস্ততার মধ্যে এসে একটু হঠচকিয়েই গেলো। স্টিভ তার ডেস্কের উপর আট-দশটি বিশাল আকারের ফোল্ডার ধাম করে ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। একটি তরুণ চশমাধারী চীনা পুরুষ তার buddy। অর্থাৎ সেই তাকে এখানকার পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে, মানুষজনের সাথে আলাপ করিয়ে দেবে। ছেলেটা গম্ভীর, চশমার পেছনে বিরক্ত দৃষ্টি। বিরক্ত নয়, দেখায় ওরকম। বুঝে নিয়েছে আলী। কিন্তু ছেলেটি চমৎকার কথা বলে, ঝরঝরে ইংরেজি। বোঝাই যায় এই দেশে বড় হয়েছে। আলীর টিমে পাঁচ-ছয়জন মেম্বার আছে। এই ছেলেটি তাদের একজন। তার নাম টম লি।

টম নীচু স্বরে কথা বলে, ইংরেজি পরিষ্কার কিন্তু সব কথা শোনা যায় না। বার বার জিজ্ঞেস করতে হয়। কি বিপদ! একে একে টিমের বাকীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো টম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে সবাই। নুরজাহান মাঝ বয়সী, ভারতীয় মুসলিম। হাসিখুশী বরিস জাতে রাশিয়ান হলেও এদেশে এসেছে বছর বিশেক আগে। কথা বলতে শুরু করলে থামানো কষ্ট। রিয়ানা তরুণী, মাত্র ইউনিভার্সিটি শেষ করে

মাসখানেক হলো যোগ দিয়েছে, তার লাজুকতা এখনো কাটেনি। পরিশেষে ফায়েজ - মধ্য বিশ, চটপটে, স্মার্ট। কিন্তু দশ মিনিটেই আলী বুঝে গেলো এই ছেলে চরম ফাঁকিবাজ। নুরজাহানকে প্রথম দৃষ্টিতে নিখুঁত মনে হলেও শীঘ্রই সমস্যা ধরা পড়লো। দু'ঘন্টায় আলীর নাম সে কম করে হলেও তিনবার জানতে চাইলো। স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট প্রখর নয়-বুঝে নিলো সে। চমৎকার! স্টিভ কেন ঝটপট সটকে পড়েছে বোঝা গেলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ফাইলের জঙ্গলে মাথা খুটলো আলী। বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট অসমাপ্ত। নষ্ট করার মতো সময় নেই। নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ভালোই হবে। কাজে মন বসলে অর্থহীন চিন্তা ভাবনা বিদায় হবে। নিশির কথা ভোলার চেষ্টা করে লাভ হলো না। যতই চেষ্টা করে ততই যেন মেয়েটার চিন্তা মাথায় জাঁকিয়ে বসে।

সপ্তাহ খানেক অনেক ধৈর্য ধরে নিজেকে বিরত রাখলো শেষ পর্যন্ত কৌতুহলের জয় হলো। এতো বছর ভেবেছে দূরে আছে দূরেই থাক, খবর নেবে না। এখন একই শহরে বসবাস। মুখোমুখি হবার আগ্রহই প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। নিরুপায় হয়ে বশীরকে ফোন করলো। বশীর যেন জানতোই। পাঁচ মিনিট ধরে আলীকে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিলো সে। "ফালতু কথা ছাড়ো। বলো কি চাও।"

কেশে গলা পরিষ্কার করে আলী। "নিশির মামার সাথে একটু দরকার ছিলো। ভদ্রলোক ব্যাংকে কাজ করেন, তাই না?"

বশীর হেসে ফেললো! "আমার কাছে এসব ভনিতা করে লাভ আছে? কাগজ কলম আছে? ফোন নাম্বারটা লিখে নাও। ভদ্রলোকের সাথে আমার পরিচয় স্বল্পই। কোথায় থাকেন, জানি না।" ফোন নাম্বারটা লিখে নেয় আলী।

ফোন নাম্বারটা দু'দিন পকেটে নিয়ে ঘুরলো আলী। সাহস জোগাড় করতে সময় গেলো। তেরো বছর পর নিশি কথা বলবে কি? কি নিয়ে কথা বলা যায়? কেমন আছো? কি করছো? আমি ভালো। আর কি? ভেবে ভেবে মাথায় ব্যথা ধরিয়ে ফেললো। শেষ পর্যন্ত দুঃসাহস দেখিয়ে নাম্বারটা ডায়াল করলো। চল্লিশে এসেও বুকটা এমন ধুকধুক করবে ভাবাই যায় না।

একজন বয়সী ভদ্রমহিলার কথা কানে ধাক্কা দিলো। ক্ষণিকের দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর লজ্জার মাথা খেয়ে নিশিকে চেয়ে বসলো। ভদ্রমহিলা বোধহয় একটু ভড়কে গেলেন।

"নিশিকে চান?" নিশ্চিত হবার জন্য।

"জ্বী। আমার নাম আলী। আলী মীর্যা"।

"একটু ধরুন। নিশি! এই নিশি!" ভদ্রমহিলার কণ্ঠে তাগিদ। বোঝা গেলো তিনি রোমাঞ্চিত।

প্রায় পাঁচ মিনিট ফোন কানে নিয়ে বসে থাকলো আলী। অন্য প্রান্তে টুকরো টুকরো শব্দ শোনা গেলেও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলাও ফিরে এলেন না। নিশির কোন নাম গন্ধ নেই। আরো মিনিট খানেক পরে কেউ দ্রুতপায়ে হেটে এসে ফোনটাকে ক্রাডলে রেখে দিলো, শব্দ শুনে আন্দাজ করলো আলী। লাইন কেটে গেলো। সব জল্পনা কল্পনার অবসান হলো। নিশি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলো এই সব আদিখ্যেতা সে বরদাশত করবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো আলী। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। কথা বলতে চায় কিন্তু ভয়ও লাগে। কিশোরের প্রথম প্রেমের মতো লাগছে। হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেলো না।

সপ্তাহ খানেক ঘুরে গেলো। কাজ, বাসা, ভাবনা - নিশি, নিশি, নিশি। বিরক্ত হয় নিজের উপর। এ কি যন্ত্রণা! হয়তো নিঃসঙ্গতাই এই জন্যে দায়ী। পিয়াকে ফোন করে লাভ নেই। সেও কখনই ফোন ধরে না। পৃথিবীতে নিরীহ মানুষ হয়ে কোন লাভ নেই। কারো কাছে কোন মূল্য নেই। বেছে বেছে সবাই অভিমান দেখানোর জন্য এই গোবেচারা মানুষগুলোকেই খুঁজে বের করে।

একদিন কাজে ফোন করলো বশীর। সেল ফোনে। রিং শুনেই বুঝেছিলো বন্ধুদের কেউ। বশীরকে দু'মিনিট পরে ফোন করতে বললো। নুরজাহান তার সামনে গোবেচারা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তার সমস্যার সমাধান না করে উপায় নেই। সমস্যাটা ভয়াবহ। মাত্র মিনিট দশেক আগে নিজের ডেস্কে বসে জরুরী কাজ শেষ করবার চেষ্টা করছিলো। ডায়াবেটিস আছে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে হলো। ফিরে এসে আর কম্পিউটারে লগ-ইন করতে পারছে না। পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে। স্মৃতি থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। অথচ আধা ঘন্টা আগেও মনে ছিলো।

আলী নুরজাহানের সুপারভাইজার। IT help desk এ ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে পাসওয়ার্ড রিসেট করার ব্যবস্থা করে দিয়ে তবে নিস্তার। বশীরকে ফোন করলো।

বশীর কৌতুহলে ফেটে পড়ছিলো। "কিছু হলো? ফোন করেছিলে?"

সত্য ফাঁস করলো আলী। বশীরের কাছে লজ্জার কিছু নেই।

"কপাল মন্দ ভায়া।" বশীর হাল্কা কণ্ঠে বললো। "তোমার কপালে রুপসী ললনা নেই। শূন্য ঘরে একলা মনেই দিন কাটাও।"

"চেষ্টা তো করলাম। কথা বলতে না চাইলে কি করবো?"

"কি করবে তুমিই জানো। ঠিকানাটা পেয়েছি, চাইলে দিতে পারি। তোমার ভাবীকে আবার বলো না। ভাববে এই বয়সে ছুঁড়িদের পেছনে ছুটছি।" হা হা করে হাসলো।

আলী ঠিকানাটা লিখে নিলো। ফোন করতেই শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়, বাড়ীতে গিয়ে হাজিরা দেবার আগে হার্টফেল হয়ে যাবে। তবুও নিয়ে রাখে। সাহসে কুলালে না হয় একবার ধর্না দেবে। নিশিইতো। আর তো কেউ নয়। আজকের জানা শোনা!

নিশির সাথে তার কখনই যথার্থ অর্থে পরিচয় হয়নি। নিশি ছিলো রুবীর ছোট বোন। ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষা দেবার জন্য কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলো আলী। সে চায়নি। অনেক টাকার ব্যাপার। বানু জেদ করেই তাকে ভর্তি করায়। আলীর আত্মবিশ্বাসের উপর আস্থা রাখতে চায়নি সে। ক্যাডেট কলেজে আলীকে যেতেই হবে, তাকে অনেক উপরে উঠতে হবে। আর্মিতে যেতে হবে, জেনারেল হতে হবে। জেনারেল আলী মীর্যা। মীর্যা বংশের গর্ব; কিন্তু সেই বংশের কেউ কখনো তাতে শরীক হতে পারবে না। বানুর জীবন সহজ ছিলো না। বড় হবার সাথে সাথে অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছিলো আলী।

কোচিং সেন্টারে মিঠুর সাথে পরিচয়। আলী সেন্ট জোসেফে পড়তো, মিঠু জেলা স্কুলে। বাঁদরের হাড্ডি; কিন্তু মেধাবী ছিলো। চরিত্রে দু'জন দুই মেরুর হলেও কোন এক অজানা কারণে অচিরেই বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। মিঠু বকবক করতো। আলী নীরবে শুনতো। সম্ভবত বন্ধুত্বের সেটাই প্রধান কারণ হবে।

মিঠুর দূরসম্পর্কের খালাতো বোন রুবী। বছর খানেকের ছোট। সারাক্ষণ রুবী-রুবী করতো মিঠু। বারো বছর বয়স হলেও তখনও মেয়েদের নিয়ে তেমনভাবে ভাবতে শুরু করেনি আলী। মিঠু রুবীর প্রেমে গদগদ। কথাবার্তা শুনে কৌতুহল জাঁকিয়ে বসলো। দেখতে চাইলো রুবীকে। মিঠু এক পায়ে খাড়া।

ছোট শহর খুলনা। মিঠুর মতো ডানপিটে, চঞ্চল ছেলেকে অনেকেই চেনে। তার বাবাও ডাকসাইটে উকিল। শহরের তাবৎ রিক্সায়ালারাও চেনে। রাজনীতিও করেন। মিঠুর সাথে ঘোরাফেরা করাও ইজ্জতের ব্যাপার। এই ছেলের সাথে তার বন্ধুত্ব ভাবতেও কষ্ট হয় আলীর। কোচিং ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে টুটপাড়ায় রুবীর বাসায় গিয়ে হাজির হলো ওরা একদিন। ঝকমকে বিকেল ছিলো। বোধহয় আগেই বলে রেখেছিলো মিঠু। সদর দরজায় ধাক্কা না দিয়ে এক পাশের উন্মুক্ত লোহার গেট পেরিয়ে সিঁড়ি টপকে সোজা ছাদে উঠে গিয়েছিলো ওরা। একতলা বাড়ীর খোলামেলা ছাদ। রুবী তার এক বান্ধবীকে নিয়ে অপেক্ষায় ছিলো।

শেষ বিকেলের রক্তিম আলোয় রুবীকে অপ্সরীর মতো লাগছিলো। একহারা লম্বাটে গড়ন, টানা টানা চোখ, টিকালো নাক, নিটোল থুতনীতে পাগল করা টোল, পিঠময় ছড়ানো সযত্নে আচড়ানো সটান চুলের

রাশি এবং গোলাপী পাতলা দুই ঠোটের ফাঁকে মধুময় এক টুকরো হাসি ছুরির মতো বুকের মধ্যে খোঁচা দেয়। এক মুহূর্তের ব্যবধানে পৃথিবীর যাবতীয় রমনীর সৌন্দর্যের স্বাদ পেয়ে গেলো যেন আলী। তার চোখ ফেরাতেও কষ্ট হচ্ছিলো। মিঠু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। রুবী মিষ্টি হাসিতে ঢেউ তুলে কিছু বলেছিলো। কিছুই শোনেনি আলী। সে অভিভূত হয়েছিলো। খিল খিল হাসির শব্দে মূর্ছনা ভাঙে।

মিঠু খোঁচা দেয়। "এমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? জীবনে মেয়ে দেখিসনি?"

আলী কেশে গলা পরিষ্কার করে। চোখ নামিয়ে নেয়। কোন কথা বলতে পারে না। রুবীই পরিবেশটাকে সহজ করে নেয়। তার সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে যে কারো দ্বিধা চলে যাবে। মাকে ছাড়া তখনও অন্য কোন মেয়ের সাথে দু'টির বেশী কথা আলীর বলা হয়নি। কিন্তু রুবীর সাথে অচিরেই আলাপ জমে ওঠে। রুবীই কোন এক মন্ত্রবলে বুঝে ফেলে ওর দূর্বলতা। বই নিয়ে আলাপ শুরু হয়। গল্পের বই। কবিতার বই। এডভেঞ্চার বই। মাসুদ রানা। কুয়াশা।

ঘন্টাখানেক ছিলো সেদিন। বইয়ের আলাপই হয়েছিলো। আলী এক ফাঁকে নিজের কবিতা লেখার কথাও ফাঁস করে। রুবী খুব হৈ চৈ করে উঠেছিলো। "সত্যিই! আমাকে দেখাবে? কি নিয়ে কবিতা লেখো? মেয়েদেরকে নিয়ে নিশ্চয়?"

তার আগ্রহ দেখে বুকে ঝড় উঠেছিলো আলীর। সে কথা দিলো একদিন তার সব কবিতা নিয়ে সে চলে আসবে। এই ছাদে দাঁড়িয়ে সব কবিতা পড়ে শোনাবে।

মিঠু বিরক্ত হচ্ছিলো। এমন দুর্ধর্ষ ছেলে অথচ রুবীর সামনে কেঁচো হয়ে ছিলো। যেন কি বলবে বুঝতে পারছে না। ওর আচরণে অবাকই হয়েছিলো মিঠু। সবসময় রুবীর কথা বলে, কিন্তু মনে মনে এতোখানি দুর্বল হতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। আলীর কবিতার প্রসঙ্গ বোধহয় তার পছন্দ হচ্ছিলো না। তাড়াতাড়ি জোর করে বিদায় নিলো ওরা। ফিরতি পথে সিড়িতে ছয়-সাত বছরের শ্যামলা, গম্ভীর মতন একটা চিকন মেয়ে সাপের মতো দুখানা বেনী ঝুলিয়ে দুদ্দাড় করে ছাদে উঠে গেলো।

"নিশি! এই নিশি! শোন।" মিঠু ডেকেছিলো। নিশি থামেনি। জবাব দেয়নি। সিড়ি টপকে ছাদে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। মিঠু হেসেছিলো। "খুব লাজুক। আমি সম্পর্কে ওর ভাই হই, আমার সাথেও কথা বলে না। বল্লেও একটা দুইটা।"

আলী নিশিকে লক্ষ্য করেনি। করলেও রুবীর সৌন্দর্যে তার দৃষ্টি ঝলসে গিয়েছিলো। অন্য কিছু দেখবার ক্ষমতা তার তখন ছিলো না। ফিরতি পথে কথা তেমন হয় না মিঠুর সাথে। সেদিন প্রথমবারের মতো মিঠুর মুখে কথার খৈ ফুটতে দেখেনি। বাবু খান রোডের মোড়ে এসে ঝট করেই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। অবাক হলেও সেসব নিয়ে ভাবার মতো অবস্থা নয় তখন আলীর। তার মনের মধ্যে তখন দুর্বার বেগে ভাবের এবং শব্দের আনাগোনা চলছে। এমন অসম্ভব একটা সুন্দর দৃশ্যকে চিরজীবি করে রাখতে হলে চাই শব্দের মালা, সারি সারি শব্দের মালা।

সেদিন বাসায় ফিরে সে তার জীবনের প্রথম প্রেমের কবিতা লিখেছিলো। জানালার পাশে তার নড়বড়ে ছোট্ট ডেস্কে বসে লোহার গ্রিলের ফাঁক গলে উঁকি দেয়া জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হতে হতে তার কণ্ঠ গুণগুণিয়ে উঠেছিলো..... আগুন ঝরা জোৎস্না রাতে, তোমায় দেখে পাগল লাগে.....

নিশি তার জীবনে এসেছিলো আরো অনেক পরে।

৪

আলী ভেবেছিলো অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাসায় ফেরার পথে নিশির মামার বাড়ী হয়ে যাবে। ওয়ার্ডেন সাবওয়ে থেকে হাঁটা পথ। বশীরের দেয়া ঠিকানাটা সে গুগল ম্যাপে দেখে নিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেলো কাজে। ফয়েজ যে প্রজেক্টে কাজ করছে তারা ছেলেটার কোন হদিস না পেয়ে আলীর সাথে যোগাযোগ করেছে। ই-মেইল, ফোন-কোনটাতেই লাভ হলো না। ফয়েজের কোন খোঁজ নেই। রিয়ানাকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেলো বিকালে ক্রিকেট খেলে ফয়েজ। সেই জন্যে আগেভাগে বেরিয়ে পড়েছে। আলীর তাতে কোন সমস্যা নেই। প্রজেক্ট ম্যানেজার খোঁজ করাতেই সমস্যা পাকিয়ে গেলো।

হঠাৎ করেই একটা জরুরী কারণে মিটিং ডেকেছে প্রজেক্ট ম্যানেজার। সেই জন্যেই ফয়েজকে দরকার। নিরুপায় হয়ে আলীকে যেতে হলো। না গেলেও চলতো। পাক্কা এক ঘন্টা বসে বসে অন্যদের গালভরা কথাবার্তা শুনলো। বিরক্তির এক শেষ। ছেলেটিকে একটা ঝাড়ি না মারলেই নয়।

হাতের আরো কিছু কাজ সারতে সারতে ছ'টা বাজলো। গো ট্রেন ধরবার জন্য ছুটেছিলো, পরে খেয়াল হলো সাবওয়ে নিতে হবে। সাবওয়েতে নামার পথ পাশের বিল্ডিংয়েই। আবার দৌড়। ঠান্ডা পড়ার সাথে সাথে দিন ছোট হয়ে আসছে। আলো থাকতে থাকতে যেতে চায়।

পথে ট্রেন পাল্টাতে হলো একবার। ওয়ার্ডেনে নেমে বড় জোর মিনিট দশেক হাঁটলো। নতুন কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। সারি বেঁধে দাড়ানো বড় বড় বাড়ীর সারি। নিশির মামার তিনতলা প্রশস্ত বাড়ীখানা খুঁজে পেতে বেশী দেরী হলো না। সাহস করে কলিং বেলে চাপ দেয় আলী। যা আছে কপালে। এতো ভয় পাবার কি আছে? পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে এতো ভাবনা কেন?

এখনো পুরোপুরি সন্ধ্যা হয়নি। যেটুকু আলো আছে আকাশে তাতে দৃষ্টি ভালোই চলে। উপরে কোথাও জানালা খোলার শব্দ পেলো। ঝটপট বন্ধ হয়ে গেলো। দরজা খুলতে কেউ এলো না। মুহূর্তগুলো ধীর লয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। ঘামতে শুরু করে আলী। বাসার সামনে একটা লেক্সাস দাঁড়ানো। যার অর্থ মামা-মামী নিশ্চয় বাসায় আছেন। দরজা না খোলার অর্থ তাদেরকে কেউ নিষেধ করেছে। আরোও মিনিটখানেক বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ফিরতি পথ ধরলো আলী। লেবু বেশী কচলালে তেতো হয়ে

যায়। নিশি যদি আজকে ওর সাথে দেখা করতে না চায়, ঠিক আছে সে না হয় আরেক দিন আসবে। বাড়ীটাতে প্রচুর কাচের জানালা। চোখ বোলানোর সময় সে কি একটা নীলচে অবয়ব দেখলো?

এতো বছরেও নিশির রাগ ভাঙেনি? দোষটা কি আলীরই ছিলো শুধু? এভাবে আসাটা হয়তো ঠিক হয়নি। মামা-মামী কি ভাবলেন?

পরবর্তী কয়েকটা দিন ছটফট করলো আলী। দেখা করবে মনস্থির করবার পরও দেখা হচ্ছে না, ব্যাপারটা তাকে পীড়া দিচ্ছে ভেতরে ভেতরে একটু জেদও চেপে যাচ্ছে। বরাবরের মতোই বাড়াবাড়ি করছে নিশি। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখতে ওর জুড়ি নেই। তেরো বছর পরেও এমন ছেলেমানুষী করাটা কি সাজে? অন্যায়তো সে একা করেনি। মনের মধ্যে হাজারটা যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এতগুলো বছর যা ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে সব কিছু যেন বন্যার জলের মতো ঝাপিয়ে আসে। কাজে কর্মে মন বসাতে পারে না। ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। বাধ্য হয়ে একদিন লাঞ্চের সময় বেরিয়ে পড়লো। যতদুর শুনেছে, নিশি বাসাতেই থাকে। বশীরের মুখেই শোনা। সে হয়তো সঠিক জানে না। কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ নেই। মামা-মামী থাকবেন না। দু'জনাই চাকরী করেন।

ওয়ার্ডেন উডস পার্ক পেরিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে সে বিশাল কবরখানা পর্যন্ত হেঁটে যায়। খ্রীষ্টানদের কবরখানা। আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটলে তবে নিশির মামার বাড়ী। প্রচুর গাছ-পালা চারদিকে। ইতিমধ্যেই উজ্জল বাহারি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে মেপল এবং ওক গাছের পাতায়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এই বর্ণের সমাবেশ যে কারো মনকে দুলিয়ে যাবে।

বাসার সামনে আজ কোন গাড়ী নেই। পর পর কয়েকবার কলিং বেল বাজালো। আজও উপরে জানালো খোলার খুটখাট শব্দ পেলো। জানালা বন্ধ হয়ে গেলো তৎক্ষনাৎ। দীর্ঘক্ষণ কোন কিছু ঘটলো না। আলী আবার বাজায়। টুং-টাং, টুং-টাং। তারও জেদ বেড়ে গেছে। কিন্ত দরজা খোলে না।

চারদিকে চোখ বোলায় আলী। দুপুর বেলায় খুব অল্প মানুষই বাসার বাইরে থাকে। পাশেই বাচ্চাদের খেলার ছোট একটা পার্ক। সেখানে দু'টি কম বয়সী মহিলা তিন-চারটি বাচ্চাকে নিয়ে খেলাচ্ছে। আলীকে তারা লক্ষ্য করলেও ওর পোশাক আশাক দেখে সম্ভবত সন্ত্রস্থ হবার কোন কারণ দেখেনি। প্যান্ট শার্টের উপর কালো ব্লেজার পরেছে। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। চোখে সানগ্লাশ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ঘাসের উপরেই বসে পড়লো আলী। দেখা না করে আজ আর সে যাবে না। ধুলো-বালি লেগে প্যান্টার দফা রফা হচ্ছে, তা হোক। কাজেও জানানো দরকার। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। স্টিভকে একটা ফোন করে বলে দিলো শরীরটা খারাপ লাগছে। বাসায় ফিরে যাচ্ছে। এবার প্রতীক্ষার পালা।

সময় কাটে ধীর লয়ে। পার্কে বাচ্চাদের কল-কাকলি। কৌতুহলী চোখে বারবার ওকে দেখছে। নিশ্চয় ভাবছে পাগল-টাগল হবে। নিশি কি দেখছে? কোন একটা জালানার পেছনে লুকিয়ে নিশ্চয় ওর হেনেস্থা

দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। এটাই তো প্রথম নয়। বোটানি ডিপার্টমেন্টের সামনে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো একবার। ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিলো চারদিকে কিন্তু কাজ হয়েছিলো। নিশি বাইরে কাঠিন্য দেখালেও ভেতরে ভেতরে সে বেনী দোলানো ছোট্ট একটা মেয়ের মতো, চুপচাপ, কৌতুহলী। বেশীক্ষন রাগ করে থাকার ক্ষমতা তার নেই।

ঘন্টা দুয়েক পরে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো নিশি। সাদা সালোয়ারের উপর লাল-নীল ফুটকি দেয়া আটোসাটো কামিজ, তার একহারা দর্শনীয় শরীরের প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফিনফিনে লাল একটা ওড়না আলতো করে বুকের উপর ঝোলানো। সেই গভীর কালো বড় বড় চোখ আর ছোট্ট নাক, লম্বাটে মুখে অভিমানী একজোড়া ফোলা ফোলা ঠোঁট। দেখেই বুকটা ধক করে ওঠে আলীর। এই সৌন্দর্যের সাথে একমাত্র তুলনা চলে প্রকৃতির। সবুজ গাছ-পালায় ঘেরা নীল পানির সরোবরে যখন মেঘের ছায়া পড়ে, চোখ ঝলসে যায় না কিন্তু হৃদয়ের গভীরে মুচড়ে ওঠে, সেই অসম্ভব সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে ইচ্ছে হয়, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে ইচ্ছা হয়।

হেঁটে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো নিশি। কোমর সমান চুল একটা বেনীতে জড়ানো। প্রতি পদক্ষেপে এপাশ ওপাশ দুলছে সর্পিল বেনীটা। ঠোটের ডগায় উষ্মা। মুখে গাম্ভীর্য। হাসি আটকাতে পারে না আলী। সেই প্রথম দেখার কথা মনে পড়ে যায়। একটুও বদলায়নি। সেই শ্যামলা চোখ জুড়ানো মুখ, পাতলা শরীর, অভিমানী চাল-চলন। পঁয়ত্রিশেও তার আকর্ষণীয় উপস্থিতি যে কোন পুরুষের পৃথিবী দুলিয়ে দিতে পারে। চোখ ফেরাতে পারে না আলী।

"এসব কি হচ্ছে?" ধমকে ওঠে নিশি। "আমার মেয়ে স্কুল থেকে ফিরবে। ভয় পেয়ে যাবে।"

আলীর সব ভয় উবে যায়। সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটাকে সে এতো ভালোভাবে চেনে যে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুহূর্তে চলে যায়। নিশি একটুও বদলায়নি। এই সারা পৃথিবীতে একটা মেয়েই এমন অধিকারে কথা বলতে পারে তার সাথে। পিয়ার সাথে দু'বছর সংসার করেছিলো। পিয়া কখনো গলা চড়িয়ে কথা বলেনি। সে ছিলো অসম্ভব সংযত। তার মুখ দেখে মনের কথা বোঝা দুষ্কর ছিলো। নিশির মতো নয়।

আলীকে দাঁত বের করে হাসতে দেখে বিরক্ত হলো নিশি। "চুলে পাক ধরেছে এখনো ছেলে মানুষী!"

"দরজা খোলনি কেন?"

"কেন খুলবো? কে তুমি?"

"তুমিই বলো, কে আমি?"

"ঢং করো না। ওঠো। আমার মেয়ে এখনিই ফিরবে। আমি চাইনা ও এসব দেখুক।"

"কত বয়স তোমার মেয়ের? নাম কি?"উঠে দাঁড়ায় আলী।

"যাও তো। এতো কিছু তোমার জানার দরকার কি? এতো বছর একটা খবর নাওনি। হঠাৎ দরদ উথলে উঠছে। চলে যাও।"

পার্কে মহিলাদের দলটা গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। এখানে যে একটা নাটক চলছে বুঝতে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। সবাই শ্বেতাঙ্গীনি। কথাবার্তা কিছু না বুঝলেও, হাবে-ভাবে অনেক কিছুই বুঝে নিচ্ছে। নিশি তাদের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাত নাড়লো।

"চেনো ওদেরকে?"

"চিনবো না কেন? বিকালে সব বাচ্চারা একসাথে খেলে না!"

"চলো ভেতরে গিয়ে বসি।"

"কেন? টিসা কি ভাববে?"

"টিসা! তোমার মেয়ে?"

হাত কচলায় নিশি। নার্ভাস। পুরানো অভ্যেস ওর। কি করবে বুঝতে পারছে না। আলী হাসি থামাতে পারছে না। নিশির নাকের ডগা লাল হয়ে গেছে। "এতো ঘাবড়ে যাবার কি হলো?"

"কেন আবার জ্বালাতে এসেছো?"

"দেখা করতে এলাম। জ্বালাবো কেন? শুনলাম তুমি টরোন্টোতে। ঢাকা ভার্সিটির অনুষ্ঠানে তোমার গান শুনলাম। দেখা করতে গিয়েছিলাম। শুনলাম তুমি চলে গেছো। ঐ গানটি তোমার আজও মনে আছে?"

"তোমার ঐ ছাই ভস্ম গান আর কার মনে থাকবে?" ঝাঁঝিয়ে উঠলো নিশি। "ঐ দিন তোমাকে দূর থেকে দেখেই পালিয়েছিলাম। কিন্তু ঠিকই পিছু নিয়েছো। তেরো বছর কোন খবর নাওনি, এখন বাসার সামনে গ্যাট মেরে বসে আছো। মামা-মামী কি ভাববে? বাসায় চলে যাও।"

"অফিসে যেতে হবে। ফাঁকি দিয়ে এসেছি।"

"যে চুলায় যেতে হয় যাও। আমি চাই না টিসা তোমাকে দেখুক।"

"কেন, দেখলে কি অসুবিধা? আমি তো মোটামুটি সুদর্শন।"

নিশি চোখ রাঙালো। "ফাজলামী হচ্ছে? আমাদেরকে একসাথে দেখলে কি ভাববে"?

আলী পার্কে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের দলটিকে ইঙ্গিত করলো। "ওরা যা ভাবছে তাই-ই ভাববে। বয়স কত ওর?"

"দশ। সব বোঝে। খুব পাকা। এক্ষুনি চলে আসবে। আচ্ছা, ভেতরে আসো। বলবে তুমি আমার কাজিন।"

আলী হেসে ফেলে। "মেয়েকে দেখছি খুব ভয়।"

"মাথা ভরা বুদ্ধি। কথা হলেই বুঝবে। ভেতরে চলো। ওদিকে আবার ওরা দাঁড়িয়ে রঙ-তামাশা দেখছে।"

আলী ভেতরে ঢুকে লিভিংরুমে একটা সোফায় বসলো। "টিসা কি একাই চলে আসে?"

"চার-পাঁচটা মেয়ে যায় এই পাড়া থেকে। একসাথেই ফেরে। স্কুল কাছেই।" নিশি জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখে।

"কতদিন এসেছো এখানে?"

"বছর খানেক।"

"ইমিগ্রেশন?"

"হ্যাঁ। একাউন্টেন্ট ছিলাম। এখানে এসে কাজকর্ম পাই না। শনি রবিবারে দোকানে কাজ করি। মামা-মামী চান না। কিন্তু বসে থাকতে ভালো লাগে না।"

"কোন দোকানে?"

পিছু ফিরে তাকালো নিশি। "বলবো না। প্রেম-পীরিতি করার মন নেই।"

এবার হা-হা করে হেসে উঠলো আলী। "তোমার মুখের ধার সেই রকমই আছে।"

অগ্নি দৃষ্টি হানলো নিশি। "মনে তো হচ্ছে খুব ফুর্তিতে আছো। সংসার ভাঙলো কেন?"

"খবর সব পেয়ে গেছো তাহলে?"

"টরোন্টোতে সব খবরই পাওয়া যায়।"

"তাহলে তো সব জেনেই গেছো। জিজ্ঞেস করছো কেন?"

"সব জেনেছি বলিনি।"

আলী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। "সে সব অনেক কথা। আরেকদিন বলা যাবে। তোমার কেন হলো"?

"কি হলো?"

"ডিভোর্স?"

"ওহ্!" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। "মনে মেলেনি। আলাদা হয়ে গেলাম। রহস্য কিছু নেই।"

নিশি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলো। জানালা দিয়ে টিসাকে দেখতে পেলো আলী। মায়ের মতই লম্বাটে, হ্যাংলা, ছোট করে কাটা চুল, বব ছাট। চোখে মুখে নিশির আদল থাকলেও গায়ের রং বেশ

ফর্সা। দৃষ্টিতে স্বপ্নালু এবং বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়। মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে নিশি। দু'জনে ভেতরে ঢোকে। আলীকে দেখে থমকে যায় টিসা। আলী দ্রুতকণ্ঠে বললো, "আমি তোমার মামা হই।"

টিসা মায়ের দিকে তাকালো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

"আমার কাজিন। দূরসম্পর্কের। তোমাকে বলা হয়নি।"

"আলী আংকেল?" টিসা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো।

নিশি সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইলো, "তুমি জানলে কি করে?"

"নানুরা আলাপ করছিলো কয়েক দিন আগে। ওদের দোষ নেই, ভেবেছিলো আমি ঘুমিয়ে আছি। কিন্তু জেগেই ছিলাম।"

নিশির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। "কি আলাপ করছিলেন তারা?"

টিসা মায়ের দিকে ভৎসর্নার দৃষ্টিতে তাকালো। "আমি দশ, মা। সব বুঝি। এতো ভয় পাচ্ছো কেন?" আলীকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লো। "ভালোই হয়েছে তুমি এসেছো, আংকেল। মা, খুব একাকী"।

"তুমি বেশী কথা বলো।" ধমকে উঠে নিশি।

"এবং রাতে কান্নাকাটি করে," যোগ করে টিসা। "ইদানিং একটু বেশী। আমি ভেতরে যাই। গোছল করবো।"

টিসা মুচকি হেসে হাত নেড়ে ভেতরে চলে যায়।

নিশি ফিসফিসিয়ে বললো। "বলেছিলাম না! কেমন পাকনী, দেখেছো? সব বোঝে। ছিঃছিঃ।"

"মনে তো হলো আমাকে তার পছন্দই হয়েছে।" আলী ঠাট্টার স্বরে বললো। "ছুটির দিনে কোথাও ঘুরতে যাবে নাকি?"

চোখ পাকালো নিশি। "জ্বী না। কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না। তোমার সাথে তো নয়ই। সারাটা জীবন জ্বললাম তোমার জন্য। একদিন দু'দিন নয়, তেরোটা বছর কোন খবর নাওনি। মানুষ শত্রুরও খবর রাখে। বেঁচে আছি না মরে গেছি সেটাও জানতে ইচ্ছে হয়নি। অনেক কষ্টে নিজেকে দাঁড় করিয়েছি। মেয়েটাকে ডাক্তার বানাবো। নিজের কথা আর ভাবতে চাই না।"

"যা ঘটেছিলো তারপর ....." প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে যায় আলী। তার অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয়। কত অভিমান জমা হয়ে আছে। কিন্তু ভাষা খুঁজে পায় না। এতোদিন পর সেই প্রসঙ্গ তুলেও কি কোন লাভ আছে?

"থাক। কিছু শুনতে চাই না। চলে যাও।"

আলী উঠে পড়ে। নিশিকে রাগিয়ে দিলে ফল কখনই ভলো হয় না। আজ যে ওর দেখা পাওয়া যাবে সেটাই আশা করেনি। ঘরে ঢুকে বসতে পেরেছে সেটাই অনেক পাওয়া।

"ফোন করবো?" বিদায় নেবার আগে জানতে চাইলো।

"না। বলেছি না, কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।"

"ঝামেলাতো করছি না। কথা বলতে দোষ কি?"

"কথা বলার কিছু নেই। আমার সাথে আর দেখা করার চেষ্টা করো না।"

"মন থেকে বলছো?"

"হৃদয়ের গভীর থেকে বলছি। হলো?

"ই-মেইল?"

"না। যাও। খোদা হাফেজ! আল্লাহ হাফেজ! গুড বাই।"

সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো নিশি। বোকার মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ফিরতি পথ ধরে আলী। পার্কে মহিলার দলটি আড় চোখে তাকিয়ে আছে। হাত নাড়লো সে। মুহূর্তে সবগুলো দৃষ্টি ঘুরে গেলো। মনের দুঃখে হেসেই ফেললো আলী। তার পুরো জীবনটাই যেন এক নাটক। ঐ বেচারীরা দেখলে দোষের কি? শেষবারের মতো পিছু ফিরে তাকায়, যদি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে নিশি। মিথ্যে আশা।

কিন্তু দোতলার জানালায় টিসাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। আলতো করে হাত নাড়লো মেয়েটা। আলী পাল্টা হাত নাড়লো। বুকের মধ্যে বিশাল একটা মোচড় অনুভব করলো। শূন্যতা কোথায় বুঝতে অসুবিধা হয় না। নিশির তবু একটি মায়াময়ী, বুদ্ধিমতী মেয়ে আছে। তার কিছুই নেই।

৫

স্কুল থেকে ফিরেই আলী বুঝেছিলো, কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। বাবু খান রোডে ছোট্ট একটা দু'কামরার বাসায় ভাড়া থাকে ওরা। একটা কামরায় থাকে আলী, অন্যটাতে বানু। বাসায় জামা-কাপড় সেলাইয়ের কাজ করে বানু। সারা বাড়ীতে কাপড়ের ছড়াছড়ি। প্রধানত মেয়েদের সালোয়ার, কামিজ, ব্লাউজ সেলাই করে। একই জায়গায় তেরো-চৌদ্দ বছর ধরে আছে, তার নিখুঁত কাজের পরিচিতি এলাকা জোড়া। প্রায়শই বাসায় ফিরে দল বেঁধে মহিলাদেরকে বসে থাকতে দেখে আলী। অধিকাংশই কাজ নিয়ে আসে। কেউ কেউ গল্প করতেও চলে আসে। বানু খুব আলাপী নয়। কথা সে কমই বলে। কিন্তু শ্রোতা হিসাবে ভালো। দু'চার কান লাগিয়ে বেড়ানোর অভ্যেসও নেই। তার কাছে মনের কথা বলে সবাই নিরাপদ বোধ করে।

আজ বাসায় ঢুকেই সে একটু থমকে দাড়ালো। মানুষজন কেউ নেই। মায়ের সেলাই মেশিনের ক্রমাগত ঘর-ঘরর শোনা যাচ্ছে না। সব সময় মহিলারা আসছে বলে দরজায় প্রায় কখনই খিড়কি লাগায় না বানু। ভেড়ানো থাকে। মা, মা বলে কয়েকবার ডেকেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো শূন্য ঘর। নিজের ঘরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালো। ওর চেয়ারটিতে চুপ করে বসে আছে বানু। থমথমে মুখ। সাদার মধ্যে কালো ফুটকি দেয়া সস্তা একটা সুতার শাড়ী পরনে, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল একটা রিবন দিয়ে মাঝামাঝি বাঁধা, মুখ প্রসাধন শূন্য। তার বারো বছরের জীবনে মাকে কখন প্রসাধন করতে দেখেনি। আলী রং চঙে মন জুড়ানো কাপড় পরতে দেখেনি। তার পৃথিবী সুনসান সাদামাটা। সেখানে শুধু একটি বস্তুই স্বর্ণের মতো ঝিলিক দেয় - আলী। নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে ছেলেকে বড় করেছে, ছেলেই তার চোখের দ্যুতি।

"কি হয়েছে মা?" আলী ভীত কণ্ঠে জানতে চায়। বানুর ভালোবাসা এবং রাগ দুটোই মাত্রাতিরিক্ত। এমন থমথমে মুখ মেঘেরই ইঙ্গিত দেয়।

বানু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। "এখানে আয়, বাবু।"

এবার বাস্তবিকই ঘাবড়ে যায় আলী। "বাবা" ছাড়া সাধারণত তাকে অন্য কোন নামে ডাকে না বানু। বাবু হচ্ছে রাগের ডাক। তার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা বয়ে যায়। অন্যায়টা ধরতে পারে না। স্কুল সে কখনই ফাঁকি দেয় না। ক্যাডেট কলেজের কোচিং-এ ঠিকমত যায়। ভর্তি পরীক্ষায় পাশ না করার কোন কারণ নেই। ছোট ছোট পায়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় বানু। নড়ে না আলী। দ্বিতীয় আরেকটা চড় পড়ে অন্য গালে। মার খাওয়া এটাই প্রথম নয়। রাগ হলে বানুর হাত চলে। আলী নড়ে না। বানু শক্তিশালী নয়।

আলীকে মারতে গিয়ে সে নিজেই ব্যথা পায়।

"কি হয়েছে, মা?" সে শান্ত গলায় জানতে চায়।

টেবিলের উপরে ফেলে রাখা খাতাটিকে দেখায় বানু। "কি এটা?"

একটা চাঁপা নিশ্বাস ছাড়ে আলী। গত রাতেই কবিতাটা লিখেছে, খাতাটা তখনও একইভাবে টেবিলের উপর পড়ে আছে। বানু ঘর গোছাতে দিনে কয়েকবার ঢোকে। সকালে উঠে দৌড়াদৌড়ি করে স্কুলে চলে গেছে, লুকিয়ে যাবার কথা খেয়ালই হয়নি।

"তোকে প্রেম করতে স্কুলে পাঠাই না আমি।" বানু গর্জে ওঠে। ছেলের নজর লুকিয়ে হাতে হাত ডলে। নিশ্চয় জ্বলছে।

"কবিতা মা, সত্য নয়।" আলী মিথ্যা বলে।

তীব্র দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করে বানু। "মিথ্যে বলবি না।"

"বলছি না।"

"মিঠুকে জিজ্ঞেস করবো আমি।"

"করো। তুমি তো জানোই মেয়েদের সাথে আমি কথা বলতে পারি না। খামাখা রাগ করছো।"

বানু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। আলী তার কাছে মিথ্যে বলতে পারে না। কবিতা লেখায় দোষের কিছু নেই। সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

"খেতে আয়।"

আলী অপরাধী বোধ করে। মায়ের কাছে মিথ্যে বলতে তার খারাপ লাগে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে বুঝেছে, মাঝে মাঝে সত্য গোপন করাটা নিতান্ত মন্দ নয়। কাগজটা ছিঁড়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো। চোখের সামনে পড়ে থাকলে আরো দশটা প্রশ্ন জেগে উঠতে পারে বানুর মনে।

বানু রাতে তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে যায়। ওঠে ভোরবেলা। আলী রাত জেগে পড়ে। রাত গভীর হবার সাথে সাথে চারদিকের পৃথিবী কেমন ধীরে ধীরে বদলে যায়, শব্দে, আলোয়, বর্ণে। একসময় সামান্য পাতার নড়াচড়ার শব্দও কানে আসে, কত অজস্র পোকারা ডেকে ওঠে। খোলা জানালা দিয়ে বাতাসের স্রোত শরীরে হাত বুলিয়ে যায়। আকাশ পরিস্কার থাকলে কিছু তারাও চোখে পড়ে। রাতের এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করে আলী। প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করে। হঠাৎ হঠাৎ প্যাঁচা ডেকে ওঠে। ছোটবেলায় এই ডাক শুনে ভয় পেতো। এখন অপেক্ষা করে থাকে। এই নিশুতি রাতের সাথে চমৎকার মানিয়ে যায় সেই ডাক।

হঠাৎ করেই রাত জাগার অভিজ্ঞতাটা বদলে যায় আলীর। যতই পৃথিবী নিঃশব্দ হয়ে আসে ততই তার হৃদয়ের আকুলি বিকুলি বাড়তে থাকে। একখানা অপরুপ সুন্দর মুখ তার অস্তিত্বের মাঝে ভয়ানক অধিকার নিয়ে জুড়ে বসে। কবিতাখানা চোখের সামনে মেলে ধরে সে আচ্ছন্নের মতো বার বার আবৃত্তি

করতে থাকে, নিঃশব্দে। প্রতিটি শব্দের সাথে, বাক্যের সাথে একটি প্রিয় মুখের স্মৃতি এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে তার মনে হতে থাকে সে কতকাল ধরে তাকে চেনে।

প্রথম প্রেম

আগুন ঝরা জোৎস্না রাতে তোমায় দেখে পাগল লাগে,

বেতাল হাওয়া যায় উড়িয়ে মেঘ নদীতে নায়র নিয়ে।

রুপোর হাতে চুড়ির রাশি ঘুর্ণিপাকে ঝিলিক মারে,

জোয়ার আসে স্বপ্ন দেশে উজান বেলা সাগর নাচে,

মাতাল মাতাল লাগে রে পাগল পাগল লাগে।

উথাল পাথাল আগুন জ্বলে জোৎস্না ভরা চাঁদনী রাতে,

পাগল পাগল লাগে রে মাতাল মাতাল লাগে।

সপ্তাহ খানেক একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে পেরিয়ে যায়। রুবীকে ছাড়া সে কোন কিছুই ভাবতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হলো, মিঠুকে ছাড়া রুবীর সাথে যোগাযোগ করবার কোন উপায় দেখে না। কোন এক অদ্ভুৎ কারণে মিঠু রুবীর কথা একবারেই তোলে না। লজ্জার মাথা খেয়ে আলী কয়েকবার সেই প্রসঙ্গ তুলবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু মিঠু এড়িয়ে গেছে। আলীর ইচ্ছা হয় সরাসরি রুবীদের বাসায় চলে যায়। দরজার নিচ দিয়ে কবিতাখানা রেখে চলে আসে। রুবী নিশ্চয় বুঝবে কে লিখেছে। বুঝবে না? যাওয়া হয় না। সাহস হয় না। এইসব করতে সে অভ্যস্ত নয়।

মিঠুর সাথে সব দিন দেখো হয় না। কোচিং সপ্তাহে তিন দিন। তার বাইরে মিঠু মাঝে মাঝে হঠাৎ বাসায় এসে হাজির হয়। কিন্তু রুবীর সাথে পরিচয় হবার পর সেটা যেন হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেলো। আলী বোকা নয়। মিঠুর মনের মধ্যে যে কিছু একটা চলছে সে বুঝতে পারে। হয়তো সেও রুবীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মনে মনে একটু ভয়ই পায় আলী। মিঠুকে সে রাগাতে চায় না। চাইলে তার জীবনটাকে অনেক কঠিন করে দিতে পারে মিঠু। শুধু বাবার পরিচিতি নয়, মিঠুর নিজেরও অনেক বন্ধু-বান্ধব। চাইলে সে রাস্তা-ঘাটে আলীকে মার খাওয়াতেও পারে। যদিও তেমন কিছু করবার মতো ছেলে মিঠু নয়। নিজেকে আশ্বস্ত করে সে।

আলীর বন্ধুর সংখ্যা অল্প। সে চুপচাপ ধরনের, ভাবুক প্রকৃতির। হৈ চৈ করা, দল বেঁধে পাড়া কাঁপানোর স্বভাব তার নয়।

বিকালে জেলা স্কুলের মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলে। কিন্তু সবদিন যাওয়া হয় না বলে ঘনিষ্ট কোন বন্ধু তৈরি হয়নি। প্রায়শঃই একাকী খুলনার রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় ও। কেমন একটা মায়া আছে শহরটার। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নারকেল গাছের সমারোহে গড়ে ওঠা এই শহরের অলি গলি তার

কাছে পরিচিত মনে হয়, নিজের মনে হয়। খুলনা শহরের বাইরে সে আর কোথাও যায় নি, কিন্তু যাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। এখানেই তার মন বাঁধা পড়ে গেছে। রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সব তার নখ দর্পণে। কথাবার্তা না হলেও অনেকেই তাকে চেনে। বিশেষ করে হাদিস পার্কের চারদিকের বইয়ের দোকানদাররা। ইট-সিমেন্টের তৈরি দোকান সবার নেই। অনেকেই রাস্তার পাশে ছাপড়া দোকান তুলে বই বিক্রি কিংবা ভাড়া দেয়। কেনার সামর্থ্য আলীর নেই। সে সাধারণত ভাড়া নেয়। দস্যু বনহুর, দস্যু পাঞ্জা, কুয়াশা, মাসুদ রানা। বানু দেখলে সর্বনাশ হবে। সেই জন্যে অন্য বইয়ের মোড়ক লাগিয়ে স্কুলের বইয়ের সাথে নিয়ে ঘোরে। যখনই সুযোগ পায় তখনই গল্পের বই নিয়ে বসে পড়ে।

অলস বিকালে মাঝে মাঝে পার্কের ভেতরে দাঁড়িয়ে মানুষের চলাফেরা দেখে। নানান আকারের, নানান পোষাকের মানুষ। কেউ ব্যস্ত, কেউ নিষ্কর্ম। ভিখারীর দল সুর করে ভিক্ষে চায়। কেউ মানুষজন জড় করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাদের বাগ্মীতার পরিচয় দেয়। নানান ধরনের ঔষধ বিক্রি করে তারা। সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় পুরুষাঙ্গ সংক্রান্ত ঔষধগুলো। কারণটা আলীর কাছে পরিষ্কার নয়। যৌনতা সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে আলাপ চল্লেও আলী কখনো তাতে যোগ দেয় না। তবে পুরুষাঙ্গ বর্ধনের ঔষধ কেন কেউ কিনবে বুঝতে পারে না।

কপালের কি লিখন, এই হাদিস পার্কেই রুবীর সাথে আবার দেখা হলো। এটা যে সম্ভব সে চিন্তাও করেনি। বেঞ্চে বসে সদ্য ভাড়া নেয়া একটা বই পড়ছিলো হঠাৎ মেয়েলী কণ্ঠের খিল খিল হাসি কানে এলো। পিছু ফিরে তাকাতেই অবাক হবার পালা। রুবী এবং তার তিন বান্ধবী। পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো হয়তো, আলীকে দেখে চটুল হাসির হিড়িক পড়ে গেছে। বান্ধবীরা রুবীকে খোঁচাখুঁচি করছে। কারণটা বুঝতে বাকী থাকলো না। সেদিন পরিচয়ের পর সে যেভাবে মুগ্ধ নয়নে বাকহারা হয়ে তাকিয়ে ছিলো, সেটা রুবী খেয়াল করবে না তা হতেই পারে না। সেই গল্প নিশ্চয় বান্ধবীদের কানে গেছে। যাক। কোন ক্ষতি নেই। রুবী তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে হাসলেও তার শান্তি। সে কথা বলবে কি বলবে না নিয়ে দ্বিধা করছে দেখে রুবী নিজেই এগিয়ে এলো।

"তুমি এখানে কি করছো?" বয়স কাছাকাছি হওয়ায় মিঠুকে সে নাম ধরেই ডাকে। সেই সূত্রে আলীকেও নাম ধরে ডাকা যাবে এবং তুমি করে বলা যাবে ধরেই নিয়েছে। আলীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়ে গেলো।

"এখানে বই ভাড়া নিতে আসি।" এক গাল হাসি নিয়ে বললো। "তুমি এখানে কেন?"

"আমরাও বই ভাড়া নিতে আসি। আয় না!" বান্ধবীদেরকে ডাকে। তারা অবশ্য আসে না। দূরে দাঁড়িয়েই মুখ টিপে হাসতে থাকে। "কি ধরনের বই পড়?"

"সব ধরনের। কুয়াশা আমার ফেভারিট। এখন মাসুদ রানাও পড়ি। তুমি?"

"আমি সব ধরনের প্রেমের গল্প পড়ি।" ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখিয়ে কুল কুলিয়ে হেসে ওঠে রুবী। তার ফর্সা গালে আলতো গোলাপী রঙ। "আমাদের যেতে হবে। মা চিন্তা করবে। তুমি কবিতা শোনাবে বলেছিলে। এলে না তো আর।"

"মিঠু যেতে চাইলো না ....."

"তুমি চলে এসো। মিঠুর জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমার ফোন নাম্বার আছে?"

মাথা নাড়ে আলী। রুবী তাকে ফোন নাম্বার দেবে চিন্তাই করা যায় না। রুবী কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে কলম বের করে বললো, "কাগজ আছে?"

পকেট হাতড়ে কিছু পাওয়া গেলো না। ভাড়া বইতে লিখতে দেয়াটা ঠিক হবে না। শেষে হাতের তালু বাড়িয়ে দিলো। আবার তরল গলায় হেসে উঠলো রুবী। "হাতেই লিখবো?"

"লেখো। কিছু হবে না।"

রুবী কাছে এসে দাঁড়ায়। বড় বড় করে নাম্বারটা লেখে। তার হাত আলীর হাত ছুঁয়ে যায়, বেশ কয়েকবার, মুহূর্তের জন্য। তার শরীরের অচেনা, মন মাতাল করা গন্ধ ওর সমস্ত শরীরে মূর্ছনা তোলে, উল্টো-পাল্টা কিছু একটা করে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

"এসো কিন্তু।" দ্রুত পায়ে বান্ধবীদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গলায় বিশেষ অনুরাগ ফুটিয়ে বলে রুবী। তার বান্ধবীরা চোখ নাচিয়ে হাসছে। কি বলছে ওরা কে জানে?

"আসবো।" আলী কি বলবে খুঁজে পায় না। মেয়েদের সাথে কথা বলার অভ্যাস তার নেই।

রুবী শেষ বারের মতো হাত নেড়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরে। আলী হাত নাড়তেও ভুলে যায়। ওরা রিক্সায় ওঠে। ভীড় ঠেলে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় রিক্সাগুলো। আলী তারপরও তাকিয়ে থাকে, তার পৃথিবী উল্টো-পাল্টা হয়ে যাচ্ছে, অনুভব করে সে।

মিঠুর সাথে কোচিং ক্লাশে দেখা হলো। স্যারের বাসাতেই ক্লাশ। বাইরের একটা ঘরে মেঝেতে মাদুর পেতে বসার জায়গা। তারপরও তিল ধারনের জায়গা নেই। করিম স্যারের শহর জোড়া খ্যাতি। একটু ক্ষ্যাপাটে হলেও লেখা পড়ার সাথে কোন সমঝোতা নেই। অনেক গাধাকেও নাকি মানুষ করেছেন এবং ক্যাডেট কলেজেও পাঠিয়েছেন। সেই সমস্ত গাধাদের কয়েকজন এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি তে মেধা তালিকাতেও উঠে গেছে। স্যার তাদের ছবি দেয়ালে টানিয়ে রেখেছেন। ছবির নীচে সবার নাম লেখা। স্যারের রসজ্ঞান আছে। সবার নামের আগে জুড়ে দিয়েছেন অনুপম সব পদবী।

গর্দভরাজ মোজাম্মেল আলী

কাঁদুনে নাইমুল কবীর

যারা পড়তে আসে তারা এসব নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করে। করিম স্যার অবশ্য কাউকেই ছেড়ে দেন না। তার কাছে যারা পড়তে আসে সবারই একটা করে পদবী আছে। যুৎসই কিছু না পেলে গাধা বলেই চালিয়ে দেন। কারো নাম মনে না এলেও "এই গাধা" বলেই সম্বোধন করেন। দুই গাধার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সম্বোধনের কলেবর বেড়ে যায়। আলী হয়ে ওঠে "প্রশান্ত গাধা" এবং মিঠু হয়ে ওঠে "লাফাংগা গাধা।"

মিঠু সাধারণত ক্লাশে বক্‌বক্‌ করতে থাকে। মাঝে মাঝে স্যারের ধমক খায়, তবুও চুপ করে থাকতে পারে না। পড়াশুনায় ভালো, যে কারণে বেশী বকা খায় না। আজ অবশ্য তার মুখ দিয়ে একটির বেশী দুটি কথা বের হলো না। বিশ জন ছেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। আলী মিঠুর পাশেই জায়গা করে বসেছিল। মিঠু ফিরেও তাকায় নি। বার দুয়েক কথা বলার চেষ্ঠা করেও লাভ হলো না। না জানলেও আলী কারণটা ধারণা করে নিলো। রুবীকে নিয়েই সমস্যা। তা ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আলীর উপর রাগ করার? কিন্তু রুবীতো আলীকেও পছন্দ করতে পারে। পারে না?

কোচিং ক্লাশ শেষ হতে কিছুক্ষণ রাস্তায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকলো আলী। মিঠু তখনও স্যারের বাসায়। অন্যসময় সেই সবার আগে বের হয়। বোঝাই যাচ্ছে, অনেক রাগ হয়েছে।

ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে থাকলো আলী। মিঠুর সাথে কথা বলা দরকার। তাহলে হয়তো ওর রাগ ভেঙে যাবে। ও যেভাবে আশা করেছিলো ঘটনা সেভাবে ঘটলো না। মিঠু ওকে দেখেই খিস্তি দিয়ে উঠলো, "তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা ভাগ।"

আলী আহত কণ্ঠে বললো, "তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।"

"চলে যা। তোর মুখ দেখতে চাই না।"

"কেন? কি করেছি?"

"ভান করিস না। তুই বেশী চালাক। তোকে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হয় নি।"

মিঠু উল্টো দিকে রওনা দেয়। আলীও পিছু নেয়। মিঠু ছোট একটা ঢিল ছুড়ে মারে। "পিছু নিয়েছিস কেন? কথা বলতে চাইনা।"

"খামাখা রাগ করছিস। আমি অন্যায় কিছু করিনি।"

মিঠু ঘুরে মুখোমুখি দাড়ায়। "পার্কে কি করছিলি?"

"বই পড়ছিলাম। রুবী হেঁটে যাচ্ছিলো। আমাকে দেখে থামলো। ব্যাস।"

"তোর সাথে যায়নি?"

“পাগল হয়েছিস! আমার সাথে এই নিয়ে মাত্র দু’বার দেখা হলো ।”

“তুই একটা মিথ্যুক!”

“বিশ্বাস কর । তুই তো জানিস মেয়েদের সামনে আমি জমে যাই ।”

“ভান! তোর মাকে বলে দেবো আমি ।”

এবার আলীর সন্ত্রস্থ হবার পালা । “কি বলবি?”

“লেখা পড়া বাদ দিয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছিস । ঝাড়ু দিয়ে পেটাবে তোকে । বেশ হবে ।” মিঠু শয়তানের মতো ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে ।

“তোর মাথার দিব্যি, মিঠু । মা খুব ক্ষেপে যাবে,” আলী কাতর কণ্ঠে বলে । মিঠু কান দেয় না । দৌড়ে চলে যায় । সত্যি সত্যিই যদি মাকে বলে দেয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়ানক হবে । শংকিত মনে বাসার দিকে রওনা দেয় ও । দূর থেকে মিঠুকে রিক্সায় চড়তে দেখলো । এখনিই বলবে? মিঠুর অনেক রাগ । কিছু একটা অপকর্ম না করা পর্যন্ত যায় না ।

৬

রাতে ঘুমাতে দেরী হয়েছিলো । মাঝে মাঝে ঘুমাতে কষ্ট হয় । শরীর ক্লান্ত কিন্তু চোখ জোড়া লাগে না । অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকেও যখন নিদ্রাপুরীতে পাড়ি জমানো গেলো না তখন লিভিং রুমে ফিরে গিয়ে সোফায় চিৎপাৎ হয়ে টিভি চালিয়ে দিয়েছিল, তাতেই কাজ হলো । এক সময় চোখের পাতা লেগে গেলো । ফোনের শব্দে যখন ঘুমটা ভাঙলো মনে হলো দু’সেকেন্ডও ঘুমায়নি । ঘড়িতে সকাল সাতটা । দু’তিন ঘন্টা ঘুমিয়েছে তাহলে । যথেষ্ট নয় । মাথাটা ধরে আছে । ফোনটা বেজেই চলেছে । লং ডিসটেন্স । ধরলো ।

“ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?” একটু কর্কশ, সংযত নারী কণ্ঠ ।

“পিয়া!” উঠে বসে আলী । পিয়ার ফোন কালে ভদ্রে আসে । “কেমন আছো?”

“প্রেমের আলাপ করার জন্য করিনি ।” খুব সহজ কণ্ঠেই খোঁচাটা দিলো পিয়া ।

“জানি ।” নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে আলী । এই মেয়েটির সাথে সে দু’বছর একই ছাদের নীচে বাস করেছে । একই শয্যায় শুয়েছে । তার শরীরের প্রতিটি খাঁজ, প্রতিটি উষ্ণতা তার কত পরিচিত । আবেগ

না দেখানোটা কঠিন। পাল্টা খোঁচা সে কখনই দিতে পারে না। চুপ করে থাকলো। পিয়া নিজেও খুব বাকপটু নয়।

"আজকের তারিখ মনে আছে?"

"তারিখ?" অপ্রস্তুত আলী।

"তোমার মায়ের মৃত্যু দিবস।"

আলী কপাল ধরে কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে থাকলো। এটা ভুলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। সারা পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেউ ছিলো না বানুর। ছিঃ! কি করে ভুলে গেলো?

"জানতাম।" পিয়া শান্ত কণ্ঠে আরেকটা মোক্ষম খোঁচা দিলো।

পিয়া ফোন রেখে দেয়। বিদায় নেবার প্রয়োজন অনুভব করে না। বছর পাঁচেক দেখা হয়নি। শুনেছে ভালো চাকরী করে। সঙ্গী কেউ আছে কিনা জানতে পারেনি। এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলো। বন্ধু পিয়ার পরিবারকে চেনে। সে চেষ্টা করেও কোন তথ্য দিতে পারে নি। সংযত, গম্ভীর মেয়ে। তার সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকলেও, গাম্ভীর্য দ্বিগুণ দূরে ঠেলে দেয়। আলীর সাথে তার বিয়ে ছিলো এরেঞ্জড। একবার মুখোমুখি হয়েছিলো দু'জন। পিয়াদের লিভিং রুমে। দু'জনাই সুন্দর। সংযত। পিয়ার ঠান্ডা স্বভাব, মৃদু হাসি, অল্প কথা, সব কিছুই ভালো লেগেছিলো। আলীকেও তার নিশ্চয় মন্দ লাগেনি। মোটামুটি লম্বা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, সুন্দর বেশ-ভুষা, মার্জিত চলন-বলন, কথায় একটু লাজুক। শুধু পিয়া নয় , ওদের বাসার সবাই প্রথম দেখাতেই পছন্দ করে ছিলো। আর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়নি তারা। আলীর মৃত বাবার পরিচয় ঘাটতে চায়নি কেউ। ঘটা করে বিয়ে হয়েছিলো। বানু অমত করেনি। মেয়ে তার পছন্দ ছিলো। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছিলো ।

বিয়ের পর টরোন্টোতে আলী এবং বানুর সংসারে এসে উঠেছিলো পিয়া। নর্থ ইয়র্কে তিন বেডরুমের কন্ডো কিনেছিলো আলী, ১৭০০ বর্গফুট। আলী স্বপ্ন দেখেছিলো সুখময় একটা পরিবারের। ভেবেছিলো বার্ধক্যের ধাপে পা দিয়ে বানু শেষ পর্যন্ত একটু আনন্দের মুখ দেখবে। তার একজন সঙ্গীনি হবে। সারাটা জীবন ছেলের উপর খবর্দারী করেছে। এবার বউয়ের শাসনে জব্দ হবে। ঠিক মতো খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, শুধু অন্যের চিন্তা। এবার তার হিসাবে ভুল ছিলো। শুরুতেই সব কিছু গোলমাল হয়ে গেলো।

বিছানা ছাড়লো আলী। বানুর মৃত্যু দিবস মনে না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের মৃত্যুর ছাপ এই বাড়ীতে বিশেষ একটা পড়েনি। সবকিছু আগের মতই আছে। মা যে নেই সেটাই মাঝে মাঝে ভুলে যায় আলী। শেষের দিকে এতো চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলো বানু। নিজের ঘর ছেড়ে কমই বের হতো।

হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা সারে আলী। পিকারিং মুসলিম কবর খানায় মায়ের কবর। সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করবে। বানুর কবর চিহ্নিত আছে। কিন্তু সেই ভূমিটুকুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কোন যৌক্তিকতা দেখে না আলী। চারদিকের অসংখ্য কবরের মাঝ দিয়ে আনমনে হাঁটে। না গেলেও চলে। কিন্তু সে মনে মনে ঠিক করেছে প্রতিটি মৃত্যু দিবসেই এই প্রথাটা সে চালিয়ে যাবে। বানু দেখুক বা না দেখুক আলীর নিজের মনে শান্তি হবে।

স্টিভকে ফোন করে। অফিসে যেতে দেরী হবে। মায়ের মৃত্যু বার্ষিকী। স্টিভ তাকে ছুটি নেবার জন্য খুব করে বললো। জন্ম-মৃত্যু ছোট ব্যাপার নয়। তার ছোট মেয়েটির জন্মের সময় তিন দিন ছুটি নিয়েছিলো সেই গল্পও শুনতে হলো।

মায়ের ঘরে চুপচাপ বসে থাকলো কিছুক্ষণ। বানু ছবি তুলতে চাইতো না। ছবি বলতে হাতে গোনা কয়েকখানা। তাও ঘোমটার নীচে মুখ অর্ধেক ঢাকা। ফিক্ করে হেসে ফেলে আলী। এমন জাঁদরেল মহিলা আধ হাত ঘোমটা টেনে বসে আছে-দৃশ্যটা হাস্যকরই।

দুপুরের দিকে কবরখানায় গেলো। ওর বাসা থেকে খুব দূরে নয়। মিনিট বিশেক লাগলো। চার্চ-স্ট্রিট দিয়ে উত্তরে সামান্য গেলেই পড়ে। খুব সুন্দর জায়গা। গাছ পালায় ঘেরা। শান্ত-সমাহিত। এক গোছা ফুল এনেছিলো, নাম জানে না। কাগজে লেখা ছিলো। লক্ষ্যও করেনি। ফুলগুলো বানুর কবরের উপর সযত্নে নামিয়ে দিয়ে দু'হাত মোনাজাতের ভঙ্গিতে তুলে সংক্ষিপ্ত দোয়া করলো। বানুর আল্লাহর বিশ্বাস ছিলো ভয়ানক দৃঢ়। আর কিছু না হোক এইটুকুতো আলী তার জন্য করতে পারে। কে জানে হয়তো এই জন্য বানু পুরষ্কৃত হবে। হলেই ভালো। এতো ত্যাগের বিনিময়ে কিছুই পায়নি সে, মনোবেদনা ছাড়া।

পায়ের শব্দ পায়নি, কিন্তু জেসমিনের গন্ধটা নাকে ঝাপটা দিলো। ঘুরতেই থমকে গেলো।

"বশীর ভাইয়ের কাছে শুনলাম।" নিশি নরম গলায় বললো। "কয়েক দিন আগে বাসায় এসেছিলেন। চমকে দিলাম বোধহয়।"

"আশা করিনি।" সহজ হবার চেষ্ঠা করে আলী। "এলে কি করে!"

"গাড়ী চালিয়ে। মামার পুরানো গাড়ীটা আমিই চালাই।"

"টিসা স্কুলে?"

"হ্যাঁ। খালাম্মার কথা বলো। শুনলাম হার্টফেল।"

"হ্যাঁ। হার্টের সমস্যা বহুদিন ধরেই ছিলো। চলো, গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। তাড়া নেই তো?"

"কিছুক্ষণ থাকা যাবে। টিসার স্কুল শেষ হবার আগেই ফিরতে হবে।"

একটা মাঝারী আকৃতির সুইডিশ মেপলের নীচে ঘাসেই বসে পড়ল আলী। নিশি জিনস আর টি সার্ট পরে এসেছে। সে একটু ইতস্তত করে কিছুটা দুরত্ব রেখে মুখোমুখি বসলো। "আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। বাসায় ফোন দিয়ে পেলাম না। একটা চান্স নিলাম, পাবো আশা করিনি।"

আলী হাসলো। "ভাগ্য আমার ভালো। এভাবে মুখোমুখি বসে আবার আলাপ করবো, কে ভেবেছিলো?"

মুখ টিপে হাসলো নিশি। "আজকে ভদ্র ব্যবহার করবো। কিন্তু বেশী আশা করো না।"

"আশা নিয়েই বেঁচে থাকা।" কাব্যি করে বললো।

"ঢং করে কথা হচ্ছে খুব!" ভ্রূ কুঁচকালো নিশি। "বৌ ভাগলো কেন?"

সশব্দেই হেসে ফেললো আলী। "তোমার কথার ধরন একেবারে পাল্টায়নি।"

"আমার কথা থাক। কি হয়েছিলো?"

"ভুল মানুষকে জিজ্ঞেস করছো। শ্বাশুড়ী-বউয়ে না বনলে এই হতভাগার কি দোষ?"

"বশীর ভাই বললো, খুব সুন্দরী নাকি!" নিশির কালচে মুখ লালচে হয়ে উঠেছে।

ঠোঁট টিপে হাসলো আলী। "তোমার চেয়ে নয়।"

"জানতাম এটাই বলবে।" বিরক্তি দেখালো নিশি। "কৌতুহল! তুলনা করছি না। এই বয়সে ওসব ছেলেমানুষী মানায়!"

"দেখে তো এখনো ছুঁড়িই মনে হয়!"

"আবার ঠাট্টা? খালাম্মার সাথে লাগলো কেন পিয়ার?"

আপনমনে হাসলো আলী। "বললে বিশ্বাস করবে না। সকালে ওঠা নিয়ে। নাস্তা বানানো নিয়ে। রান্না বান্না নিয়ে। তরকারীতে ঝাল দেয়া নিয়ে। শাড়ীর রং নিয়ে। চুপচাপ থাকা নিয়ে। অকারণে লাইট জ্বালিয়ে রাখা নিয়ে। নামাজ না পড়া নিয়ে। ঘন ঘন বাবার বাড়ী যাওয়া নিয়ে। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি? এরকম কখনো দেখিনি মাকে। সব কিছুতে ভুল ধরে, সব কিছু নিয়ে মন খারাপ করে। হয়তো আমার উপর অধিকার ছাড়তে কষ্ঠ হচ্ছিলো। পিয়া কিছুদিন সহ্য করেছিলো। তারপর উল্টো হয়ে গেলো পরিস্থিতি। কথায় কথায় ঝগড়া। মায়ের তো যাওয়ার জায়গা নেই। আমিই তার দুনিয়া। পিয়ারতো সেই সমস্যা নেই। সে-ই চলে গেলো। আমাকে একটা শেষ সুযোগ দিয়েছিলো। যে কোন একজনকে বেছে নিতে হবে। বানু মীর্যারই জয় হলো।"

নিশি ঠোঁট কামড়ায়। বানু তাকে খুব পছন্দ করতো। কেন কে জানে? রুবীকে দু'চোখে দেখতে পারতো না। কিছু কিছু মানুষের মাঝে ঝট করেই সেতু তৈরি হয়ে যায়। শত ভিন্নতা থাকলেও হয়। আবার কারো

কারো সাথে কখনই হয় না। অদ্ভুৎ! সে তার হ্যান্ড ব্যাগ থেকে একজোড়া পুরানো মুক্তোর কানের দুল বের করলো।

"খালাম্মা দিয়েছিলেন।"

"এখনো রেখে দিয়েছো?"

"ফেলবো কেন? সুন্দরতো জিনিষটা।" ঢুকিয়ে রাখে।

"মা তোমাকে পছন্দ করতো।"

"হু।" গলা ভারী হয়ে আসে নিশির। বানু তাকে কাঁথা সেলাই শিখিয়েছিলো। পাশাপাশি বসে গভীর আগ্রহে দেখিয়ে দিতো সেলাইয়ের নানান কৌশল। নিজের মায়ের সাথে নিশির সম্পর্ক কিছুটা শীতলই ছিলো। তার ধারণা ছিলো রুবীই মায়ের চোখের মনি। একটা দূরত্ব ছিলো। বয়সের সাথে সাথে দূরত্বটুকু বাড়ছিলো।

"মা মিঠু বলতেও অজ্ঞান ছিলো।" হাসতে হাসতে বলে আলী। "মিঠুর জন্য জীবনে প্রথম ঝাড়ু পেটা খেলাম।"

নিশিও হেসে উঠলো। "মিঠু ভাই বলেছিলো। রুবী আপাকে নিয়ে।"

"হ্যাঁ। মাকে কি বলেছিলো কে জানে, বাসায় ফিরতেই পিঠে ঝাড়ু। মিঠুর সাথে একমাস কথা বলিনি।"

দু'জনে কণ্ঠ মিলিয়ে হেসে ওঠে। পুরানো দিনের ব্যথার স্মৃতিগুলো সবচেয়ে আনন্দের। ব্যথাটুকুর যাতনা থাকে না, আনন্দের অনুভূতিটুকু রয়ে যায়।

"মিঠু ভাই কোথায় এখন?"

"শুনেছি টরোন্টোতে আছে। দেখা হয়নি। জানিও না কোথায় আছে।"

"খোঁজার চেষ্টা করেছো?"

"সেভাবে হয়তো করিনি।" এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে আলী।

"সব কিছু থেকে দূরে সরে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি, রুবী, মিঠু সবার কাছ থেকে। হয়তো সেটাই ভুল।"

নিশি ঘড়িতে চোখ বোলালো। "যেতে হবে। ফিরতেও সময় লাগবে।" ঝট করে উঠেই গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলো নিশি। পিছু নিলো আলী।

"ছুটির দিনে কোথাও যাবে?"

"কোন ঝামেলায় আমি জড়াতে চাই না। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা হলে হোক, তার বেশী নয়।"

“ফোন?”

“না। ধরবো না। যাই।”

নিশি হাত নেড়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভ করে চলে গেলো। ফিরে তাকালো না আর। আলী বিষন্ন মনে আরোও কিছুক্ষণ সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। নিশি কি আরেক বানু মীর্যা হতে চায়? টিসাকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটাতে পারবে? একটা চাঁপা নিশ্বাস ছেড়ে সে নিজেও গাড়ীতে চেপে বসলো। কাজে যাবে। ব্যস্ত থাকলেই ভালো। অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়।

বেশ রাতে বাসায় ফিরলো। একেবারে বাইরে থেকে খেয়েই ফিরেছে। আনসারিং মেশিনে কয়েকটা মেসেজ। পরিচিত মানুষজন। একটা অচেনা কণ্ঠ। মেয়েলী কণ্ঠ। দ্বিধান্বিত। শুনে কম বয়সী মনে হল। খুব নীচু গলায় কথা। “মামা, আমার নাম ডলি। আমাকে আপনি কখনো দেখেননি। আমার মায়ের নাম কলি মীর্যা। আমি টরোন্টোতে এসেছি পিএইচডি করতে। মা বললো একটা ফোন দিতে। দোয়া করবেন।”

মেসেজটা ঝট করেই শেষ হয়ে গেলো। বার দুয়েক শুনলো আলী। কলির মেয়ে ডলি। ওর দ্বিতীয় স্ত্রীর বড় মেয়ে কলি মীর্যা। বয়সে তিন-চার বছরের ছোট হবে। আলী শুনেছিলো তার তিন-চারটি ভাই এবং দুটি-তিনটি বোন আছে। কলি ছাড়া কাউকে কখন দেখেনি। সে একবারই মীর্যা বাড়ী যায়, তারা কেউ কখনও খুলনায় ওদের বাসায় আসেনি। মীর্যা বাড়ীর কারো সাথেই কোন যোগাযোগ ছিলো না। শুধুমাত্র কলি তিন-চারটি চিঠি লিখেছিলো। কোন এক অজানা কারণে এই ভাইটার জন্য তার টান ছিলো। তার চিঠিগুলো সংক্ষিপ্ত ছিলো; কিন্তু একটি কোমল হৃদয়ের ছোঁয়া পাওয়া যেত। আলী কখন প্রত্যুত্তর দেয়নি। বানু তাকে নিজের মাথার দিব্যি দিয়েছিলো। ঐ বাড়ীর সাথে কোন যোগাযোগ রাখলে বানুর মরা মুখ দেখবে।

আলী মেসেজটা মুছলো না। ডলি তার ফোন নাম্বার রাখে নি। কবে টরোন্টো এসেছে তা-ও বলে নি। কোন্ ইউনিভার্সিটিতে কোন্ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে সেই তথ্যটাও দেয়নি। মেয়েটা যদি আর ফোন না করে তাহলে আলী হয়তো তাকেও কখনই দেখবে না। এই শহরের অজস্র মানুষের মাঝে হয়তো কখনো মুখোমুখি হেটে যাবে কিন্তু জানবেও না তাদের ধমনীতে একই রক্তের কণা বইছে। কলির মেয়েকে দেখবার জন্য হঠাৎই আলীর মনটা আকুল হয়ে ওঠে।

৭

কাজে ক'দিন ধরেই খুব চাপ যাচ্ছে। সকালে আসে, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। একটা নতুন প্রডাক্ট দু'সপ্তাহের মধ্যে ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সবার। ফাঁকিবাজ ফয়েজও চোখ মুখ অন্ধকার করে বারো ঘন্টা করে কাজ করছে। নুরজাহান ইতিমধ্যেই দু'বার মুর্ছা যাবার উপক্রম করেছে। আলী কিছুক্ষণ পর পরই খোঁজ নেয়। বেচারীর কিছু একটা হয়ে গেলে তার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। ম্যানেজারি করার অনেক ঝামেলা।

জানালা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দৃষ্টি বাইরে চলে যায়, মুহূর্তের জন্য থমকে যেতেই হয়। চারদিকে যেন রঙের বাহার লেগে গেছে। এই দিকে এখনো রং মাত্র আধা আধি হয়েছে। সবুজের মাঝে ছোপ ছোপ লাল, হলুদ আর কমলার উপস্থিতি যেন আলোর মতো জ্বলছে। এই বিচিত্র বর্ণের পাতা ঝরা গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে পাইন, স্প্রুসের জঙ্গল। চিরসবুজ। তাকিয়ে থাকার মতো দৃশ্য। কিন্তু সেই সৌখিনতা দেখানোর সুযোগ নেই। কাজে ফিরে যেতে হয়। দিনে চৌদ্দবার রিপোর্ট করতে হয় উচ্চপদস্থদের কাছে। কতটুকু শেষ হলো? কতটুকু বাকী আছে? কবে শেষ হবে? ইতিমধ্যেই একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে।

বশীরের ফোন আসতে একটু হাঁফ ছেড়েই বাঁচলো।

"কি ভায়া, ব্যস্ত নাকি?" সতেজ গলা, স্বভাব সুলভ।

"নাকানি চুবানি খাচ্ছি ভাই।"

"উইক এন্ডেও কাজ করছো নাকি?"

"এখনো ঠিক নেই। কাজ এগুনোর উপর নির্ভর করছে। কোন প্ল্যান করেছেন নাকি?" বশীরের কাজই এটা। সে ছেলে মানুষের মতো সর্বক্ষণ এখানে সেখানে বেড়াতে যাবার জল্পনা-কল্পনা করে।

"বিরাট প্ল্যান। লং উইকএন্ডে সবাই হান্টসভিল যাচ্ছি। এলগনকুইন পার্ক। ৯ তারিখে যাবো ১১ তে ফিরবো। মনে আছে তো, থ্যাংক্স গিভিং উইকএন্ড।"

ঈদ, পুজা-পার্বনের মতো এখানেও কিছু কিছু উৎসবের দিন আছে। থ্যাংক্স গিভিং তেমনি একটা দিন। কানাডায় ফসল তোলার উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। দিনটা ছুটি থাকে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সোমবারে পালন করা হয়। ফলে শনি, রবি, সোম মিলিয়ে তিন দিনের ছুটি মেলে। অনেকেই এই সুযোগে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শারদীয় এই বিচিত্র রঙের খেলা দেখতে অনেকেই বোঁচকা-বুচকি বেঁধে রওনা দেবে। বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন হয় না। ওন্টারিও হচ্ছে গাছ পালা, হ্রদের দেশ। দু'ঘন্টা ড্রাইভ করলেই মনে হবে অন্য দেশে এসে পড়েছি।

আলীকে চুপ করে থাকতে দেখে যোগ করলো বশীর, "অনেকেই যাচ্ছে কিন্তু। আসলাম, মইনুল, আরিফ, ঝুনু-সবাই। দু'রাত মোটেলে থাকবো। ঘোরা-ঘুরি হবে, পাহাড়ে চড়া হবে। হৈ হৈ ব্যাপার।"

আলী হেসে ফেললো। "ভালোই টোপ ফেলছেন। একা একা যেতে লজ্জাই করে।

"থাক, আর লাজুক লতা হতে হবে না। সেদিকটাও আমি সামাল দিয়েছি। মামা-মামীও সদলবলে যাচ্ছে।"

"মামা মামী"?

"নিশি পদ্ম। এবার পরিষ্কার হলো?" বশীর চপল গলায় হাসলো।

"সত্যিই?" আলীর বিশ্বাস হয় না। "ওরা সবাই যাচ্ছেন? নিশিও?"

"তাই তো জানলাম। শুনেছিতো খামখেয়ালী। শেষ-মুহূর্তে মত না পাল্টালেই হয়।"

"অসম্ভব নয়। কিন্তু না বলার তো আর সুযোগ রাখলেন না। ই-মেইলে বিস্তারিত জানান।"

বশীর খুব হাসলো। "রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি। ভালোই লাগছে। তোমাকে একাকী দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।"

আলী সশব্দেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। "নিশির সাথে আমার অনেক ইতিহাস আছে। একটাও সুখের না। সুতরাং বেশী আশা না করাই ভালো। আমিও আসছি শুনলে বেঁকেও বসতে পারে।"

"ভেবো না। বলেছি যাচ্ছো। ইমেইলে চেক করো।" বশীর লাইনটা কেটে দেয়। আলী কিছুক্ষণ চুপটি করে বসে থাকে। বুকের মধ্যে চাঁপা একটা আলোড়ন উঠেছে, চেষ্ঠা করেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। মাথার ভেতরে ফুরফুরে একটা অনুভূতি খেলা করতে শুরু করলো। চোখের সামনে অনেক স্মৃতি ঝলক দিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত যাবে তো?

মিঠুর খোঁজ পেতে যত কষ্ট হবে ভেবেছিলো তার একাংশও হলো না। সে প্রচুর অর্থের মালিক। জানা গেলো দেশ ছেড়েছে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার কথা ভেবেই। নইলে লাখ টাকার চাকুরি করছিলো, বাবার এতো সম্পত্তি, দেশ ছাড়তে হবে কেন? "বাংলাদেশ গ্রোসারী"র মালিক আলতাফ চৌধুরী এক নিঃশ্বাসে মিঠুর অর্ধেক জীবন বৃত্তান্ত জানিয়ে দিলো। এমনকি মিঠুর ফোন নাম্বার জোগাড় করে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলো। দু-এক দিনের মধ্যেই।

সেদিন রাতেই আলতাফের ফোন এলো। বিস্তর মানুষকে ঘাটিয়ে ফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। তার কণ্ঠে রীতিমত উত্তেজনা। দীর্ঘদিন পর বাল্যকাল এবং যৌবনের দুই বন্ধুর মধ্যে-দেখা হতে যাচ্ছে তারই জন্য, ভদ্রলোক আনন্দ ধরে রাখতে পারছেন না। তবে সমস্যা একটা আছে। মিঠু নাকি পারতপক্ষে ফোন ধরে না। মেসেজে চলে যায়। মেসেজ শুনে পরে বেছে বেছে ফোন করে।

আলতাফ ফোন করেছিলেন, কোন উত্তর মেলেনি। আলীর ফোন সে নিশ্চয় লুফে নেবে। আলী হুঁ-হাঁ করে তার আবেগটুকু কানে যাবার সময় দিলো। পাক্কা বিশ মিনিট পর ছাড়া পাওয়া গেলো।

নাম্বার দেখে মনে হলো রিচমন্ড হিলের দিকে। ধনী এলাকা। মিঠু তো সেখানেই থাকবে। ধনীর পুত্র। নিজেও মন্দ করেনি। আলীকে হয়তো চিনবেই না। কথাটা মনে আসতেও হাসি পেলো। মিঠুর সাথে সারাটা জীবনই এটা সেটা নিয়ে টানাটানি চলেছেই। কিন্তু তারপরও দু'জনার মধ্যে সেই ভাই সুলভ চির বন্ধনের মতো কিছু একটা আছে। যতই ক্ষোভ থাক, উষ্মা থাক, অবজ্ঞা অবহেলা করা অসম্ভব। ফোন নাম্বারটা কাগজে লিখে মানিব্যাগে সযত্নে ঢুকিয়ে রাখে। ক'দিন যাক। আস্তে ধীরেই ফোন করবে। দু'জনার কেউই টরোন্টো ছেড়ে ঝট করে নড়ছে না। সুতরাং এতো ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ও যে ভালো আছে, ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে শান্তিতে আছে, সেটাই বড় কথা। আলীর জীবনের এই বিশৃংখল অবস্থা তার সামনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মেলে ধরবার কি আছে?

রুবীর স্তাবকের সংখ্যা একাধিক ছিলো। মিঠু বাড়ীতে এসে মায়ের কানে লাগানো এবং এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া বেশী কিছু আর করেনি। বানুর ঝাড়ুর পিটানীতে শরীরে ব্যথা বেদনা হলেও সেটা ভুলতে বেশী সময় লাগে নি। রাগ পড়ার পর গরম তেল দিয়ে সারা পিঠের ক্ষতগুলো অনেকক্ষণ ধরে মালিশ করে দিয়েছে বানু। এমন কদর কালে ভদ্রে পাওয়া যায়।

টুটপাড়ার উঠতি মাস্তানের ছোট ভাই পাগলা কিনুও যে রুবীর সৌন্দর্যের টানে হাবুডুবু খাচ্ছে কে জানতো। পার্কের মহামিলনের খবর তার কানেও পৌঁছে গেলো। ফলাফল ভালো হলো না। কোচিং ক্লাশ থেকে বের হতেই একেবারে পাগলার মুখোমুখি সাথে দুই সাগরেদ। কথা বলে সময় নষ্ঠ করার ছেলে সে নয়। দেখামাত্রই খিস্তি করতে করতে তেড়ে এসে ধুমধাম কিল ঘুষি শুরু করলো। আলী কিছু বুঝে ওঠার আগেই পপাত ধরণীতল হলো। চারদিকে বেশ একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে চারদিকে কাদামাটি। কাপড়-চোপড় সব কাদায় মাখামাখি। কিনু ছুটে এসে ওর পিঠে চেপে বসতে প্রমাদ গুনলো আলী। কিনু শারীরিকভাবে ছোটখাটো হলেও জোঁকের মতো। ঝট করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। তার সাগরেদ দুটো এসে আবার আলীকে চেপে ধরেছে যেন সে উল্টো মারতে না পারে। এই রকম নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে রক্ষাকর্তা হয়ে ছুটে এলো মিঠু। কিনুর গালে ঠাস করে একটা চড় কসালো। সাগরেদ দু'জনকে আঙুল নাচিয়ে শাসালো, "ভাগ! জীবনে আমার সামনে আসবি না।" চোখের পলক ফেলার আগেই তারা উধাও হয়ে গেলো। কিনুর ভাই মাত্র উঠতি মস্তান, মিঠুর বাবা ডাকসাইটে উকিল শুধু নন, রাজনীতিবিদও, বড় বড় মাস্তানেরা তার কথায় ওঠে বসে। কিনু চড় খেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু মিঠুর লম্বাটে, বলশালী শরীর দেখে সাহস করে এগুলো না। তবে তর্জনী ভয়াবহ ভঙ্গিতে নাচাতে নাচাতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শাসাতে লাগলো, "আবার যদি দেখেছি রুবিকে জ্বালাচ্ছে, একেবারে রূপসার জলে ভাসিয়ে দেবো। আমি পাগলা কিনু, আমার কথায় কোন নড় চড় নাই।"

মিঠু ভ্রু কুচকে বললো, "আরেকটা থাপ্পড় খাবি?"

পিছু হটে কিনু। "তোকেও আমি দেখে নেবো। আমাকে চিনিস তুই? খুলনার পুলিশ কমিশনার আমার হাতে। জানিস তুই? তোর বাপকে বেঁধে নিয়ে যাবে..... ।"

এই পর্যায়ে মিঠু তাড়া করায় সে ভোঁ দৌড় দেয়। কাদামাটি ঝেড়ে দুপায়ের উপর দাঁড়াতে একটু কষ্টই হলো। শরীরে ব্যথা তেমন নয়। মনের কষ্টই বেশী। এতোগুলো ছেলেমেয়ের সামনে হেনেস্থা হলো। করিম স্যারের কাছে মেয়েরাও আসে অংক, ইংরেজী পড়তে। ভিন্ন কামরায় বসে।

মিঠু ফিরে এসে গম্ভীর মুখে আলীর প্যান্ট-শার্ট ঝাড়ে। লাভ কিছু হয় না। ভেজা মাটি, লেপটে গেছে কাপড়ে। "একটু সাবধানে থাকিস। এই পাগলা আবার ঝামেলা করবে। একটা চড় খেলেই উল্টে পাল্টে পড়িস, আবার ফষ্টি নষ্টি করতে যাস।"

"ফষ্টি-নষ্টি? " আহত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে আলী। "কথা বলছিলাম। ভালো বিপদে পড়লাম তো।"

মিঠু যাবার আগে বিড়বিড়িয়ে বললো, "আর ভান করিস না। সারা দেশ জানে। দেখে শুনে চলিস। পাগলার সামনে পড়িস না।"

বলাতো সহজ। পাগলা সারা শহর চরকির মাতো ঘুরে বেড়ায়। তার নজরে না পড়ে এই শহরে চলাফেরা করাই দুষ্কর। বাসায় ফিরে মায়ের হাতে আরেক প্রস্থ অবমাননা হতে হলো। এতো বড় ছেলে, পানিতে কিভাবে পা পিছলে পড়ে? কোনদিনই কি ওর কান্ডজ্ঞান হবে না?

ভালোর মধ্যে এইটুকুই যে, পরদিন থেকে মিঠুর সাথে সব বিবাদ চুকে গেলো। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু মিঠু জানে সে না থাকলে আলীর জীবনটা বারো ভাজা করবে কিনু। কোচিং ক্লাশ শেষে সেই আলীকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়ে যায়।

ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কয়েকটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে গেলো। রুবীর সাথে দেখাও হয়নি। মিঠুও রুবীর কথা তোলেনি। আলীও কিছু জানতে চায়নি। তবে মিঠুর যে যাতায়াত আছে বোঝা যায়। সাহস করে তাকে রুবীর কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না। একদিন অবশ্য তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বাসায় এসে হাজির সকল সমস্যার হোতা। খান জাহান আলী রোড ধরে বাসায় ফেরে স্কুল থেকে। একটু ঘুরে বাবু খান রোডে ওদের বাসায় এসেছিলো। ঠিকানা মিঠুর কাছেই পেয়েছে। তাকে দেখে নাচবে না লুকাবে ঠাহর করতে পারেনি আলী। দু'কান লম্বা হাসি দিয়ে শুধু বলেছিলো, "তুমি!"

পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলের রাশিতে ঢেউ তুলে আর ঝকঝকে সাদা দাঁতের রাশি দেখিয়ে খিল খিল করে হেসেছিলো রুবী, "এলাম!"

"কেন? মানে, হঠাৎ এভাবে?" বানুর প্রতিক্রিয়া কি হবে কে জানে।

"সেই পার্কের পর তো আর দেখাই হলো না। শুনলাম কিনু নাকি তোমাকে মেরেছে। একটা জন্তু!"

আলীর হৃদয়টা জুড়িয়ে গেলো। মার খাওয়ার মধ্যে এতো আনন্দ থাকতে পারে কে জানতো। সে দাঁত বের করে হাসলো।

"মারবে কেন? একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছিলো। ভেতরে এসো।"

"তোমার মা রাগ করবেন না তো? মিঠু আমাকে সব বলেছে।"

"সব?"

ফিক্ করে হেসে ফেলে রুবী। "হ্যাঁ। ঝাড়ু খাওয়ার গল্পটা রসিয়ে রসিয়ে করেছে। শুনে আবার একজনের খুব মন খারাপ।"

"কার?"

"নিশির। চোখ ছল ছল হয়ে গেল।"

আলী হাসলো। "ও তো আমাকে বোধ হয় ভালো করে চেনেই না। ছেলে মানুষ।"

"চেনে। ভালো করেই চেনে। মানুষ ছোট কিন্তু পাকনা বুড়ী।" ওদের কথাবার্তা শুনেই বোধ হয় বানু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রুবীর সালামের বিশেষ তোয়াক্কা করে না সে। কপালে তিন খানা ভাঁজ তুলে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে থাকে। "দেখো মেয়ে," রুঢ়ভাবেই বলে সে, "ওর সামনে এখন খুব কঠিন সময়। ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষা টরিক্ষা চলছে। এখন ওর মাথায় প্রেম-পীরিতি ঢুকিও না। যাও, বাসায় যাও। এখন পড়াশুনার সময়। প্রেমের কবিতা লেখার সময় না।"

রুবী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও হাসিটুকু ধরে রাখে। "ওতো ভালো ছাত্র, খালাম্মা। ঠিকই চান্স পেয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।"

"ওকে নিয়ে ভাবছি না।" কঠিন কণ্ঠ বানুর। "তোমাকে নিয়ে ভাবছি। এই বয়সেই এক গন্ডা ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছো। তোমার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ।"

"মা!" প্রতিবাদ করে আলী।

বানু বিড় বিড় করতে করতে রান্নাঘরে ফিরে যায়। রুবী মন খারাপ করে না। ফিসফিসিয়ে বলে,"কি কবিতা লিখেছো?"

"পরে দেবো, যাও এখন। মা রেগে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। আবার আসতে পারে।"

রুবী হাসে। "মা-খালাদের কথায় কিছু মনে করতে হয় না। তারা আমাদের ভালোই চান। কথাটা তো সত্যি। এতোগুলো ছেলে আমাকে পছন্দ করে। কেন করে কে জানে?"

আলী হাসবে না কাঁদবে বুঝলো না। এই মেয়ে বলে কি? আয়নায় কি নিজেকে দেখে? সুন্দরী এবং আলাপী-সারা শহরের কিশোরেরা যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় নি সেটাইতো ভাগ্য।

রুবী যাবার আগে একটা গল্পের বই নিয়ে গেলো। তাকে কথা দিতে হলো এক সপ্তাহ পরে আলী বইটা নিয়ে আসবে। মনে মনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আলী। ওদের বাসায় যাবার একটা ছুতা পাওয়া গেলো। রুবীই তৈরী করলো। কোন একজনকে তো অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেই হবে।

রুবী চলে যাবার পর ওকে অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করার চেষ্টা করে বানু। কিছু বলে না। আলী মায়ের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকে। তার মনের মধ্যে আবার কবিতার বোল উঠছে।

ক্যাডেট কলেজে তারা দু'জনাই চান্স পেয়ে গেলো। বানু একসের মিষ্টি এনে পাড়া পড়শীদের মাঝে বিলি করলো। মিঠুদের বাসায় বিরাট উৎসব হলো। আলীও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলো। পাগলা কিনুও এলো। ঝগড়াঝাটি ভুলে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেলো। আলী মনে মনে প্রমাদ গোনে, এই ভাব কতদিন থাকবে কে জানে। আবার কি নিয়ে মন খারাপ হবে, দেখা যাবে খিস্তি করছে। কিনুকে নিয়ে খুবই ঝামেলা।

ক্যাডেট কলেজে চান্স পাবার খবর শুনে আলীর নানা এলেন তাকে দেখতে। আলী এটা আশা করেনি। খুব ছোটবেলায় সে মায়ের সঙ্গে নানা বাড়ী গিয়েছিলো, তার মনে আছে। তখন তার বয়স খুব সম্ভব সাত-আট। নানীর মৃত্যু উপলক্ষে যাওয়া। তার মনে আছে নানার মেটে বাড়ীর আঙিনায় পা দিয়ে ভয়াবহ কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো বানু। সাদা কাফনের কাপড়ে সর্বাঙ্গে ঢাকা নানীর শরীরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে মা মা বলে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলো। সারা গ্রাম যেন উপচে পড়েছিলো সে দিন সেই অঙ্গনে। নিঃশব্দে তাকিয়ে সেই শোকতপ্তা মেয়েটিকে দেখেছিলো। কেউ এগিয়ে যায়নি তাকে সান্তনা দিতে, কিংবা সরিয়ে আনতে। বানু কতক্ষণ কেঁদেছিল মনে নেই। খুব সম্ভবত সন্ধ্যার দিকে নানীকে কবর দেয়া হলো মূল ভিটেবাড়ীর ঠিক পেছনের আমগাছ তলায়। সেখানে নানার বাবা ও মাকেও কবর দেয়া হয়েছিলো। রাতটুকু মাত্র ছিলো ওরা সেখানে। পরদিন খুব ভোরে, কেউ জেগে উঠবার আগেই একটা রিক্সা ভ্যানে ওদেরকে তুলে দিলেন নানু। এমন নিঃশব্দে বিদায় নেবার ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি আলী, কিন্তু জানতেও চায়নি। বানুর চুপি চুপি কান্না দেখেই বুঝেছিলো অতীত তাকে তাড়া করে ফিরছে। প্রশ্ন করে মা-কে বিব্রত করতে চায়নি সে। অনেক অল্প বয়স থেকেই এসব বুঝতে শিখেছিলো আলী। নানার কোলে শেষবারের মত মাথা রেখে নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়ে ভ্যানে উঠেছিলো বানু। নানুও কাঁদছিলেন আলীকে জড়িয়ে ধরে। চুপি চুপি বলেছিলেন, "অনেক বড় হতে হবে তোকে। ভালো করে পড়া-শুনা করিস। কারো কথায় কান দিবি না।"

সেদিন তার কথার অর্থ আলী বোঝেনি। কিন্তু পরবর্তিতে, তার বয়স যখন আরেকটু বেশী হলো, তখন তার অনুপস্থিত বাবাকে ইঙ্গিত করে যখন কেউ কেউ আকারে ইঙ্গিতে নানান কথা বলতে শুরু করলো, তার বোধোদয় হলো। ছোটবেলা থেকেই ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করেছে। সবারই বাবা আছে, তার নেই। বানু তাকে সোজা সাপটা বলেছে, তার বাবা মারা গেছে। নাম কি ছিল তার? আকবর মীর্যা। হার্টের অসুখ ছিলো। হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল করে মারা যায়। কবর গ্রামের বাড়ীতে। বানু সেখানে যায় না।

কারণ আকবর মীর্যার আরোও দু'টি বউ আছে। তাদের ঘরে ছেলে মেয়ে আছে। বানুর ভয় তারা আলীর ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। ব্যাস, এইটুকুই আলীর জানা দরকার। বানু সোজা সাপটা বলেছে ছেলেকে। বার বার মাকে এসব নিয়ে বিরক্ত করবার মতো ছেলে আলী নয়। কিন্তু এটুকু সে জানতো, অধিকাংশ মানুষই বানুকে নিয়ে পেছনে কথা বলতো। আলীর জন্ম নিয়েও নোংরা কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সয়ে গেছে সেসব। তাদের পরিচিত জগৎ বেড়েছে। অধিকাংশ মানুষই সেসব প্রসঙ্গ আর তোলে না। নানীর মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পেরিয়ে গেছে, বানুও আর গ্রামে যায়নি, গ্রাম থেকেও কেউ আসে নি। যে কারণে নানাকে দেখে অবাকই হলো আলী।

তার নানা, নাসের আলী, খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ছোটখাটো চেহারা, ভয়ানক কালো, ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। কথা বলেন প্রায় ফিসফিসিয়ে। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। অনেক খাবার-দাবার নিয়ে এলেন। আলীকে দেখেই জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদলেন। "খুব খুশী হয়েছিরে নানুভাই। অনেক বড় হবি।"

বানু বাবাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ হাউ-মাউ করে কাঁদলো। নাসের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তার গন্ড বেয়েও ঝরতে থাকলো অশ্রুর রাশি। সেই দৃশ্য দেখে জীবনে প্রথম বারের মতো আলীর দু'চোখ ভিজে ওঠে। বুদ্ধি-সুদ্ধি হবার পর থেকে নিজেকে সে কঠিন হৃদয় বলেই ভাবতে শিখেছে। ঝট করে চোখে পানি-টানি তার আসে না। কঠিন বাস্তবতা হয়তো তার মধ্যে অতিরিক্ত কাঠিন্যের সৃষ্টি করছে, ধরে নিয়েছিলো সে। কিন্তু মায়ের এই কান্না তার হৃদয়কেও দুলিয়ে যায়। এখনও ত্রিশ ছোঁয়নি যে বানুর, তার চাল-চলনে, বলনে যে কাঠিন্য আর দৃঢ়তা সর্বক্ষণ ঝরে পড়ে তার আড়ালে যে বেনী দোলানো বাবা-মায়ের আদুরে ছোট একটা মেয়ে লুকিয়ে আছে, সেটা আলী এই প্রথম বারের মতো উপলব্ধি করে। সে মনে মনে সংকল্প করে, এই মেয়েটিকে সে কখনো দুঃখ দেবে না, ব্যথা দেবে না, অপমান করবে না।

নাসের আলী দু'দিন থাকলেন। তিনি স্কুল মাস্টার হলেও কথা বলেন অল্পই। তবে কথা শুনতে পছন্দ করেন। আলীকে পাশে বসিয়ে অনেক কথা জানতে চাইলেন। দৈনন্দিন সাধারণ ব্যাপার। বন্ধুদের কথা। মায়ের কথা। বানু সেলাইয়ের কাজ-কর্ম ফেলে সারাক্ষণ রান্নাঘরেই পড়ে থাকলো। এতোগুলো বছরে বাবাকে সে যা যা খাওয়াতে পারেনি সেই শূণ্যতা পূরণ করতে উঠে পড়ে লাগলো। কচু ভর্তা থেকে শুরু করে দই বড়া পর্যন্ত বানালো। নাসের খান সামান্যই। তিনি মেয়ের কান্ড দেখে মুচকি মুচকি হাসলেন। ফিসফিসিয়ে আলীকে শুধু বলতে লাগলেন, "একদম পাগলী রে।"

তাকে অবশ্য বিদায় নেবার আগে সব কিছুই চেখে দেখতে হলো। পেটে গোলমাল দেখা দেয়ায় বানু কিছু পেট খারাপের অষুধ এনে দিলো। নাসের ঘন ঘন বাথরুমে যান আর বিড়বিড়িয়ে বলেন, "কি সর্বনাশটা করলি বলতো মা? এখন এতো পথ যাবো কি করে।?"

বানু মুখে আঁচল দিয়ে হাসে। "থাকো আর ক'টা দিন। এতো ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছো কেন?"

"স্কুল খোলা না! ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে না! ওদের কচি মন। দুটো দিনও লাগাম ছাড়া হলে ফিরিয়ে আনতে সময় লাগে। সবাই তো আর তোর মতো মাথা ভালো না।"

বানু গম্ভীর হয়ে যায়। "থাক, ওসব কথা আর তুলো না।"

নাসের বেশ কিছু অষুধ খেয়ে, আল্লাহ-খোদার নাম নিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আলী গেলো তাকে বাসে তুলে দিতে। যাবার আগে আলীর দু'হাত ধরে ভাঙা কণ্ঠে বললেন, "আমার মা-টাকে দেখে রাখিস। যখন ক্যাডেট কলেজে থাকবি, ঘন ঘন চিঠি লিখিস। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় পাথর; কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঝর্নার মত সারাক্ষণ কাঁদছে। তুই-ই ওর জীবন। কখনও দুঃখ দিস নে। রাখবি আমার কথাটা?"

নিঃশব্দে মাথা নেড়েছিলো আলী।

বাসের ভেতরে বসেও অনেকক্ষণ হাত নাড়লেন নাসের। আলীর একবার ইচ্ছা হয়েছিলো সে নানাকে জিজ্ঞেস করে অতীতের কথা। কি হয়েছিলো, কেন তারা এই খুলনা শহরে, একা একা? আকবর মীর্যা বড়লোক ছিলেন বলে শোনা যায়। তাহলে তাদেরকে কেন এই দারিদ্রের মধ্যে থাকতে হচ্ছে? তার মৃত্যুর পর তার ছোট স্ত্রী কেন কিছুই পাবে না? হিসাবে মেলে না। আলীর ক্ষতির ভয়ে এই খুলনা শহরে এসে লুকিয়ে থাকবার যুক্তিটা ঠিক জুৎসই মনে হয় না। এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন রহস্য আছে। আলী কি কোনদিনই জানতে পারবে না? বাসটা এক সময় বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়। আলীর প্রশ্ন করা হয় না। হয়তো একদিন বানুই তাকে বলবে। সে অপেক্ষা করছে মায়ের মুখেই শুনবে। যদি মা তাকে না বলে তাহলে না হয় জানবেই না। কি আসে যায়? পকেটে হাত দিয়ে দু'শো টাকার অস্তিত্ব অনুভব করে। নানা দিয়ে গেছে। তার পুরষ্কার। বাড়ীতে ফিরে সে টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিলো। বানু টাকাটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে। সামান্য কয়েকটা টাকা কিন্তু একজন স্কুল মাস্টারের জন্য যথেষ্টই। মেয়ের হাতে দিতে সাহস পাননি। নেবে না। তাই আলীর হাতে দিয়ে গেছেন। সে টাকাগুলো আলীকে ফিরিয়ে দিলো। "তুই রাখ। কিছু কিনিস।"

আলী মায়ের আঁচলে বেঁধে দেয় টাকাগুলো। "আমার কিছু চাই না।"

বানু চোখ মুছে হাসে। "আমার লক্ষী ছেলে। ক্যাডেট কলেজে যাবি। অনেক কিছু লাগবে। আমার কাছেই থাক।" দুষ্টুমী করে ছেলের চুলটা এলোমেলো করে দেয়। "শুধু মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকিস। ওরা যেমন জীবন গড়তে পারে তেমনি ভাঙতেও পারে।

আলী ভ্রু কুচকায় "ক্যাডেট কলেজে কোন মেয়ে নেই। সব ছেলেরা। সুতরাং তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।"

"ওখানে না থাক, শহরে তো আছে। ভয়ে আমার রাতে ঘুম আসে না।"

"আমি যখন দূরে চলে যাবো, তখন একাকী কিভাবে থাকবে?" আলী প্রসঙ্গ পাল্টায়। অল্প বয়স্কা, সুন্দরী একটা মেয়ে, একা বাসায়। খারাপ মানুষের কি অভাব আছে?

বানু হেসে ফেলে। "আমাকে নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। আমি হবিগঞ্জের মেয়ে। দা দিয়ে কুপিয়ে অর্ধেক করে দেবো।"

আলী তাতে খুব একটা ভরসা পায় না। মনে মনে ঠিক করে যাবার আগে দরজায় দ্বিতীয় একটা হুড়কো লাগিয়ে দেবে। বানু ওর দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখে খিল খিল করে হাসতে থাকে। দুষ্ট মেয়েটিকে আবার দেখতে পায় আলী। তার চোখের কোণ আবার ভিজে উঠতে থাকে। তাড়াতাড়ি বাসার বাইরে পা রাখে। মায়ের সামনে দুর্বলতা ফাঁস করতে তার লজ্জাই হয়। পুরুষের শক্ত হওয়াটাই কাম্য।

পথে দেখা হয়ে যায় কিনুর সাথে। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো "আরে দোস্ত, কই যাস? চল, আমার বাসায় চল।"

"এখন না। পরে। পড়াশুনা আছে।" কাটানোর চেষ্টা করে আলী। এই পাগলের পা ঝাড়াকে সে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খাতির করতে চায় না। আবার কি ঝামেলায় পড়তে হয়।

মানে না কিনু। টানতে টানতে বাসায় নিয়ে তোলে। তার বাড়ীর তিন তলায় চিলে কোঠার ঘরে বড় ভাইয়ের বন্ধুরা প্রতিদিন আড্ডা পেটায়। তারা যখন থাকে না তখন কিনুর সুযোগ। আলীকে বসিয়ে আয়েশ করে সিগ্রেটে আগুন জ্বালায়। গোল্ড ফ্লেক। বড় ভাইয়ের প্যাকেট থেকে খসানো। ধরতে পারলে চটকান খেতে হবে, তবুও করে। বাবা-মায়ের কাছে পয়সা কড়ি পাওয়া যায় না। আলী সিগ্রেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না। নাক চেপে ধরে বসে থাকে। কিনু হাসে। "বেশী ভালো তুই। এতো লেখাপড়া করে কি হবে বল? ক্যাডেট কলেজে গিয়ে স্ট্যান্ড করলেই কি বড়লোক হতে পারবি? দেখিস আমি কত বড়লোক হই। ব্যবসা করতে হবে, ব্যবসা। এধারকা মাল ওধার। হা-হা-হা। কত কায়দা আছে মাল কামানোর। বলবো তোকে। রুবীর পেছন পেছন ঘুরলেও তুই ছেলে খারাপ না। তবে ওর পেছনে ঘুরিস না। পাবি না। বজ্জাত মেয়ে। সবাইকে নাচাতে চায়। সত্যি বলছি। কিনু মিথ্যে বলে না।" সে আপন মনে সিগ্রেট ফোঁকে কিছুক্ষণ।

"একদিন ওর বারোটা বাজাবো আমি।" সিগ্রেটটা মেঝেতে ডলতে ডলতে হঠাৎ বলে কিনু। "দেখিস তুই। দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কষে একটা চুমু খাবো। আমার সাথে ফাজলামী!"

আলীর মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। বলে কি এই পাগল!

"রুবী খুবই ভালো মেয়ে। তুই ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করিস না।" সাহস করে বলে ফেলে।

কঠিন দৃষ্টিতে ওকে দেখে কিনু। "চুপ কর। আমার যা ইচ্ছা আমি করবো, তুই মানা করার কে?" সে একটা নোংরা ইঙ্গিত করে আঙুল দিয়ে। "ওর জীবন আমি বরফ করে দেবো। কি করবি তুই?"

আলী উঠে পড়ে। সে মিঠুর ভয় দেখাতে পারতো কিন্তু কিনুর বাড়ী বসে কিনুকে ভয় দেখাতে যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হলো না। মারপিট শুরু করলে বিপদ হতে পারে। "আমি যাই। কোচিং ক্লাশ আছে।"

"কিসের কোচিং ক্লাশ?" খেকিয়ে ওঠে কিনু। "চান্স পেয়ে গেলি এখনও কোচিং ক্লাশ! গাধা পেয়েছিস আমাকে?"

"আমি করিম স্যারকে সাহায্য করি। যাইরে।" আলী দ্রুত সিড়ি টপকে রাস্তায় নেমে যায়। কিনুকে ভাবার সুযোগ দেয় না। কিনু ওর পিছু পিছু আসে।

"রাগের মাথায় কিছু কথা বলেছি। কাউকে বলিস না কিন্তু।"

"জানি। কিছু বলবো না।"

"তুই অনেক ভালো রে। তোর দরকার একটা ভালো মেয়ে।"

"ওসব কথা আর বলিস না। রুবীর সাথে আমার কিছু নেই।"

"মিথ্যে বলিস না। রুবী সবাইকে তোর কথা বলে।"

থমকে দাড়ায় আলী। " তাই নাকি? কাকে বলেছে? কি বলেছে?"

"আমার ছোট বোন ওর সাথে পড়ে। রুবী সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তুই নাকি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস।"

আলী ঠিক বুঝতে পারে না সে খুশী হবে না লজ্জিত হবে। কিনুও যে সত্যি কথা বলছে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

"আর কি বলেছে?"

"আর কি বলবে রে ভ্যাবলা? তুই কি একা নাকি? ক'দিন আগেও আমার সাথে কেমন হেসে হেসে কথা বলতো জানিস?"

হেসে কথা বললেই যে হৃদয় দেয়া নেয়া হয় না সেটা কিনুকে বলার প্রয়োজন বোধ করে না আলী। সে বিড়বিড়িয়ে একটা কিছু বলে বিদায় নেয়। একটু দ্রুত হাঁটে যেন কিনু ওর সঙ্গ ধরতে না পারে। রুবী তাকে নিয়ে খারাপ কথা বলবে তার বিশ্বাস হয় না। কিনু হিংসুটে, ওর মন বিষিয়ে দেবার জন্য উদ্ভট কথাবার্তা বানিয়ে বলছে। তবুও, নিশ্চিত হবার জন্য কি মিঠুকে জিজ্ঞেস করবে? নাহ। মিঠু রুবীকে বলে দেবে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে আলী। এতো অল্প বয়সেও যে ভালোবাসার অনুভূতি এতো তীব্র হতে পারে নিজে অনুভব না করলে সে হয়তো বিশ্বাসই করতে পারতো না। সারাটাক্ষণ শুধু রুবীর মুখখানাই

তার মানসচক্ষে ভাসে। মেয়েটার মন কাড়া মিষ্টি হাসিটুকু বার বার মনে নাড়া দিয়ে যায়। কোথায় একটা প্যাচা ডেকে ওঠে। ঘুমানোর চেষ্টা করে আলী। ক'দিন বাদেই ঝিনাইদহ চলে যাবে সে, ক্যাডেট কলেজের বদ্ধ চত্বরে কাটবে তার দিন। রুবীর সাথে দেখা হবে এক মাত্র ছুটিতে, তাও কালে ভদ্রে। এতো দুর্বল হয়ে পড়লে তার চলবে না। তাকে কঠিন হতে হবে। বড় হতে হবে, সফল হতে হবে।

ঠিক পাশেই বানুর ঘর। অনেকক্ষণ ধরেই খুব ধীর কণ্ঠের ফুফিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। অদম্য কান্নার আবেগ কমানোর জন্য বালিশে মুখ গুজলে যেমন শব্দ হয়। প্রতি রাতেই শোনে। নি:সঙ্গ এক তরুণী মায়ের আকুতি সে এখন বুঝতে পারে। রুবীকে দেখার পর হৃদয়ে নতুন এই ঝড়কে অনুভব করতে পারার পর, বানুর শুন্যতাটুকুও যেন সে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। তার ইচ্ছে হয় মায়ের হাত ধরে বলে, "সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু সে জানে, কিছুই ঠিক হবে না। অতীত যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে ধুকতে ধুকতে ক্ষয়ে যাবে বানু, কিন্তু পরাজয় মানবে না। কারো সঙ্গ চাইবে না। কাউকে নতুন করে ভালোবাসবে না। সেই সুযোগ তার নিশ্চয় ছিলো। মায়ের চিন্তা থেকে কখন তার ভাবনা রুবীতে গিয়ে স্থির হয় জানে না সে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে রুবীর স্বপ্ন দেখে। সবুজ ঘাসের চত্বরে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে সে। "এসো আলী। কোন ভয় নেই।"

শনিবার রাতে সবাইকে নিজের বাসায় ডাকলো বশীর। প্রতি উইক এন্ডেই জমায়েত হয়ে আড্ডা পেটানোটা রেওয়াজ। ঘুরে ঘুরে একেক জনের বাসায় হয়। অধিকাংশ সময়েই 'পটলাক'। খাওয়া দাওয়ার পর চলে আড্ডাবাজি। ছেলেমেয়েরাও নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করে। সব মিলিয়ে জমজমাট পার্টি। প্রায়শই পার্টি ভাঙে রাত দু'টার দিকে। আলীকে বহুবার আসবার জন্য জোরাজুরি করেছে বশীর। কিন্তু আলী এড়িয়ে গেছে। এই রকম জমজমাট পারিবারিক সম্মেলনে তার একাকীত্বটা বেশী করে নজরে পড়ে। বশীরের বন্ধুদেরকে সে অল্প বিস্তর চেনে। হঠাৎ হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎও হয়। সকলেই খুব ভালো মানুষ। সমস্যা হচ্ছে, তাকে দেখলেই ভাবীরা নানান কৌশলে অবিবাহিত মেয়েদের প্রসঙ্গ তুলে ফেলেন। তাকে একা দেখে তাদের কোমল মন নিশ্চয় দুলে ওঠে। তার একটা হিল্লে না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। কিন্তু সবসময় বশীরকে এড়ানোও সম্ভব নয়। এই পার্টি সে ডেকেছে 'ফল ট্রিপ' এর বিস্তারিত প্ল্যান করবার জন্য। সবাইকে আসতেই হবে। নানান অজুহাত তুলেও নিস্তার পাওয়া গেলো না। মনে মনে অবশ্য একটা আশা আছে হয়তো নিশিরাও আসবে। লজ্জার মাথা খেয়ে বশীরকে জিজ্ঞেস করতে পারলো না।

বশীর স্কারবোরোতে থাকে। ওয়ার্ডেন এবং এগলিনটন এভিনিউয়ের কাছাকাছি বিশাল এলাকা জুড়ে নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সেখানে আধা মিলিয়ন ডলারের পঁচিশ শ বর্গফুটের বাড়ী কিনেছে। বাড়ীর দাম এখানে গগনচুম্বী, কিন্তু তবুও এই এলাকা ছেড়ে নড়তে চায়নি তারা। নানান ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। সাবওয়ে হাঁটা পথ। ড্যানফোর্থের বাঙালী দোকানপাট পাঁচ মিনিটের ড্রাইভ। স্কুলটাও ভালো।

আলীকেও চলে আসতে বলেছিলো বশীর। আলী হেসেছিলো। এখানে হাজার হাজার দেশী মানুষের বসবাস। মাথাটা খারাপ হতে বাকী থাকবে না। মানুষের কৌতুহলের কোন শেষ নেই। একটা সংসার যে কারো দোষ ছাড়াও ভাঙতে পারে এটা কাউকে বোঝানোও দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আলীর যেতে যেতে নটা বাজলো। সবাই দেরী করেই আসে। রাতে দাওয়াত থাকলে আটটা নটার আগে প্রায় কেউই আসে না। আজও তার অন্যথা হলো না। সবাই হাজির হতে হতে দশটা। খাবার দেয়া হলো সাড়ে দশে। বাচ্চারা আর পুরুষেরা আগে, মহিলারা পরে জাকিয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে। লতাভাবী আজ নিজেই রান্না করেছে। 'পটলাক' নয়। একেবারে অভাবনীয় ঘটনা নয়। মহিলাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে।

বশীরদের বন্ধুদের মধ্যে পাঁচটি পরিবার একটু বেশী ঘনিষ্ট। আসলাম-শিলা, মইনুল-নুরী, আরিফ-বেলী, ঝুনু-ডালিয়া এবং বশীররা। তারা সকলেই ভালো চাকরি-বাকরি করেন, কাছাকাছি বয়সের, বাচ্চারাও অপেক্ষাকৃত ছোট। আট-দশ বছরের বন্ধুত্ব। সব কিছু তারা কম-বেশী এক সাথে করেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর আড্ডা বসে। পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা আড্ডা। পাশাপাশি কামরাতেই। প্রায়ই দুই দলের মধ্য বক্রোক্তি এবং ব্যাঙ্গোক্তির ছোড়াছুড়ি হয়। ঝগড়া-ঝাটি, হাসা-হাসি থেকে শুরু করে বালিশ ছোড়া ছুড়িও হয়। আলী একাধারে উপভোগ করে এবং মনোঃকষ্ট পায়। এই আনন্দের শরীক হতে তার ইচ্ছা করে। তাকে সবাই খুব আপন করে নিলেও সঙ্গীনি না থাকায় তার নিজেকে এই পরিবেশে অপাংক্তেয় মনে হয়। ভেবেছিলো নিশিরা আসবে। আসে নি। নিশির মামা-মামীর নাকি অন্য একটা দাওয়াত আছে। অনেক দিন ধরে বলে রেখেছে, যেতেই হলো। বশীর এক ফাঁকে তথ্যটা প্রকাশ করলো। আলী নিরাশ হলেও বাইরে প্রকাশ করলো না। ট্রিপে গেলে নিশির সঙ্গ পাবার অনেক সুযোগ হবে।

ভাবীরা অবশ্য ইতিমধ্যেই তার এবং নিশির পূর্ব সম্পর্কের খবর পেয়ে গেছে। প্রেমের গন্ধ পেলে অধিকাংশ মহিলাদের মনেই টুং টাং বাজনা বেজে ওঠে। এরাও তার ব্যতিক্রম নয়। শিলা এই দলে সবচেয়ে ঠোঁট কাটা। সে সরাসরি বলেই বসলো, "আলী ভাই, আপনাকেতো আর চেনাই যাচ্ছে না। নিশির সাথে দেখা হবার পর আপনারতো চেকনাই বেড়ে গেছে। স্যুট-প্যান্টাতো নতুন মনে হচ্ছে।"

নুরী যোগ করলো, "অন্য সময়তো দেখাই পাওয়া যায় না। আজ নিশ্চয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলো।"

লতা হাসি মুখে ওকে রক্ষা করতে ছুটে এলো। "থামোতো তোমরা। বেচারাকে আর লজ্জা দিও না।"

বেলী গান গাইতে পারে। সে হাত নাচিয়ে গভীর আবেগে গান ধরলো, "তোমারো পথ চেয়ে আছি দাঁড়ায়ে....."

হাসির হল্লা উঠলো। সবাই এলোপাথাড়ি মন্তব্য ছোড়াছুড়ি করলো কিছুক্ষণ। সেই পর্ব শেষ হতে ভাবীদের পক্ষ থেকে সম্মিলিত অনুরোধ এলো নীরবতা ভেঙে আলী নিশি-র পূর্ব প্রেমের কাহিনী বয়ান করার। এই পর্বে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে নিজেকে বন্দী করলো আলী। আপাতত নিস্তার পাওয়া গেলো।

ট্রিপ নিয়ে আলাপ সামান্যই হলো। প্ল্যানিং সবসময় বশীরই করে থাকে। বাকীরা তার উপর আস্থা রেখে প্ল্যান মতো কাজ করে।

কোন কিছু ওলোটপালোট হয়ে গেলে বশীর কিছু মন্দ উক্তি শুনে থাকে। কিন্তু সেটা নিয়ে কেউই খুব একটা উদ্বিগ্ন নয়। সব কিছু কি আর হিসাব মত হয়?

ঠিক হলো পরবর্তি শনিবার সকাল নয়টায় সবাই বশীরের বাসায় জমায়েত হবে। তারা একই সাথে রওনা দেবে। হান্টসভিল যাবার দু'টি ভিন্ন পথ আছে। ৪০১ এবং ৪০০ হাইওয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার কান্ট্রি রোড ধরেও যাওয়া যায়। কান্ট্রি রোড ধরতে হলে এজাক্স যেতে হবে। উল্টো পথ। সেই কারণে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আলী চলে যাবে কান্ট্রি রোড ধরে। বাকীরা নেবে হাইওয়ে ৪০০। দেখা হবে হান্টস ভিলে। সব মিলিয়ে তিন ঘন্টার বেশী লাগার কথা নয়।

৮

সপ্তাহটা যেন ফুড়ুৎ করে শেষ হয়ে গেলো। কাজে ব্যস্ততা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশীই ছিলো। থ্যাংক্স গিভিং এর বন্ধ। লং উইক এন্ড। সবাই হাতের কাজ শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। উদ্বেগহীন মন নিয়ে দিন তিনেকের ছুটিটা কাটাতে চায়। শুক্রবার বিকেল তিনটার মধ্যেই অফিস ফাঁকা হয়ে গেলো। ফয়েজ দুপুরের আগেই সটকে পড়েছে। বাকীরা ধীরে ধীরে বিদায় নিলো। নুরজাহানের হাতের কাজ শেষ হতে হতে পাঁচটা। বাসায় ফিরে যেতে পারতো আলী। কিন্তু বেচারীকে একা ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পাঁচটার দিকে রাস্তায় নামার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। সারা দুনিয়ার গাড়ী রাস্তায়, ব্রেক কষতে কষতে এগুতে হয়। বিশেষ করে হাইওয়েতে উঠবার র‍্যাম্পগুলোতে।

আলীর অবশ্য সেই সমস্যা নেই। সে ঠাসাঠাসি গাড়ীর ভীড় দেখতে দেখতে ইউনিয়ন স্টেশনে এসে গো ট্রেন ধরলো। এক্সপ্রেসটা পাওয়া গেলো না। যার অর্থ মিনিট পনেরো বিশ বেশী লাগবে এজাক্স পৌঁছাতে। লাগুক। সাথে গল্পের বই রাখে। ট্রেনে উঠে একটা সীটে জাঁকিয়ে বসে বইয়ের মধ্যে বুঁদ হয়ে যায়। ফেরার সময় সীট পেতে সমস্যা হয় না। সকালে অফিসে যাবার সময় প্রায়ই হাতল ধরে দাঁড়িয়ে

যেতে হয়। খুব লম্বা যাত্রা নয়। এক্সপ্রেস হলে মাত্র আধ ঘন্টা, মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট। শীতকালে স্নো পড়লে কখনো সখনো একটু আধটু ঝামেলা হয়। তাও কালে ভদ্রে। আলী দাঁড়িয়ে বই পড়ার কায়দাও রপ্ত করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে রডে হেলান নিয়ে চুটকি ঘুমও দিয়ে ফেলে।

বাসায় ফিরে অনেকক্ষণ সোফায় বসে টিভি দেখলো। কাপড়ও পাল্টালো না। এটাই তার সবচেয়ে বড় সমস্যা। বাইরে সে তুখোড়, কাজে চটপটে। সবাই তাকে পছন্দ করে, সম্মান করে। কিন্তু বাসার চার দেয়ালের মধ্যে ঢুকলেই তার সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা যেন ঝট করে নিভে যায়। মা বেঁচে থাকতেও একধরনের শূন্যতা বোধ ছিলো, কিন্তু সেটা সহনীয় ছিলো। গত কয়েকটা বছর ধরে সারা বাড়ীটা যেন হাহাকার করছে।

রাত নয়টার দিকে সোফা ছাড়লো আলী। পোশাক পাল্টালো। হাত মুখ ধুলো। দ্রুত হাতে ট্রিপের জন্য কয়েকটা জামা-কাপড়, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো। ভেবেছিলো রাতে কিছু খাবে না, কিন্তু পেটটা মোচড় দিয়ে উঠতে নীচে রান্নাঘরে নেমে এলো। ফ্যামিলি রুম এবং রান্নাঘরের মধ্যে কোন দেয়াল নেই। টিভি চালিয়ে দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ বানালো। হোল গ্রেইন ব্রেডের মাঝখানে এক টুকরো স্মোকড বীফ। একটু খানি মেয়োনেজ। প্রথম কামড় দেবার সময়েই চোখ গেলো আনসারিং মেশিনে। লাল বাতিটা থেমে থেমে জ্বলছে। মেসেজ আছে। খুব কম মানুষই ফোন করে ওকে। বিশেষ করে বাসায়। পরিচিতরা সেল ফোনেই রিং করে। কৌতুহল বশেই মেসেজটা শুনলো আলী। প্রথম কয়েক মুহুর্ত নিঃশব্দতা। তারপর পেছনে একটা নারীকণ্ঠের ফিসফিসানি। পরিশেষে একটি অল্প বয়স্ক মেয়ের কণ্ঠ শোনা গেলো। "আংকেল, তুমি যাচ্ছো তো? আমরা কিন্তু যাবো।"

আবার ফিসফিসানি। মা-মেয়েতে মতের মিল হলো না। আবার টিসার কণ্ঠ। "মা বলছে হান্টসভিলে দেখা হবে। খোদা হাফেজ।"

আলী মেসেজটা তিন-চারবার শুনলো। তার মনটা উদাস হয়ে গেলো। সে স্যান্ডউইচটাকে ফ্রিজে চালান করে দিয়ে, এক গ্লাশ কোক নিয়ে উপরে বেড়রুমে গিয়ে গান চালিয়ে দিলো। হেমন্তের দুঃখের, বিরহের গান তার সবসময়েই পছন্দ। সেগুলোই চালিয়ে দিলো। তার মনটা হঠাৎ করেই এতো অসম্ভব হাল্কা লাগছে যে আনন্দে তার লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছে। গান শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে গেলো। গভীর ঘুম।

প্রায় ২৫০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে মাসকোকা, ওন্টারিওর জনপ্রিয় এলাকা গুলোর একটা। জনবহুল শহরগুলো থেকে দেড়-দুই ঘন্টা ড্রাইভিংয়ের মধ্যে ছুটি কাটানোর মনোরম জায়গা। পুরো এলাকাটা জুড়েই চোখ জুড়ানো নানান আকারের হ্রদের মেলা, ঝকঝকে পরিষ্কার পানি। ঘন হয়ে জন্মে থাকা উঁচু পাইনের জঙ্গল, গ্রানাইট পাথরের পাহাড়ের শরীর বেয়ে গর্জে নেমে আসা জলপ্রপাত, আর ছবির মতো সুন্দর ছোট ছোট গ্রাম সব মিলিয়ে হৃদয় কাড়া এক পরিবেশ। মাসকোকার উত্তর দিকের সবচেয়ে সুন্দর

শহর হান্টসভিল। বিখ্যাত এলগনকুইন পার্কে যাবার পথে গড়ে উঠেছে শহরটা। জুন মাসে 'জি-এইট' এর 'ওয়ার্ল্ড সামিট' হয়ে গেলো এই শহরে। এমন ছোটখাটো একটা শহরে এতো বড় একটা সম্মেলন করা সম্ভব কেউ ভাবেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক মতই হয়ে গেছে। জি-এইট এর বদান্যতাই বশীর এই শহরকে গন্তব্য হিসাবে বেছে নিয়েছে কিনা আলী জানে না। তবে কাগজে কিছুদিন ধরেই এতো ভালো ভালো কথা পড়ছে যে তার কৌতুহলই বেড়ে গেছে।

বাসা থেকে বের হতে নটার মতো বেজে গেলো। ঘুম ভাঙতেই দেরী হলো। অনেকদিন এমন শান্তিতে ঘুমায় নি। রেডি হয়ে মাল সামান গাড়ীতে তুলে বশীরকে ফোন দিলো। জানা গেলো সবাই সময় মতই বেরিয়ে যাবে। দুপুর দুইটার আগে মোটেলে ঢোকা না গেলেও অসুবিধা নেই। পথে একটা জলপ্রপাত আছে। সেটা দেখে যাবার ইচ্ছা। সেখানে দু-এক ঘন্টাতো লাগবেই। জলপ্রপাতের নাম হাই ফলস। ব্রেসব্রিজ শহরে। হান্টসভিল থেকে কাছেই। ঠিক হয়েছে সবাই সেখানেই জমায়েত হবে। পরে দল বেঁধে মোটেলে যাবে। ব্রক স্ট্রিট নিয়ে উত্তরে গাড়ী ছোটালো আলী। এটাই কিছু পরে গিয়ে প্রভিনশিয়াল হাইওয়ে ১২ হয়ে যাবে। ৮০ কিলোমিটার যাবার পর নিতে হবে কান্ট্রি রোড ১১। আরোও ৭০ কিলোমিটার গেলে হান্টসভিল। দুরত্ব হিসেব করলে কাছেই। যদিও এই সব রাস্তায় বেশী জোরে গাড়ী চালানো যায় না। আলী ৮০ কিলোমিটারের উপর খুব একটা যাচ্ছে না। ছোট ছোট শহরগুলোর শেরিফদের একটা প্রিয় কাজ হচ্ছে বড় শহর থেকে বেড়াতে আসা মানুষজনদেরকে ধরে ধরে ট্রাফিক টিকেট লাগানো। কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কে জানে? জোরে চালানোর তাগিদও অনুভব করছে না অবশ্য। বেড়াতে যাবার আমেজটা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করছে।

অক্টোবারের প্রথম সপ্তাহেই সাধারণত বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব চলে আসে। এবার আবহাওয়া খুব খাপছাড়া হয়েছে। এই ঠান্ডা, এই গরম। হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি। সবাই একটু ভয়ে ভয়ে ছিলো আবহাওয়া নিয়ে। ঠান্ডা আর বৃষ্টি থাকলে বেড়াতে যাবার আনন্দ পুরোটাই মাটি। সৌভাগ্য যে আবহাওয়ার পুর্বাভাষে তেমন কোন আলামত দেখা যায় নি। আজকের দিনটা রৌদ্রোজ্জ্বল, ঠান্ডা একেবারেই নেই। আলী সামান্য জানালা খুলে রেখেছে। বাতাসটা ভালো লাগছে। দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খামার, বাংলো বাড়ী, চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, কাঠের বেড়া দেয়া চারণক্ষেত্রের ভেতরে অলসভঙ্গিতে জাবর কাটছে বিশাল দর্শন গরুর দল। খুব ফাঁকা ফাঁকা পরিবেশ। মানুষ জন বলতে কাউকেই দেখা যায় না। দূরে হঠাৎ হঠাৎ বনানী উঁকি দিয়ে যায়। কোনটা চিরসবুজ পাইনের কোনটা সাইপ্রাসের আবার কোনটা পাতাঝরা মেপল, ওক, বার্চ, বিচ সহ আরোও নানাধরনের গাছপালার। কোথাও পাতা ঝরা গাছগুলো নানান রঙের ছটায় হেসে উঠেছে, কোথাও আবার সবুজ কাটিয়ে মাত্র রঙের প্রকাশ ঘটছে। যত উত্তরে যাওয়া যাবে পাতার রং ততই উজ্জ্বল, তীব্র হবার কথা। এই তীব্রতা থাকে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই হঠাৎ করে ঝরে পড়তে শুরু করে। দেখতে দেখতে বিশাল ঝাকড়া গাছ একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায়। দেখলেও মন খারাপ হয়।

ঠোটের কোণে আলতো একটা হাসি চেপে বসে থাকে। আলী ইচ্ছে করেও সেটাকে মুছে ফেলতে পারে না। প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনের কি অসম্ভব মিল। কিভাবে সময়ের সাথে সবার মন বদলে যায়, জীবন পাল্টে যায়। স্মৃতির পাতায় সব লেখা থাকে। কম-বেশী সব।

ক্যাডেট কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি। যদিও মিঠু এবং আলী এই দিনটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করেছিলো, বাস্তবে সবকিছু একইভাবে ঘটলো না। মিঠু আশা করেছিলো তার বাবা-মা হয়তো আলীকে তাদের গাড়ীতে নিয়ে নেবেন। নিজেদের টয়োটা করোল্লা থাকলেও একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলেন ওর বাবা। বেশ কয়েক ঘন্টার রাস্তা। একটু হাত পা ছড়িয়ে যাওয়া যাবে। তাছাড়া এটা সেটা করতে করতে মিঠুর জিনিষপত্রের সংখ্যাও অনেক হয়ে গেছে। মিঠু সাহস করে মাকে বলেছিলো আলী ও তার মাকেও সাথে নিয়ে নিতে। তার বাবার বেশ মেজাজ। হঠাৎ ধমকে ওঠেন। কথাবার্তা যা বলার মাকেই বলে সে। মা হয়তো বাবাকে বলে থাকবেন। কাজ হয়নি। আলীকে সাথে নেয়া হলো না।

বানু নিজেই বাসে চেপে আলীকে নিয়ে ঝিনাইদহ গেলো। বাস স্ট্যান্ড থেকে মাইল খানেক পথ ক্যাডেট কলেজের প্রাচীর ঘেরা বিশাল এলাকা। রিক্সা নিতে হলো। মালপত্র বলতে একটা ছোট বাক্স। যা না নিলেই নয় শুধু সেগুলোই কিনেছে বানু। টাকা-পয়সা থাকুক আর না থাকুক ছেলেকে বিলাসিতা শেখাতে চায় না।

ক্যাডেট কলেজের চত্বরে ঢুকে দু'জনাই একটু থমকে গেলো। সব কিছু ছবির মতো, ছিম-ছাম, গোছানো। প্রথমেই পড়ে শিক্ষকদের ক্যাম্পাস। গাছ-পালায় ছাওয়া, ছায়া সুশীতল। আরেকটু সামনে এগুতে চোখ পড়ে শ্বেতধবল একাডেমী বিল্ডিংএর উপর, স্থাপত্যে পারসিয়ান ছোঁয়া আছে, উপরে গম্বুজ। একাডেমী বিল্ডিংএর ঠিক মুখোমুখি বিশাল আয়তাকার মাঠ। এই মাঠেই রয়েছে ফুটবল খেলার একাধিক মাঠ, বেশ কয়েকটি ভলিবল গ্রাউন্ড, ট্র্যাক এন্ড ফিল্ডের ডিম্বাকৃতি দৌড়ের মাঠ এবং পাশাপাশি দাঁড়ানো তিনটা বাস্কেটবল গ্রাউন্ড। বিশাল এই মাঠকে ঘিরে এসফল্টের রাস্তা। পাশাপাশি তিনটি ছাত্রাবাস-খায়বার হাউজ, বদর হাউজ, হুনাইন হাউজ। ইতিহাসের তিন বিখ্যাত যুদ্ধের নামে নাম।

নতুন ক্যাডেট এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনে সরগরম হয়ে আছে একাডেমি ব্লক। এতো লোকজন দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো বানু। কিন্তু দেখা গেলো সবকিছু সহজ-সুন্দরভাবেই হয়ে গেলো। এমন অপরিচিত জায়গায় অচেনা মানুষদের মাঝখানে ছেলেটা কিভাবে থাকবে ভেবে দুঃশ্চিন্তা হলেও সে তা বুঝতে দিলো না। মিঠু থাকায় তবুও একটু ভরসা। চালাক চতুর ছেলে। আলীর মতো হাবাগোবা না। মিঠুর বাবা-মা বানুকে কোন গুরুত্ব না দিলেও মিঠু স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে ভরসা দিয়েছে। ছেলেটাকে পছন্দ করে বানু। বড়লোকের ছেলে হলেও মনে কোন অহমিকা নেই। অনেক কষ্ঠে অশ্রু সম্বরণ করে আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে ফিরে গেল বানু। রাত হবার আগে খুলনা ফিরতে হবে। একা মেয়েমানুষ। তার

ভয়ই করে। বাসে উঠে চোখে আচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলো। আলীকে ছাড়া কখন থাকেনি। শূন্য ঘরে একাকী কিভাবে থাকবে?

আলী আশা করেছিলো সে এবং মিঠু একই হাউজে সিট পাবে। বাস্তবে তা হলো না। সে পেলো হুনাইন হাউসে, মিঠু খায়বার হাউসে। প্রাথমিক অনুষ্ঠান পর্ব সারা হতে নতুন ক্যাডেটদের তাদের নিজস্ব হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিটি হাউসে ১৭জন। মিঠু নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে নিজ পথে চলে গেছে। আলী ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। শিক্ষক, ছাত্র, পরিবেশ সবই অপরিচিত। নতুন জায়গায় গিয়ে ঝট করে নিজেকে মানিয়ে নেয়া তার জন্য কষ্টসাধ্য। বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের মুখোমুখি হুনাইন হাউস। দু'তলা। সারি বেঁধে থাকা একই ধরনের কয়েকটি রুমের একটিতে সবাইকে ঢোকানো হলো। নীচতলায়। ১৭ জন কাঁচু মাচু মুখে সার বেধে দাঁড়িয়ে গেলো। কামরাটি বেশ লম্বা, সুপ্রশস্ত। কামরার প্রতি পাশে পাঁচটি করে সিঙ্গেল বেড, সাথে আলমারী। দেখেই বোঝা যায় সব মিলিয়ে ১০ জনের বসবাস এই খানে।

কামরাটির দৈর্ঘ্য বরাবর লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা ১৭জন। ক্লাশ এইটের বেশ কয়েকটি ছেলে কৌতুহল চকচকে মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কারোরই বুঝতে বাকী নেই আপাতত এরাই তাদের ভাগ্য বিধাতা। প্রতিটি নতুন ক্যাডেটকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবার জন্য কর্তৃপক্ষ ক্লাশ এইটের একজন করে ছেলেকে নিয়োগ করে। তাদের পদবী লকার পার্টনার। আলীর লকার পার্টনার জহীর। ছোটখাটো মানুষ, কটমট করে তাকিয়ে থাকে, কথাবার্তা বলে কড়া গলায়। এতোদিন তারাই ছিলো সবচেয়ে জুনিয়র। নতুন ব্যাচ আসায় তাদের পদোন্নতি হয়েছে। ব্যাপারটা যে জহীর পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। জহীর একা নয়, ক্লাশ এইটের প্রতিটি ছেলে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে পরিবর্তনের আমেজটুকু।

ঘন্টাখানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে প্রচুর বকবকানী শুনতে হলো। কিছুক্ষণ চললো পরিচিতি পর্ব, তারপর দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য, নিয়ম-কানুন, বিরতির কোন লক্ষণ নেই। প্রথম দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছিলো আলী, কিন্তু ব্লাডারে যখন চাপ পড়তে শুরু করলো তখন থেকে মন স্থির করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে শুধু অপেক্ষা করছে কখন এই আসর ভাঙবে, কখন সে বাথরুমে গিয়ে বোঝা হালকা করবে। সাহস করে কি কাউকে বলবে? কি বলবে? বাথরুমে যাবো? যদি রেগে যায়? প্রচন্ড চাপে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে, আর কতক্ষণ ঠেকানো যাবে কে জানে? কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না। সবাই ঠায় দাড়িয়ে আছে, এর মাঝ থেকে সে বাথরুমে যেতে চাইলে কেমন দেখাবে? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয় সব একইসাথে কাজ করছে। শরীরের ভার এই পা-ঐ পা করে কিছুক্ষণ ঠেকানো গেলো। শেষতক কোন কিছুতেই কোন কাজ হলো না। হাফ প্যান্টের নীচে থেকে চিকন এক জলের ধারা চুপি চুপি পা বেয়ে নীচে নেমে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। দু'চোখ বুঁজে মনে মনে লক্ষ দোয়া দরুদ পড়ছে আলী। কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে নিশ্চয় দুনিয়া ভেঙে পড়বে। তার রীতিমতো কান্না

পেয়ে যাচ্ছে। আর একটু ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না? পানির ধারাটা বন্ধ হয়েছে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালো আলী। নাহ, কেউ দেখেনি। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে কষ্ঠ হয় ওর।

আরও কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিলো হিসাব নেই আলীর। মনে হলো অনন্তকাল। শেষ পর্যন্ত ছুটি মিললো। সবাইকে তাদের নিজস্ব কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। দোতালায়। দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখার আগে আলী শুনতে পেলো জহীর বিরক্ত কণ্ঠে বলছে, "এখানে পানি ফেললো কে? মপটা কই?" আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো পাটের হ্যান্ডেলয়ালা মপ দিয়ে মেঝেতে জমে থাকা প্রশ্রাব মুছছে জহীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ভয়ানক বেইজ্জতির হাত থেকে বাঁচা গেলো।

ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলো আলী। দিনগুলো শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যায়। সবকিছু এমন গত বাঁধা। ঘন্টি বাজার সাথে এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে জীবন। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে দৌড়াও প্যারেড করতে, নাস্তা সেরে একাডেমী ব্লকে ক্লাশ, স্ন্যাক বিরতি, লাঞ্চ, দুপুরে একাডেমী ব্লকে পড়তে যাওয়া, বিকালে মাঠে খেলা, গোছল, নামাজ, আবার পড়া, ডিনার, টিভি, ঘুম। নতুন ক্যাডেটদেরকে প্রথম সেমিষ্টারের শেষের দিকে প্রদর্শনীমূলক একটা প্যারেডে অংশগ্রহণ করতে হয়- নভিসেস প্যারেড। আর্মির সুবেদাররা নিজে উপস্থিত থেকে প্যারেড শেখায়। তাদের হৈ চৈ আর হুংকারে কান পাতা দায়। পা তুলতে চীৎকার, পা নামাতে চীৎকার। ভালো ফ্যাসাদ। এতো চেঁচায় কি করে একটা মানুষ?

মিঠুর সাথে প্রায়ই দেখা হয়। খুব একটা কথা অবশ্য হয় না। সময় কই.? একটার পর একটা লেগেই আছে। খেলার মাঠে দু'একটা কথা বলার সুযোগ মেলে। ভালোই আছে সে। চটপটে ছেলে। কথাবার্তা বলতে পারে। ইতিমধ্যেই অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। আকার আকৃতিতেও অন্যদের তুলনায় বড়র দিকেই। বন্ধুদের কেউ ওকে ঘাটাতে সাহস পায় না। আলীর অবস্থান ঠিক ভিন্ন মেরুতে। কয়েকজনের সাথে পরিচয়, বন্ধুত্ব হলেও কোন কিছুই তার ভালো লাগে না। আর্মিতে যাবার তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। এই ধপাস ধপাস পা ফেলে মার্চ করার কোন তাগিদ সে খুঁজে পায় না। এতো ছুটাছুটিও তার ভালো লাগে না। একটু আয়েশ করে বসে বই পড়ার ফুরসত নেই। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেই ডাক আসে- লেফট, রাইট; লেফট, রাইট। মায়ের উপর তার রাগই হয়ে। কোন কুক্ষণে এই বন্দীশালায় পাঠানোর কুবুদ্ধি এসেছিলো তার মাথায় কে জানে।

মিঠু ওকে নানান বুদ্ধি দেয়। ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে কে ভালো কে খারাপ সেই তথ্য জোগান দেয়। কোন শিক্ষকের চোখ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কোন সিনিয়র গায়ে হাত তোলে, ডাইনিং হলে কিভাবে এক্সট্রা খাবার পাওয়া যাবে- এমনি হাজারো খবর পাওয়া যায়। ক'দিন আগে রুবীকে নিয়ে যে ওদের মধ্যে মন কষাকষি হয়েছিলো না জানলে কেউ ধারনাও করতে পারবে না। মিঠুর সাথে পূর্ব বন্ধুত্বতা আছে জানতে পারার পর আলীর সম্মান কিঞ্চিৎ বেড়ে গেলো। দু'একজন যেঁচে পড়ে এসে আলাপ করলো। কিন্তু বন্ধুত্ব খুব বেশী ছেলের সাথে হলো না। সগীর এবং বাকেরের সাথে তার কিছুটা ঘনিষ্টতা হলো। দু'জনাই তার

রুম মেট। সগীর স্বাস্থ্যবান; সরল মনা বাকের বয়সে কিছু বড়, কুচকুচে কালো, হাসি খুশী। বক্সিং শেখাতে গিয়ে এক ঘুষিতে আলীর চোখে মুখে শর্ষে ফুল ঝরিয়ে দেয়।

মাসের শেষ শনিবার প্যারেন্টস্ ডে। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করার সুযোগ। একাডেমী ব্লকে দেখা করতে হয়। মিঠুর বাবা-মা এলেন। ফিরে এসে আলীর কাছে কিছু খাবার দাবার দিয়ে গেলো মিঠু। মিষ্টি। লাড্ডু। আলীর পছন্দ। বানু আসতে চেয়েছিলো। আলী তার চিঠিতে বিশেষ করে মানা করেছে। এইসব বিলাসিতা যে তাদের সাজে না সে জানে। ক'দিন বাদেই ছুটি হবে, তখনতো দেখা হবেই। আশ্চর্য হলেও সত্য, মায়ের চেয়ে রুবীকেই তার বেশী দেখতে ইচ্ছা করে। নিজের কাছে সত্যটা স্বীকার করতে তার লজ্জাই হয়। মায়ের সাথে রুবীর কি তুলনা হয়? তাছাড়া, রুবী হয়তো তাকে ভুলেই গেছে। চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। কে জানে হয়তো কিনুর কথাই সত্য। রুবী হয়তো এখন অন্য কোন ছেলের সাথে হাসি মুখে কথা বলে। সে খুব আশা করেছিলো রুবী তাকে চিঠি লিখবে। মিঠুর সাথে তার নিশ্চয় যোগাযোগ আছে। মিঠুর কাছ থেকেই আলীর ঠিকানা পেতে পারতো। কিংবা আলীর বাসায় গেলে বানুর কাছেও পাওয়া যেত। বানুর রাগ হতো কিন্তু ঠিকানাটা ঠিকই দিতো। সে নিজে কি একটা চিঠি লিখবে রুবীকে? কার হাতে পড়বে কে জানে? শেষে কেলেংকারি হবে। মিঠুকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হয়। রুবীকে নিয়ে ওদের মধ্যে আলাপ হয় না। সেটাই ভালো। অযথা ঝামেলা তৈরী করার কোন অর্থ হয় না।

দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যায়। ভোর হতে না হতে রাত নেমে আসে। এক মুহূর্ত বিরাম নেই। গৎ বাঁধা জীবন। মানিয়ে নিতে হয়। মেধাবী ছাত্র হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ পেয়েছে সে. নামে মাত্র ফি দিতে হয়। এই সুযোগ কোন কারণেই হারানোর মত বিলাসিতা দেখানো তার সাজবে না। রাতে ডর্মে আঁধার নেমে আসার পর মশারীর নিচে চোখ খুলে চুপচাপ শুয়ে থাকে, ঝট করে ঘুম আসে না। সগীর এবং বাকের একই ডর্মে কিন্তু কথা বলা সম্ভব না। প্রতিটি রুম বা ডর্মে একজন করে ডর্ম লিডার এবং এসিসট্যান্ট ডর্ম লিডার। দু'জনাই ক্লাস নাইনের। কথা বার্তা বললেই বকা খেতে হবে। কেউ কেউ নাকি মারধোরও করে, শুনেছে আলী। তার হাউসে এখনও তেমন কিছু ঘটেনি কিন্তু বন্ধুদের মুখে শুনেছে খায়বার হাউসে নিয়ম ভাঙার জন্য কয়েকজনকে প্রচুর পেটানো হয়েছে। ভয় ছিলো মিঠুও হয়তো সেই দলে পড়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে এখানকার নিয়ম কানুনের সাথে ভালোই মানিয়ে নিয়েছে সে। চালাক ছেলে। কাকে তোয়াজ করে চলতে হবে এবং কখন ভদ্র হয়ে থাকতে হবে সেটা মিঠু ঝট করেই ধরে ফেলেছে। সুযোগ পেলেই আলীকে ছবক দেয়।

আলী মনোযোগ দিয়ে শোনে। মনে মনে হাসে। মিঠু এবং তার মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যে কোন পরিস্থিতিতেই হাত তুলে মিঠু পটাপট কথা বলতে পারে, আলীর মুখ দিয়ে কিছুতেই কথা বেরুতে চায় না। পড়ুয়া বলে ইতিমধ্যেই তার নাম হয়ে গেছে। কিন্তু ক্লাশে কথাবার্তা বলে না বিধায় শিক্ষকেরা তার প্রতি খুব একটা সন্তুষ্ঠ নয়। মুখচোরা হবার অনেক সমস্যা।

মাঝে মাঝে ঘুম আসতে অনেক দেরী হয়। সারা দিনের শত পরিশ্রমেও মন ক্লান্ত হয় না। শরীর নেতিয়ে থাকে কিন্তু মাথার মধ্যে নানান চিন্তার ছোটাছুটি। রুবী তার অনেকখানি জুড়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে নিজেই অবাক হয়ে ভাবে কেন এই মেয়েটার কথা সারাক্ষণ তার মাথায় ঘোরে। সে নিশ্চয় তার কথা তেমন করে ভাবে না। কেনই বা ভাববে?

হাউসের পেছনে বাগান করার জন্য বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তারপরেই ইটের উচুঁ দেয়াল। ওপাশে ফসলের মাঠ। আরো দূরে গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে চাষীদের কুটির। সুযোগ পেলে দিনের বেলা মুগ্ধ চোখে সেই দৃশ্য দেখে আলী। সবকিছু এতো চুপচাপ লাগে, ছবির মতো সাজানো লাগে। মনে হয় কোন শিল্পী সযত্নে তুলি দিয়ে এঁকেছে গ্রাম বাংলার সবুজ শ্যামল রূপ। শুধু সৌন্দর্যটুকুই ধরা পড়েছে, কোন যন্ত্রণা কিংবা নোংরামির ছায়া পড়েনি।

খুলনার জন্য তার মন টানে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা, বই ভাড়া করে পড়া, মাঝে মাঝে মাকে লুকিয়ে সিনেমা দেখা, জেলা স্কুলের মাঠে খেলা-আবার সেই জীবনে ফিরে যেতে পারলে ভালো হতো। কুয়াশা সিরিজের কি নতুন কোন বই বেরিয়েছে? ছুটিতে ফিরে গেলে পড়তে পারবে। এই চিন্তাটা তার মাথার মধ্যে একটা ভালো লাগার স্রোত বইয়ে দেয়। রুবির কথা ভাবতে ভাবতে সে একসময় ঘুমিয়ে যায়।

৯

শত ব্যস্ততার মাঝে আবার ট্যালেন্ট শো'র বাছাইপর্ব শুরু হলো। দেখা গেলো নতুন ক্যাডেটদের অধিকাংশরই কোন না কোন দিকে ব্যুৎপত্তি আছে। যে গুটিকতক হতভাগা না পারে গান গাইতে, না পারে কবিতা বলতে, না জানে মনোরঞ্জনের অন্য কোন মোক্ষম উপায় তাদের মধ্যমণি হয়ে উঠলো আলী। মঞ্চে উঠে কখনও কিছু করেনি, করবে বলে ভাবেও নি। মিঠু দেখা গেলো হঠাৎ করেই কৌতুক বলায় বেশ পটুত্ব অর্জন করে ফেললো। গায়ক এবং আবৃত্তিকারদের সাথে সাথে তারও ট্যালেন্ট শোতে স্থান হয়ে গেলো। বন্ধুর কৃতিত্বে আলীর বুক এক হাত ফুলে গেলো। কিছু একটা গুণ থাকলে ভালোই হতো, অনুভব করে সে। গুণবানরা ঝট করেই সকলের নজরে পড়ে গেলো। শিক্ষকরা থেকে শুরু করে সিনিয়র ক্যাডেটরাও তাদের সাথে যথেষ্ট সৌহার্দ দেখিয়ে কথা বলেন।

একদিন রাতে ষ্টাডি টাইমের মাঝে স্বল্প সময়ের বিরতির মধ্যে আলীকে ডেকে একটু নিরালাতে নিয়ে এলো মিঠু। তার হাবভাব দেখেই একটু ঘাবড়ে যায় আলী। পকেট থেকে ছোট একটা কাগজ বের করে মিঠু। "পড়।"

আলীর বুকটা ধক করে ওঠে। নিশ্চয় রুবীর চিঠি। মিঠুরই জয় হলো। ওকেই চিঠি লিখেছে সে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে থমথমে মুখে বলে, "আমাকে পড়তে বলছিস কেন? কার চিঠি?"

"পড় না।" মিঠু অসহিষ্ণু।

চিঠির ভাঁজ খুলে ফেলতেই নীল কালির লেখা চোখে পড়লো। বাঁকানো, পুরুষালী লেখা। রুবীর লেখা সে দেখেছে। এই লেখা রুবীর নয়। ভ্রু কুঁচকে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে আলী। পাঁচ-ছয় লাইন। "প্রাণপ্রিয় মিঠু, তুমি জানো না আমি তোমাকে কত খানি ভালোবাসি। তোমার মিষ্টি হাসি দেখলেই আমার বুকটা কেঁপে উঠে। তোমার যে কোন প্রয়োজনে আমার কাছে চলে এসো। এই চিঠিটা কাউকে দেখিওনা। তোমার লাবলু ভাই।"

আলীর সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে উঠলো। "লাবলু ভাই টা কে?"

"ক্লাশ টুয়েলভে পড়ে। আমাদের হলে থাকে।" মিঠু শুষ্ক মুখে বলে।

"তোকে এই চিঠি কেন দিয়েছে?" আলীর মাথায় কিছুই ঢোকে না।

"কেন দিয়েছে বুঝছিস না।" ধমকে ওঠে মিঠু। "আলুর দোষ আছে"।

"আলুর দোষ কি?"

"এটাও জানিস না? ছেলে-ছেলে প্রেম করে। ছিঃছিঃ! কাউকে বলবি না কিন্তু। আমার বালিশের নীচে পেলাম। কাল পেয়েছি। কি করবো বলতো?"

আলী ভ্যাকচ্যাকা খেয়ে যায়। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে নতুন। আবছায়াভাবে মাঝে মাঝে এই জাতীয় কথা কানে এসেছে কিন্তু বাস্তবে যে এসব আসলেই হয় তা কখনও ভাবে নি। মিঠুর মত চালূ ছেলে যদি বুদ্ধির জন্য তার কাছে ছুটে এসে থাকে তার অর্থ সমস্যা প্রগাঢ়।

"কি করে ওরা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে আলী। মিঠুর এতো ভয় পাবার কারণটা তার কাছে পরিষ্কার হয় না।

"তুই একেবারেই গাধা!" বিরক্ত হয় মিঠু। "ছেলে-মেয়েতে কি করে, তা তো জানিস? ছেলে-ছেলেতে করে পেছন দিয়ে। আমার খুব ভয় লাগছে।"

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। আলীর হাত কাঁপতে থাকে।

"স্যারদেরকে বলে দে। হাউস লীডারকে বল। সবাইকে চিঠিটা দেখা।"

"স্যাররা ক্লাশ টুয়েলভকে খুব সমজে চলে। বিশ্বাস করবে না। আর হাউস লীডারতো লাবলু ভাইয়ের ভালো বন্ধু। কিছুই করবে না। মাঝখান থেকে ঝামেলা করতে পারে।"

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে আলী। সে শুনেছে পছন্দ হয় না এমন ছেলেদের প্রেমপত্র মেয়েরা ফিরিয়ে দেয়। উত্তর তাতেই দেয়া হয়ে যায়। "চিঠি ফেরত দিয়ে দে। তাহলেই বুঝবে তুই ঐ ধরনের ছেলে না।"

"কিভাবে ফেরত দেব?" মিঠুকে অসহায় দেখায়।

"কোথায় থাকে জানিস? বিছানার উপর রেখে দিস।"

"যদি অন্য কেউ দেখে ফেলে?"

"দেখলে দেখবে। এই চিঠি তোকে ফেরত দিতেই হবে।"

মিঠু চিঠিটা আনমনে পকেটে ভরে রাখে। "শুধু আমি একা না। আরো কয়েকজনও পেয়েছে। লাবলুর বন্ধু শিবলীরও আলুর দোষ আছে।"

বিরতি শেষ। ক্লাশে ফিরে যেতে হবে। মিঠু বিড়বিড়িয়ে বললো, "বেশী ঝামেলা করলে বাড়ি দিয়ে মাথা দুই ভাগ করে পালাবো।"

"বোকার মত কিছু করিস না।"

"শালা আলুয়ালা!" দাঁত কিড়মিড় করতে করতে চলে যায় মিঠু। ক্লাশে ফিরে পড়ায় মন বসাতে পারে না আলী। তার সমস্ত শরীর শির শির করে। এসব কি হচ্ছে? কেউ যদি তাকেও এই ধরনের চিঠি দেয়? তার মনে পড়ে কয়েকদিন আগে ক্লাশ টুয়েলভের একটা ছেলে তাকে চোখ টিপ্পনি দিয়েছিলো। সে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে সিনিয়র ছেলেটি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার ব্যবহারের অর্থটা এখন পরিষ্কার হয়। তার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। পড়াশুনা কিছুই ঢোকে না। সেদিন রাতেও তার ভালো ঘুম হয় না। অস্থির বোধ করতে থাকে। এ কোথায় এসে পড়লো সে?

পরদিন দৈনন্দিন রুটিন মাফিক চলতে চলতে সর্বক্ষণ মিঠুর খোঁজ করতে থাকে আলী। সকালে মাঠে দেখেনি। ব্রেকফাস্টেও দেখলো না। ক্লাশে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো মিঠু স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার চোখ উঠেছে। এই অসুখ আলীরও খুলনাতে বেশ কয়েকবার হয়েছে। চোখ লাল হয়ে খচ্ খচ্ করতে থাকে। বেশী মারাত্বক হয়ে গেলে চোখ খোলাই সমস্যা হয়। মিঠু হঠাৎ করে কিভাবে আক্রান্ত হলো ভেবে পায় না। একাডেমী ব্লক থেকে কাছেই ডাক্তারের ছোট অফিস কাম হাসপাতাল। সারাদিন সুযোগের সন্ধানে থাকলেও শেষ পর্যন্ত মিঠুকে দেখতে যেতে পারলো না। তবে রাতে বিছানায় যাবার আগে সগীর জানালো সে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছে মিঠু ভালোই আছে। চোখে কিছুই হয়নি। হলেও তেমন বাড়াবাড়ি কিছু না। কয়েকটা দিন শুয়ে বসে কাটানোর জন্য কোনভাবে ডাক্তার সাহেবকে রাজী করিয়ে ফেলে। আলী জানে কারণটা কি। সগীরকে বলতে চেয়েছিলো কিন্তু পরে চেপে গেলো। এসব কথা বের হয়ে গেলে মিঠু খুবই বেইজ্জতি হবে।

অনেকক্ষণ ধরেই তলপেটে চাপ পড়ছে কিন্তু ইচ্ছে করেই থামে নি আলী। থামলেই সময় নষ্ট। তাছাড়া গ্রাম্য এলাকায় দোকান পাটের সংখ্যাও কম। অধিকাংশ দোকানেই পাবলিক ওয়াশরুম নেই। মাথা কুটে মরে গেলেও হয়তো ঢুকতে দেবে না। শেষতক একটা কফি শপ দেখে গাড়ী থামালো। দ্রুত কাজ সেরে এক কাপ কফি হাতে নিয়ে ফিরে এলো। মাত্র মাঝপথ এসেছে নিশিকে দেখার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এমন ছেলেমানুষী আনন্দ হচ্ছে। একা একাই লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে আলী। নিশির মেয়েটা যে পাকনী, কি ভাববে কে জানে।

ছোট মফস্বল শহরটাকে পেরিয়ে আবার খোলা রাস্তায় নামে আলী। আচমকা উজ্জ্বল রঙের ছোপ দু'চোখ ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ বিশাল ওক, এক ঝাঁক মেপল, ঘন হয়ে জন্মানো পাইনের ঝাড়। আবার স্মৃতির পাতায় হারিয়ে যায় আলী। আজ তার পুরানো দিনের কথা ভাবতে ভালো লাগছে। এতোদিন নিশ্চুপ হৃদয়ে যে ক্ষোভ জমা হয়ে ছিলো সেটা যেন হঠাৎ করেই ঝরে পড়তে শুরু করেছে।

মিঠু হাসপাতাল থেকে ফিরে এলো তিন-চার দিন পর। দেখা হতে বাঁকা হেসে বললো, "সব সামাল দিয়ে ফেলেছি।"

"কি করে?" আলী কৌতুহলে ফেটে পড়েছিলো।

"খুলনার অনেক ছেলে পেলে আছে এখানে। এক বড় ভাইকে গিয়ে বলতে সব ঠিক হয়ে গেলো। আর আমাকে জ্বালাচ্ছে না।"

আলী চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ে। মিঠু ডরানোর ছেলে নয়। তার নিজের এমন কোন সমস্যা হলে সে খুবই বিপদে পড়ে যাবে। এখন পর্যন্ত তাকে কেউ বিরক্ত করে নি।

ট্যালেন্ট শো-ও ভালোমতই হলো। দর্শকের সারিতে বসে প্রাণভরে হাততালি দিলো আলী। ভালো লাগলেও হাততালি, না লাগলেও হাততালি। হাজার হোক তারই তো বন্ধু। মিঠু জোক বলে খুব মাতিয়ে দিলো।

দুই লোকের মধ্যে সদ্য পরিচয় হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো: ভাই আপনার বাড়ী কোথায়?

দ্বিতীয় জন বললো: থানার সামনে।

প্রথম জন : থানা কোথায়?

দ্বিতীয় জন: বাড়ীর সামনে।

প্রথম জন: তা তো বুঝলাম। কিন্তু ও দু'টো কোথায়?

দ্বিতীয় জন: কেন, সামনা সামনি।

হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে যা বাকী। মিঠু এমন সহজভাবে জোক বলতে পারে ধারণাই ছিলো না আলীর। কার যে কোথা দিয়ে গুণ বেরিয়ে পড়ে। তার নিজের খুব ইচ্ছে ছিলো একটা কবিতা আবৃত্তি করে। নজরুলের 'বল বীর' সে বেশ খানিকটা মুখস্ত বলতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো কণ্ঠস্বর আবৃত্তির যোগ্য নয়। অন্তত তার নিজের কানেই ভালো শোনায় না। আরেকটা সমস্যা হলো তার লাজুক স্বভাব। এতোগুলো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলেই তো শরীরে জ্বর উঠে যাবে।

ছুটিতে বাড়ী ফিরে এসে আলীর মনে হলো সে যেন কোন এক কারাগার থেকে মুক্তি পেলো। বানু তার জন্য নানান কিছু রেঁধে রেখেছিলো। ক্যাডেট কলেজে অনেক ভালো ভালো খাবার দেয়, সে জানতো, কিন্তু সব কিছুতো আর দেয় না। বেগুন দিয়ে রুই মাছ খুব পছন্দ আলীর। সেটা কি ওরা দেবে? দু'দিন ধরে শুধু খাওয়ালো ছেলেকে। মাথায় কদম ছাট চুল দেখে দু'চোখে অশ্রু টলমল করে ওঠে। কাকের মতো কালো হয়ে গেছে রোদে মার্চ করে। কাঠির মতো পটকা হয়ে গেছে। আলীর কি সেখানে খুব কষ্ট হচ্ছে? বানুকে শান্ত করাই কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে।

ভেবেছিলো রুবীর সাথে দেখা করতে যাবে কিন্তু মাঝ পথ গিয়ে সাহস হারিয়ে ফেলে। দূর থেকে বাসাটার দিকে তাকিয়ে থেকে অন্য পথ ধরে ফিরে যায়। মিঠুও ডাকে নি। তার বাবা-মা তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। কয়েক দিনেই ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠে আলী। হয়তো পাগলা কিনু ঠিকই বলেছিলো। রুবী ওকে ভুলেই গেছে। দেখা করার কোন চেষ্টাই করলো না। তার অবুঝ মন বোঝে না। রুবীর পক্ষে তার সাথে দেখা করাটা কতখানি কঠিন হতে পারে। বাসায় আদরের আতিশয্য কমতে মিঠুর দেখা পাওয়া গেলো। জানা গেলো রুবীরা খুলনায় নেই। তাদেরও স্কুল ছুটি। নানা বাড়ী বেড়াতে গেছে। সাতক্ষীরায়। ফিরবে দু'সপ্তাহ পর। মন ভেঙে যায় আলীর। রুবী ফিরবার পরপরই আলীদের ফিরে যাবার সময় হয়ে যাবে। যাহ! সব কেমন হয়ে গেলো।

সেই ছুটিতে রুবীর সাথে দেখা হলো না। রুবীর ফিরতে দেরী হলো। কলেজ খুলে যাওয়ায় ফিরে গেলো আলী। বড়, ছোট অনেকেই বাসে চেপে দল বেঁধে গেলো। মিঠু গেলো বাবা-মায়ের সাথে এয়ার কন্ডিশনড গাড়ীতে। এবারও সে আলীকে সাথে নিতে চেয়েছিলো তার বাবা সরাসরি মানা করে দেন।

ক্যাডেট কলেজে ফিরবার ঠিক এক সপ্তাহ পর রুবীর চিঠি এলো। পুরো একটা পৃষ্ঠা। সুন্দর, গোটা গোটা লেখা। নাম ধরে সম্বোধন করে লিখেছিলো, দেখা না হওয়ায় আফসোস করেছিল। নানাবাড়ীতে কি করেছে লিখেছিলো। সেই চিঠি বার বার পড়েছিল আলী। বিশেষ করে শেষ লাইনটুকু যেখানে রুবী

নিখেছিলো, "তোমার বান্ধবী"। বেশ কিছুদিন মিঠুকেও সে চিঠিটার কথা কিছু বলেনি। তাকে অযথা ঈর্ষাপরায়ণ করতে চায়নি। আরো সপ্তাহ খানেক পর যখন মিঠুই তাকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে রুবীর চিঠি দেখালো তখন তার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়েছিলো। রুবী কি সবাইকেই সুন্দর ছবির মত করে চিঠি লেখে? সান্তনা এইটুকুই যে মিঠুকে সে "তোমার বান্ধবী রুবী" লেখেনি। লিখেছিলো "তোমার বোন রুবী।" মিঠু অবশ্য খুশীতে বাগ-বাগ ছিলো। এই সামান্য শব্দ চয়ন নিয়ে সে মোটেই উদ্বিগ্ন ছিলো না। আলী অবশ্য এটা নিয়ে ভেবে ভেবে কয়েক রাত ভালো ঘুমাতেই পারলো না। শেষতক রুবীকে একটা চিঠি লিখে পাঠানোর পর শান্তি। মিঠুকে কিছু বললো না। কিছু কিছু ব্যাপার গোপন থাকাই ভালো। কে জানতো সেই চিঠিই তার কাল হবে।

১০

ব্রেসব্রিজে অবস্থিত 'হাই ফলস' খুঁজে পেতে একটু সমস্যা হলো। জলপ্রপাতটাকে রাস্তা থেকে দেখা যায় না। হাইওয়ে থেকে সরাসরি বাঁয়ে ঘুরে 'হাই ফলস' রোডে নামতে হয়। কোন র‍্যাম্প নেই। একটু এগিয়ে গিয়ে ভুল বুঝতে পেরে ঘুরে আসতে হলো আলীকে। 'হাই ফলস' রোডে ওঠার পর রাস্তাটা ঝপাৎ করে অনেকখানি নীচে নেমে গেছে। একদিকে গর্জে গর্জে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটা জলপ্রপাত, অন্যদিকে গাছ-পালার সারির ফাঁকে ফাঁকে বসতবাড়ী উঁকি দিচ্ছে। বর্ণে, বৈচিত্রে আর সৌন্দর্যে মুহূর্তে মন কেড়ে নেবার মতো অভিজ্ঞতা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অবশ্য আবার ঘুরতে হলো। ফলস থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো। একটু খুঁজতে পার্কিং করার মতো খানিকটা খোলা জায়গা পাওয়া গেলো। ঘন জঙ্গলের ভেতরে কিছুটা এলাকা পরিষ্কার করে মানুষজনের যাবার পথ করা হয়েছে। আলী পৌঁছে দেখলো একমাত্র বশীর ভাইই পৌছেছে। তাকে দেখে এক গাল হাসলো বশীর। প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়াতে বের হলে তার আনন্দ যেন উপচে পড়ে। "কি সুন্দর জায়গা! দেখেছো?"

আলী মাথা দোলালো। বশীর মিথ্যে বলেনি। ক্ষীণধারার নদীটা ওদেরকে পেরিয়েই গ্রানাইটের পাথুরে দেয়াল বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। একটা ব্রিজ নদীর দু'পাশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। ছোটখাটো একটা বাঁধ দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পার্কিং থেকে জলপ্রপাতটা দেখা যায় না। কিন্তু পানি পড়ার গর্জন শোনা যায়। "বাকীরা কোথায়?" আলী জানতে চায়।

"আমার পেছনেই ছিলো। চলে আসবে।" বশীর সহজ কণ্ঠে বললো। "ভেবো না। তিনিও আসছেন।"

আলী লজ্জা পেয়ে যায়। লতা ভাবী মুখ টিপে হাসছে। এমনকি পরীও চোখ মুখ উজ্বল করে ফেলেছে। ভারী বিপদ তো! এই ছোট মেয়েটাও খবর পেয়ে গেছে। আলী বোকার মতো মাথা চুলকায়। নুর চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো, "কার কথা বলছো বাবা?"

বশীর হা হা করে হেসে উঠলো। "কেউ না। এমনি ঠাট্টা করছি।"

প্রায় তখনই পৌঁছালো আসলাম আর মইনুল। তারা নামতে নামতে আরিফ এবং ঝুনুরাও চলে এলো। সবাই হৈ চৈ করে রীতিমতো হাট বসিয়ে দিলো। বাচ্চারা সবচেয়ে উত্তেজিত। তারা কি করবে, কোথায় যাবে মনস্থির করতে পারছে না। তাদেরকে বনে-জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে বশীর ধমকাধমকি করে একখানে জমায়েত করলো সবাইকে। একমাত্র নিশিরাই এখনো আসেনি। রোমিং হবে জেনেও ফোন করলো বশীর। শওকতকে ফোনে পাওয়া গেলো। জানা গেলো পথে তাদেরকে একটু নামতে হয়েছিলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। বশীর সবাইকে নিয়ে সদর্পে ব্রিজের উপর পা রাখলো। শওকতরা পরে এসে তাদের সাথে যোগ দেবে।

ব্রিজের উপর থেকে যে দৃশ্য দেখা গেলো তাকে বর্ণনা করার মত শব্দ হাতড়াতে হয়। আলী মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য এই টিলা আর লেকের দেশ ওন্টারিওতেও সবখানে দেখা যায় না। জলপ্রপাতটা সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট নীচের প্রশস্ত সরোবরে। দু'পাশে পাইন আর পাতাঝরা গাছের বনানীকে সঙ্গী করে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে দিগন্তের দিকে। ঠিক সামনেই তীরে 'হাই ফলস ইন এন্ড রিসোর্ট'। বালিয়াড়িতে সারি বেঁধে দাড় বাওয়া নৌকা ফেলে রাখা। এমন ঝকমকে শান্ত পানিতে নৌকায় ঘুরতে অসম্ভব ভালো লাগবে, জানে আলী। আবহাওয়া যথেষ্ট ঠান্ডা বলে কেউ নৌকা নিয়ে বের হয়নি। ডিঙ্গী বা নৌকা যা হোক একটা হাতের কাছে পেলে আলী নির্ঘাৎ নেমে যেতো।

ব্রিজটা পার হতে নদীর অন্য তীরের যথেষ্ট ঘন পাইনের জঙ্গলে ঢুকলো ওরা। বিশাল বিশাল গাছ। ওয়েস্টার্ণ হোয়াইট পাইন। গ্রানাইটের কালচে পাথর আর পিছলে যাওয়া মাটির পথ ধরে সাবধানে নীচে নামে সবাই। প্রথম দৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলেও দেখা গেলো বাস্তবে ততখানি মন্দ নয়। বাচ্চারাই লাফ ঝাঁপ দিয়ে সবার আগে নীচে নেমে জলপ্রপাতটার কাছাকাছি গিয়ে ভীড় করলো। একদল চীনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছবি তুলছিলো। তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে আলীদের দলের পুরুষ, মহিলারাও পটাপট ছবি তুলতে লেগে গেলো। জলপ্রপাতটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আলী। আকারে ছোট হলেও তার হুংকার নিতান্ত কম না। তাদের পাশ কাটিয়ে আরো ফুট বিশেকের মত গড়িয়ে নামছে। হাল্কা ধোঁয়ার মতো জলীয় বাষ্প ঘিরে রেখেছে চারপাশ। ওরা যে পাথরের চত্বরটার উপর দাঁড়িয়ে সেটা বেশ চওড়া। বিশ ত্রিশজন সহজেই ধরে যাবে। কিন্তু কিনারে রেইল জাতীয় কিছু নেই। হঠাৎ পা পিছলে গেলে সরাসরি পানিতে।

আলীকে নিঃসঙ্গ ঘুরতে দেখে শিলা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রসালো উক্তি করেছে। প্রতিটাই তার পুরানো রোমান্সকে কেন্দ্র করে। মুখ লুকিয়ে হাসে আলী। আজ তার সব কিছুই ভালো লাগছে। শিলা মিথ্যে বলেনি। তার বাস্তবিকই তর সইছে না। মামাজি কি পথ হারিয়ে ফেললো? বশীর হৈ হৈ করে বাচ্চাদেরকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আরিফ এবং বেলী খুঁজে পেতে উদ্ভট সব পাথুরে খাঁজ বের করে ছবি তুলতে ব্যস্ত। অন্যরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে। একদল চীনা ঢাল বেয়ে উঠে গেলো। আরেকদল নেমে এলো। তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে লাগার মত। ঠিক তখনই ব্রিজের উপরে নড়াচড়া দেখে চোখ তুলে তাকালো আলী। শওকত মামা ও লায়লা মামী সবার আগে। পেছনে টিসা মায়ের শরীর ঘেঁষে। নীল সালোয়ার - কামিজ পরেছে নিশি, উলের সোয়েটার - সাদার উপরে হালকা গোলাপীর ছাপ, চুল বাঁধা সাদা রিবনে। আলীর বুকটা ধক করে ওঠে। মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে। এতো পরিচিত একজন মানুষকে দেখেও এমন আবেগের সঞ্চার হতে পারে ধারনা করা কষ্ট। টিসা ব্রিজের উপর থেকে হাত নাড়ছে। কাকে লক্ষ্য করে নাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রত্যুত্তরে সবাই হাসি মুখে হাত নাড়লো। এমনকি চীনাদের কেউ কেউও।

নুরী কানের পাশে এসে টিপ্পনি কাটলো, "এবার দু:খ ভুলে হাসুন। হৃদয়েশ্বরীতো এসে গেছে।"

মইনুল ছদ্ম রাগ দেখায়। "আর জ্বালিওনাতো আলী ভাইকে।" ভাবীরা জোট পাকিয়ে খিল খিলিয়ে ওঠে। আলী মনে মনে প্রমাদ গোনে। এই মহিলাদের জ্বালায় নিশির আশে পাশে যাওয়াইতো সমস্যা হয়ে যাবে।

মামা মামী অনেক আছড়ে-পিছড়ে ঢাল বেয়ে নেমে এলেন। দৃশ্য দেখে দু'জনাই মুগ্ধ। মেয়েকে নিয়ে নিশি তাদের পিছু পিছু নেমে এলো। ভাবীদের সবাইকেই সে চেনে। সম্বোধনের পালা শেষ হতে আলীর দিকে ফিরে গম্ভীরমুখে হাত নাড়লো। ভাবীদের দল খুক খুক শব্দে কাশাকাশি শুরু করায় তার শ্যামল মুখ রঙিন হয়ে উঠলো। আলীর নজর এড়ালো না। দু'জনে একাকী কিছুটা সময় পেলে ভালো হতো। কিন্তু সেটা হবে বলে মনে হচ্ছে না। টিসা সহজ কণ্ঠে বলনো, "কেমন আছো আংকেল?"

"ভালো। তুমি ভালো আছো?" আলী আপাতত তার মায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখারই সিদ্ধান্ত নেয়।

"খুব ভালো আছি। আমাদের দু'জনার একটা ছবি তুলে দেবে?" ক্যামেরা হাতে ধরিয়ে দিয়ে মাকে নিয়ে জলপ্রপাতকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে যায় টিসা। নিশি সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকায় না। গাম্ভীর্য অটুট রাখার চেষ্টা করে। বার কতক সাটার টিপলো আলী। ভাবীদের টিকা-টিপ্পনীর নতুন ঝড় বয়ে এলো। তবে মন্দের ভালো, ভাবীদের বোধোদয় হলো। তারা ওদেরকে একাকী হবার সুযোগ করে দিতে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। টিসাও বাচ্চাদের দলে ভীড়ে গেলো। উপরের রাস্তায় ছুটাছুটি করে খেলছে তারা। তাদের কলরবে এলাকার পাখীর দল অনেক আগেই পালিয়েছে।

মামা-মামী ফিরতি পথ ধরতেই গুটি গুটি পায়ে নিশির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আলী। নিশি আড়চোখে তাকিয়ে ওকে দেখে চারপাশে দ্রুত চোখ বোলায়। "ভালো যন্ত্রণা।" ফিসফিসেয়ে ওঠে সে। ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি।

আলী ফিক্ করে হেসে ফেলে। কিছু বলে না।

নিশি ভ্রুকুটি করে। "শুধু হাসলে হবে? কিছু বলতে হবে না?"

"খুব ভালো লাগছে।"

"কি ভালো লাগছে? জলপ্রপাত? নদী? আকাশ?" ঝাপটা দেয় নিশি।

"মুখ ফুটে বলতে হবে?"বুকের ঢিবঢিবানী থামে না আলীর। মনে হয় যেন তার সামনে নতুন এক জগৎ তার রহস্যের দ্বার খুলে দিচ্ছে। পুরানো দিনের সেই গানের চরণটা মনে পড়ে - চেনা চেনা লাগে , তবু অচেনা.....

"না আসলেই ভালো হতো।" নিশি নীচু কণ্ঠে বলে।

"কেন?"

"নিজেকে সার্কাসের ক্লাউন মনে হচ্ছে।"

"বেশ! এতক্ষণ আমি অযথা নিজেকে ক্লাউন ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম।"

"ঠাট্টা করছি না। এই বয়সে এসব সাজে?"

"মনের তো বয়েস নেই। চল্লিশ হয়েছে মনেই হয় না।"

"ছেলেরা হচ্ছে বদমাশ। চল্লিশ আর পঞ্চাশ কি! মেয়েরা অতো আদিখ্যেতা করতে পারে না।"

হেসে ফেলে আলী। "কত কাল পর আবার তোমার বাঁকা বাঁকা কথা শুনছি।"

ঠোঁট বাঁকায় নিশি। হাসলো না ব্যঙ্গ করলো বোঝা যায় না। বিড়বিড়িয়ে বললো, "কত দিন গেছে মনে হয়েছে আরেকবার দেখা হলে ভালো হতো। একটা বার। এখন মনে হচ্ছে দেখা না হলেই ভালো হতো।"

"একটুও বদলাওনি।" আলী ঠোঁট টিপে হাসে। "মনে এক মুখে আরেক।"

কুটিল দৃষ্টি হানে নিশি। "থাক, মনের কথা আর বুঝতে হবে না। সেই সুযোগ অনেক আগেই গেছে। চলো ফিরি। ওরা নিশ্চয় অপেক্ষা করছে।"

নিশিকে ফিরতি পথ ধরতে দেখে সঙ্গ নেয় আলী। "যদি ক্ষমা চাই, খুব অন্যায় হবে?"

থমকে দাড়ায় নিশি। "কিসের জন্য ক্ষমা চাইবে?"

“পালিয়ে যাবার জন্য ।”

“মন চেয়েছিলো পালিয়ে ছিলে । দোষ তোমার একার ছিলো না । যাক, ওসব কথা তোলার দরকার নেই ।”

নিঃশব্দে উৎরাই বেয়ে ওঠে দু’জন, পা পিছলে পড়ার উপক্রম হচ্ছিলো নিশি, আলী হাত ধরে ফেলে । উষ্ণ, কোমল হাত । পরিচিত স্পর্শ । এতো বছর পরেও ঝংকার তোলে । নিশি হাত ছাড়িয়ে নেয় না । মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ পায় আলী । ফুরফুরে গন্ধ । মনকে আচ্ছন্ন করে না, বরং জুড়িয়ে দেয় । উপরে রাস্তায় পা রাখার আগে হাত ছাড়িয়ে নেয় নিশি । ভাবীদের মধ্যে নিশ্চয় কোন গোপন অধিবেশন বসে থাকবে । কারণ তারা গভীর মনোযোগে গাছপালার ছবি তুলতে শুরু করলো । আলী এবং নিশিকে দেখেও না দেখার ভান করতে লাগছে । হাসি সম্বরণ করতে অনেক বেগ পেতে হলো আলীকে ।

বশীর হুঙ্কার ছাড়লো, “নেক্সট - হান্টসভিল । মোটেল । লাঞ্চের পর লুক্আউট পয়েন্ট ।”

বাচ্চারা হৈ চৈ করে তাদের সম্মতি জানিয়ে দিলো । ভাবীদের ভাবসাব দেখে বোঝা গেলো লাঞ্চের পর ঝট করে তাদেরকে বের করা যাবে না । নিশি ভাবীদের দলে গিয়ে ভিড়েছে । তাকে কিছু চটুল উক্তি শুনতে হয়েছে । খারাপ লাগেনি । হাত ধরার ব্যাপারটাও তার খুব একটা খারাপ লাগেনি । তার একটু ভয় ভয়ই করছে । কি হবে কে জানে? বার বার স্বপ্ন ভেঙেছে । এই লোকটাকে নিয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে তার এখন আতংকই হচ্ছে ।

খুব তোড়জোড় করে নভিসেস প্যারেড হয়ে গেলো । খটাখট হিল মেরে জান প্রাণ দিয়ে মার্চ করলো আলী । আর্মিতে যাবার তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই । সে লেখক হতে চায় । এই নিয়ম কানুনের বেড়ী আর সামরিক কায়দার জীবন মানিয়ে নিতে তার ক্রমাগত সমস্যা হয় । কিন্তু একই সাথে হার মানতেও সে চায় না । অনীহা নিয়ে হলেও সবকিছু সমান আগ্রহ নিয়ে করার চেষ্টা করে সে । তবে তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ভালো ফলাফল করা । বানু তার প্রতি পত্রেই সেই কথা ওকে বার বার মনে করিয়ে দেয় ।

মিঠুর নতুন করে কোন সম্যসা হয় নি । হলেও সে আলীকে কিছু জানায়নি । সে সপ্রতিভ । সমস্যা কিছু হলেও সমাধান একটা বের করে ফেলে । তার পরিচিতি ইতিমধ্যেই বেশ ব্যাপক হয়ে উঠেছে । ইনটেকের সবাই ওকে বেশ গুরুত্ব দেয়, পছন্দও করে । ট্যালেন্ট শোর পর শিক্ষক এবং সিনিয়রদের মধ্যেও তার পরিচিতি ব্যাপক হয়ে উঠেছে । সে যে একদিন কলেজের বড় সড় একজন নেতা হবে তাতে কারোরই কোন সন্দেহ নেই । বন্ধুর এই খ্যাতি আলীর ভালোই লাগে । মিঠু যে তার ঘনিষ্ট বন্ধু এটা ক্লাশের সবাই জানে । সেই সুত্রে অল্প কিছুটা হলেও তাকে সমঝে চলে । মিঠু আকার আকৃতিতেও একটু বড় । তার বন্ধুকে উত্যক্ত করে বিপদে পড়তে কে চাইবে? ভালো ছাত্র হিসাবে আলীর কিছু পরিচিতি হলেও তার

চুপচাপ স্বভাবের জন্য সে খানিকটা হলেও অবহেলিত। সেসব নিয়ে আলী উদ্বিগ্ন নয়। কারো দৃষ্টি এড়িয়ে চুপচাপ ছয়টা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই সে খুশী। তার অবশ্য কয়েকজন ভালো বন্ধু জুটেছে। সারাদিনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও সুযোগ পেলেই একসাথে জড় হয়ে গল্প গুজবে মেতে ওঠে। সগীর এবং বাকেরের সাথেই ঘনিষ্ঠতা বেশী। জিকু, ইমন ও নকিবকেও ভালো লাগে। খুব কাছাকাছি দিনের পর দিন বাস করায় যে ভ্রাতৃপ্রতিম একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার তুলনা নেই। এটা সেটা অনেক কিছুই অপছন্দীয় হলেও বন্ধুত্বের এই অভূতপূর্ব অনুভূতি আলীর খুব ভালো লাগে।

খেলাধুলাতেও খুব একটা ভালো করতে পারলো না আলী। ফুটবল ছাড়া কিছুই খেলেনি কখনও। বাস্কেটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলায় বুতপত্তি দেখিয়ে অনেকেই যখন সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সে তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। সগীর লং রানে ভালো। সে বাৎসরিক এথলেটিক্স কম্পিটিশনের জন্য উঠে পড়ে অনুশীলন করতে শুরু করলো। বাকেরও ট্র্যাক এবং ফিল্ডের নানান খেলায় ভালো। তারা আলীকে সুযোগ পেলেই এক রকম জোর করে ট্র্যাকে নিয়ে যায়। দু'মিনিট দৌড়েই থেমে যায় আলী। বল নিয়ে ছুটাছুটি করা এক কথা আর একঘেয়ে গতিতে দৌড়ানো আরেক কথা।

রুবীর প্রসঙ্গ খানিকটা চাঁপা পড়ে গিয়েছিলো। সগীর এবং বাকেরকে সে চুপি চুপি রুবীর কথা বলেছে, চিঠিটাও দেখিয়েছে । এমন একটা ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখা তার মত মুখচোরার জন্যও কঠিন। মিঠুর আগ্রহের কথা অবশ্য সে গোপন করে গেছে। প্রতিদ্বন্দিতার গন্ধ পেলেই সাধারণ ঘটনাও মুখরোচক আলাপে পরিণত হয়। সগীর এবং বাকের অবশ্য তাদের জানের কসম কেটেছে গোপনীয়তা বজায় রাখার। সারা সেমিস্টারেও যখন রুবীর আর কোন চিঠি এলো না তখন অবশ্য আলী একটু বেকায়দায় পড়ে গেলো। তার কাব্যময় চিঠির কোন উত্তর রুবী দেয়নি। অথচ কয়েক মাস পেরিয়ে গেছে। মিঠুর সাথে যোগাযোগ নিশ্চয় আছে। সাহস করে এই প্রসঙ্গ তোলে নি।

ডিসেম্বরের শেষে কলেজ ব্যাপি খেলাধুলা এবং এথলেটিকস কম্পিটিশন হলো। আলী দর্শকের ভূমিকাতেই আটকে গেলো। তবে মিঠু ট্র্যাকে বুৎপত্তির পরিচয় দিয়ে ১০০মিটার এবং ২০০মিটার রানে ফাইনালে চলে গেলো, ক্লাশ সেভেন এবং এইটের গ্রুপে। সে ভিন্ন হাউসের প্রতিদ্বন্দি, প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে না পারলেও দেখা হতে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আলী। মিঠু পরিবর্তে তাকে এমন একটি খবর দিয়েছে যা শোনার পর থেকে তার বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেছে, ঘুম কমে গেছে। এথলেটিক্সের ফাইনাল দিনে রীতি মোতাবেক ছাত্রদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সব ইভেন্ট শেষ হবার পর পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সারা বছর ধরে তিন হাউসের ভেতরে যত প্রতিদ্বন্দিতামূলক ইভেন্ট হয় তার সমষ্টিগত ফলাফলও সেই দিন ঘোষণা করা হয়। সব মিলিয়ে খুবই বড়সড় ব্যাপার। মিঠু অল্প কথায় আঁচ দিয়েছে তার বাবা-মায়ের সাথে রুবীরা দু'বোনও আসতে পারে। রুবীই নাকি বায়না ধরেছে। ক্যাডেট কলেজে ঢুকবার পর এটাই রুবীর সাথে প্রথম দেখা হবে। প্রায় ছয় মাস পর। ওর সুন্দর মুখখানা মানসচক্ষে বার বার ভেসে ওঠে। কি পরবে? লালে ওকে আগুনের মতো

লাগে। পিঠময় পরিপাটি চুল ছড়িয়ে দিলে চেহারায় গভীরতা আসে, যদিও বিনুনী করলে একটা ছেলেমানুষী সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আলীর দিনগুলো যেন কাটতে চায় না।

ফাইনাল ডে-তে সমস্ত কলেজ যেন নানান রঙে ঝকমকিয়ে উঠলো। ক্যাডেটদের পিতা-মাতা, পরিজনদের কোলাহলে মুখরিত হলো পরিবেশ। বিশাল সামিয়ানা টানিয়ে সারি সারি চেয়ার সাজিয়ে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হলো। অতিথিরা গ্যালারির এক পাশে, ক্যাডেটরা অন্য পাশে। অনুষ্ঠান শেষ হলে মিলিত হওয়ার সুযোগ হবে।

রুবীকে খুঁজতে বেগ পেতে হলো না। মাত্র কয়েক মাসেই সে যেন আরেকটু বড় হয়েছে, হাঁটু সমান নীল লম্বা কামিজ আর টাইট সালোয়ারে হঠাৎ করেই বালিকা থেকে কিশোরীতে পরিনত হয়েছে। কোমর সমান চুল পিঠময় ছড়ানো, প্রতিটি নড়াচড়ার সাথে ছন্দ মিলিয়ে দুলছে। দূর থেকে দেখেই তৃপ্ত হতে হলো আলীকে। মিঠু এক সুযোগে গেলো বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে। খুলনা থেকে অনেকেই এসেছে। পরিচিত কিছু ছেলে মেয়েও আছে। সেই দলে পাগলা কিনুকেও দেখা গেলো। মিঠু অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোধহয় আলীকে দেখালো, রুবী অতখানি দূরত্ব থেকে দেখতে পেলো কিনা বোঝা গেলো না। কিন্তু সে হাত নাড়লো। আলী পাল্টা হাত নাড়তেই বেশ কয়েক জোড়া চোখ বিস্ফোরিত হয়ে ওর উপরে স্থির হলো। "ঐ মেয়েটাকে তুই চিনিস? গুল্লী!" জনৈক বন্ধুর মন্তব্য।

আলী সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তার ভয় হয় চেনার গন্ডীতেই না সবটুকু শেষ হয়ে যায়।

এথলেটিক্সের অবশিষ্ট ইভেন্টগুলো যথা সময়ে শেষ হয়ে গেলো। মিঠু ২০০ মিটার রানে একটি ব্রঞ্জ পদক পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো। পুরষ্কার পর্ব চললো বেশ কিছুক্ষণ। সব শেষ হতে অতিথিদেরকে নিমন্ত্রণ জানানো হলো চা-নাস্তার।

এই পর্বে এসে মিঠু নিজেই এগিয়ে এলো। "চল।"

আলী ভনিতা করে বললো, "কোথায়?"

"ফাজলামি করছিস? রুবী ডাকছে। আয়।"

"তোর বাবা-মা তো আবার আমাকে দেখতে পারেন না"।

"বাজে কথা বলিস না। আয়।"

মিঠু এক রকম টেনেই নিয়ে যায় ওকে। মিঠুকে বোঝা কষ্ট। জানে রুবীর প্রতি আলীর ভয়ানক দূর্বলতা আছে। ইচ্ছে করলে এটা সেটা বলে এড়িয়ে যেতে পারতো। ওর মনের মধ্যে কোথাও একটা অসম্ভব ভালো মানুষ বাস করে। তাকে সব সময় ছোঁয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। বন্ধুত্বের এই অপূর্ব

নিদর্শনে আলীর চোখের কোণ ভিজে ওঠে। মনে মনে লজ্জাই পায়। এমন আবেগপ্রবণ হলে চলে? রুবী দেখলে কি ভাববে।

রুবী ওদেরকে দেখে এগিয়ে এলো। তার সমস্ত শরীরে যেন তরঙ্গের খেলা চলে। হাঁটার আদুরে ভঙ্গি থেকে শুরু করে ঠোঁট একটু বাঁকিয়ে ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখিয়ে মুখ উজ্জল করা হাসি, কোথাও কোন খুঁত নেই। মলিনতা নেই। সে যেখানে তাকায় সেদিকেই যেন সুর্যের আলো ঝকমকিয়ে ওঠে।

"কতদিন পর দেখা হলো?" হেসে বললো "ভালো ছিলে?"

হাসতে চায়নি আলী, একেবারে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে তো নয়ই, কিন্তু কিছুতেই আটকানো গেলো না। " চলে যাচ্ছে। খুব বাধা নিষেধ এখানে।"

"কবি মানুষের কি এসব বন্ধন ভালো লাগে।" খিলখিলিয়ে হেসে উঠে রুবী।

সেই হাসিতে কিছু একটা ছিলো, আলী একটু থতমত খেয়ে যায়। রুবী নিশ্চয় তার লেখা চিঠিটার প্রসঙ্গ টেনে কথাটা বলেছে। সেই চিঠিতে আলী রুবীকে নিয়ে লেখা তার প্রথম কবিতাটাই পাঠিয়ে দিয়েছিলো। 'আগুন ঝরা জোৎস্না রাতে। তোমায় দেখে পাগল লাগে..... ।'

"ঘাবড়ে গেলে কেন?" রুবী আবার কলকলিয়ে হেসে ওঠে। আলী কি বলবে বোঝে না। মিঠু ঠোঁট টিপে হাসে। "থাক ওকে আর জ্বালিও না। এমনিতেই বেচারীর এখানে খুব একটা ভালো সময় কাটছে না।"

"তোমার তো শুনলাম খুব ভালো কাটছে।" রুবী টিপ্পনি কাটলো। "খুব নাকি প্রেমপত্র পাচ্ছো।" দমকে দমকে হাসে রুবী। কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নিশি খেয়াল করে নি আলী। সেও মুখে হাত দিয়ে সেই হাসিতে যোগ দেয়। একটু লম্বা হয়েছে। দুটো বেনীতে ঘন চুল লকলকিয়ে ঝুলছে। সাদার মধ্যে কালো ডোরা কাটা সালোয়ার কামিজ পরেছে, বড়দের মতো করে ওড়না জড়ানো বুকে। মাত্র ক'দিন আগে দেখে আসা ছেলেমানুষ আর মনে হচ্ছে না। কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে ছিলো আলী, চোখাচোখি হয়ে যায়। এই প্রথম খেয়াল করে আলী মেয়েটার গম্ভীর দর্শন লম্বাটে মুখে কোমল, গভীর চোখ জোড়া যেন শান্ত সরোবরের মতো টলমল করছে। নিশি চোখ সরিয়ে নেয়। হাসিই পায় আলীর। মনে হয় যেন লজ্জা পাচ্ছে মেয়েটা। মাত্র তো আট বছর। এখনই হয়তো অনেক কিছু বোঝে।

মিঠু ছদ্ম রাগ দেখিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কোথা থেকে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এলো কিনু, সাথে দুই সাঙ্গ। আলীর পিঠে সপাটে একটা থাপপড় বসিয়ে দিলো। "কি রে পাগলা, খুব পাগলা পাগলা লাগে, হ্যাঁ? মদ না খেয়েই মাতাল হয়ে যাস? খাসা লিখেছিস। পাগল পাগল লাগে রে, মাতাল মাতাল লাগে। হা: হা: হা:" কিনু অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে, যোগ দেয় তাতে সাঙ্গরাও।

রৌদ্রোজ্জ্বল একটা অপূর্ব সুন্দর দিন হঠাৎ করেই যেন মেঘে ঢেকে যায়। আলী বাইরে সহজ ভাব বজায় রাখলেও তার মনের মধ্যে ঝড় উঠতে থাকে। কবিতাটা রুবীকে নিয়েই লেখা, সে চেয়েছিলো রুবী সেটা পড়ুক। সাজিয়ে গুছিয়ে চিঠি লেখা আলীকে দিয়ে হয় না। কাব্যি করে না লিখলে মনের কথা লেখা হয়

না। সে কল্পনাতেও ভাবে নি রুবী সেই কবিতা হেলা ভরে সবাইকে দেখাবে। কিনু পাগলাও যখন জানে তার অর্থ খুলনা শহরে আর কারো জানতে বাকী নেই। রুবী সম্ভবত তার মুখে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে থাকবে। সে গাম্ভীর্য নিয়ে বললো, "তোমার লেখাটা আমার এতো ভালো লেগেছিলো যে বান্ধবীদেরকে না দেখিয়ে পারি নি। সবাই যা ভালো বলেছে।"

মিঠু পেটে খোঁচা দেয়। "লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমের কবিতা পাঠাস! আমাকে দেখি কিছু বলিস নি।"

কিনু ঠাস করে বললো, "কেন বলবে? তুইতো ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তো আগেই আউট। এখন বুক চাপড়াই আর গান গাই. পাগল পাগল লাগে রে আমার, মাতাল মাতাল লাগে হাঃ হাঃ হাঃ....."

রুবী চোখ পাকালো "কিনু ভাই , তুমি থামবে! তোমার বোনকে কিন্তু বলে দেবো।"

কিনু একটু দমে যায়। "ওকে এর মধ্যে টানছো কেন? যা মুখ! খিস্তি শুরু করলে থামতে চায় না।"

এই কথায় নিশি মুখ চেপে ধরে খুক খুক করে হাসতে থাকে। কিনু তার বেনী ধরে টান দিলো। "তুই হাসছিস কেন, পাগলী?"

"পাগলী বলবে না।" নিশি চোখ পাকায়।

"না, মহারানী বলবো। সেদিনকার খুকী, খুব বড় হয়ে গেছিস এখন।"

"যাও তুমি, কিনু ভাই। বেশী ঝামেলা কর"।

"ঝামেলা আমি করি না। ঐ ছোকরাকে বল তোর সুন্দরী বোন গত মাসে কতগুলো প্রেমপত্র পেয়েছে। বেশী স্বপ্ন-টপ্ন না দেখাই ভালো।"

রুবী কিনুর কথায় বিশেষ আমল দেয় না। "পাগলের তো আর অভাব নেই। ওসব কিছু না। আলী ভাই, আর কিছু লিখেছো?"

আলী উত্তর দেবার সুযোগ পায় না। খুলনার আরোও কয়েকটি ছেলে কিনুর সাথে যোগ দেয়। তারা উঁচু গলায় টিটকারি মারে, "কি রে পাগল, খবর কি? " সমস্বরে হাসিতে ফেটে পড়ে তারা।

আলীর কান গরম হয়ে ওঠে। মিঠু অথবা রুবীকে দেখে মনে হয় না তারা এসব গায়ে মাখছে, কিন্তু সে সহজভাবে নিতে পারে না। তার বার বার মনে হয় রুবীর উচিত হয়নি চিঠিখানা কাউকে দেখানো। রুবী তার প্রেমে হাবুডুবু খাবে সেটা সে কখনই আশা করেনি। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গ ভাবে লেখা কোন কিছু সবাইকে দেখানোর অর্থ তো একটাই হয়, সে আলীকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। আলীর মান-সম্মান নিয়ে তার তেমন কোন উদ্বিগ্নতা নেই।

মিঠুর বাবা-মা হাত নাড়িয়ে ওদেরকে ডাকছে। তারা একটু এগিয়ে গিয়ে চা-নাস্তায় যোগ দিয়েছেন। মিঠু ও রুবী ওকে আসার জন্য জোরাজুরি করলো, কিন্তু আলীর যেতে ইচ্ছে হলো না। তার মনের মধ্যে

আঁধার নেমে এসেছে। খুব ভালো লাগার অনুভূতির মধ্যে কে যেন খুব তেতো এক ফোঁটা কুইনিন ঢেলে দিয়েছে। তার এখন কিছুক্ষণ একাকী থাকতে হবে। মিঠু রুবীকে নিয়ে এগিয়ে গেলো। হেসে হাত নাড়লো রুবী। "খুলনায় ফিরলে দেখা হবে।"

আলী ম্লান হেসে হাত নাড়ে। কিনুরা এখনও হাসাহাসি করছে। সে তাকায় না। কিনু কি বললো তা নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। রুবীর প্রতিটি পদক্ষেপ তার কাছে অর্থবহ। এই কাজ সে না করলেও পারতো।

সেই রাতে আলো বন্ধ হয়ে যাবার পরও দীর্ঘক্ষণ জেগে কাটায় আলী। তার মাথার মধ্যে একটা চাপা ব্যথা কুরে কুরে ওঠে, দু'চোখের পাতা এক করা যায় না। খুলনার রাস্তায় রাস্তায় কিশোর-কিশোরীরা তাকে দেখে চীৎকার করে উঠছে তার কবিতার চরণ ধরে, এই দৃশ্য মনে হতেই চোখে পানি এসে যাচ্ছে। অধিকাংশই তাকে ছোট করার জন্যেই বলবে। হাসির পাত্র করতে চাইবে। রুবী চালাক মেয়ে। সে নিশ্চয় জানতো এমনটা হবে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আলী, সে আর কখনও রুবীকে কোন চিঠি লিখবে না। বস্তুত সে আর কোন মেয়েকেই কখনও হৃদয়ের কথা লিখবে না। বানুকে ছাড়া। তার মায়ের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। ভোরের দিকে চোখের পাতা লেগে আসে। কিন্তু বেশীক্ষণ ঘুমাতে পারে না। সকালের ঘুম ভাঙার ঘন্টি বেজে ওঠে।

১১

ছুটিতে খুলনায় ফিরে প্রথম কয়েকটা দিন বাসার বাইরে পা রাখলো না আলী। পরিস্থিতি কতখানি খারাপ সে বুঝতে চায়। তৃতীয় দিনে বানু কাগজপত্র ঘেটে একটা খাম ওর বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। খামটা চিনতে অসুবিধা হয় না আলীর। তার নিজের হাতে লেখা রুবীদের বাসার ঠিকানা। ভেতরে সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা কবিতাটা সুন্দর করে ভাঁজ করে বসানো। কৌতুহলী হয়ে চিঠিখানা বের করে আলী। দেখেই বোঝা যায় প্রচুর হাতাহাতি হয়েছে, ভাঁজগুলো প্রায় ছিঁড়ে এসেছে। এদিকে সেদিকে কিছু চটুল মন্তব্য লেখা নানান জনের হস্তাক্ষরে। "রোমিও" শব্দটাই সবার আগে চোখে পড়লো। বানু নিশ্চয় আন্দাজ করেছে ঘটনা। তার থমথমে মুখ দেখেই বোঝা গেলো। ক্যাডেট কলেজে গিয়ে ছেলের এই সব কান্ড তার আদৌ ভালো লাগছে না। আলী রান্নাঘরে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, রুবী চিঠিখানা ফেরত দিয়ে যাবে এটা সে আশা করেনি।

"কে দিয়ে গেলো?"

"ছোট একটা মেয়ে ।" বানু গম্ভীর মুখে বলে! "আট-নয় বছর হবে । বললো তুই নাকি চিনিস ।"

"নিশি!"

"নাম বলে নি । ক্যাডেট কলেজে পড়তে পাঠিয়েছি, রং ঢং করতে না ।"

"আর কখন করবো না ।" মায়ের মন ভালো করার ব্যর্থ চেষ্টা করে আলী । "নিশি কি একাই এসেছিলো?"

"তাই তো মনে হলো । রিক্সা দাঁড়িয়েছিলো । আর কাউকে দেখিনি । কে মেয়েটা? রুবীর বোন নাকি?"

"হ্যাঁ ।"

"খুব লক্ষী, ছোট হলে কি হবে । আমার সেলাই দেখলো খুটিয়ে খুটিয়ে । ওর নাকি খুব সখ । শিখবে বলেছে ।"

"হ্যাঁ, ও রুবীর মতো না । চুপচাপ ।"

"এই সব ঝামেলার মধ্যে জড়াস না । তোর এখন এসবের বয়স হয় নি ।"

আলী নিঃশব্দে কেটে পড়ে । মা ভুল বলেনি ।

কয়েকদিন বাসা থেকে বের হয় না আলী । একটা ভয়ানক ভীতিবোধ কাজ করে । মনে হয় সমস্ত শহর জেনে গেছে ওর ভালো লাগার কথা । সবার কাছে ঠাট্টার পাত্র হয়ে গেছে সে । রাস্তার টোকাইগুলোও হয়তো ওকে দেখে দাঁত বের করে হাসবে । সবচেয়ে বেশী ভয় কিনুকে । আধ পাগলা, কখন কি করবে অথবা বলবে বোঝার কোন উপায় নেই । বানু লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কিছু বলে নি । তার হয়তো ভালোই লেগেছে । ক্যাডেট কলেজে চলে গেলে তো আবার কটা মাস দেখা হবে না । যতক্ষণ বাসায় থাকে মায়ের চোখের সামনেই থাকুক । সে ভালো মন্দ রান্না করে । কিন্তু আলীর যাওয়ায় তেমন আগ্রহ নেই । সারাক্ষণ আনমনা । কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না । কিন্তু সেই প্রসঙ্গ টেনে তোলে না বানু । এই বয়সে সবার মনই একটু চঞ্চল হয়ে থাকে । বেশী গুরুত্ব দিলেই খারাপ ।

চিঠিখানা নিয়ে কি করবে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয় আলীর । কখন মনে হয় ছিঁড়ে ফেলে দেয় কিন্তু পারে না । রুবির হাতের ছোঁয়া আছে তাতে । হাসি-ঠাট্টা যাই করুক তবুওতো বন্ধু । বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখে । মায়ের চোখে না পড়লেই ভালো । অযথা তার মনে কষ্ট দিতে চায় না সে ।

শেষ পর্যন্ত মিঠুই বাসায় এলো দেখা করতে । আলী জানতো মিঠু আসবে । ছুটিতে আসা অবধি কোন যোগাযোগ হয় নি । ঝগড়া-ঝাটি, মনোমালিন্য যাই হোক, বন্ধুত্বের টান মলিন হয় না । মিঠু ঠোঁট টিপে হাসে । "তুই আর বদলাবি না ।"

"বাসায় আসা অবধি শরীরটা ভালো লাগছে না ।" আলী বিড়বিড় করে একটা অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে ।

"ভাবিস না। কেউ তোকে নিয়ে হাসবে না। কিনু পাগলার কথাবার্তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।"

আলী কিছু বলে না। এই সামান্য ব্যাপারটা না বোঝার মতো বোকা মিঠু নয়। বানু এক বাটি মুড়ি মাখিয়ে দিয়ে গেলো। "না খেয়ে যাবে না কিন্তু। আমি রাঁধছি। তোমরা দু'জনাইতো ইলিশ ভাজা পছন্দ কর।"

মিঠু আপত্তি করে না। বানু তাকে সন্তানের চেয়ে কম দেখে না। তার রান্নাও অসম্ভব ভালো। খেলে মুখে লেগে থাকে। বাসায় বাবুর্চির রান্না খেতে খেতে অশ্রদ্ধা ধরে গেছে। মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললো, "চিঠি তো ফেরত পেয়েছিস শুনলাম।"

"তোকে কে বললো?"

"এটা নিয়ে অনেক তুলকালাম হয়েছে। দু'দিন আগে মামী ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। রুবী চিঠিটা আলমারীতে লুকিয়ে রেখেছিলো। না পেয়ে নিশিকে সন্দেহ করে। দুই বোনে ঝগড়া-ঝাটি করে। নিশিকে রাগের মাথায় চড় থাপ্পড় মারে রুবি। মামা-মামীও সব জানার পর খুব রেগে গেছেন। বিশেষ করে নিশি চিঠি ফেরত দিতে একা একা এসেছিলো এটা তারা পছন্দ করেন নি। আমি গিয়ে দেখি কেঁদে কেটে মুখ ঢোল করে ফেলেছে নিশি।"

মনটা খারাপ হয়ে যায় আলীর। রুবীর উপর রাগ হয়। সমস্যাটাতো সেই করেছে। সবাইকে এতো দেখিয়ে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন তো ছিলো না। নিশির গায়ে হাত দেবারও কোন কারণ ছিলো না। সে থমথমে মুখে বসে থাকে।

"বাদ দে।" মিঠু প্রসঙ্গ পাল্টায়। "কলেজে কেমন লাগছে তোর? যে ভালো রেজাল্ট করছিস, সব টিচারদের মুখেই তোর কথা।"

"আমার তো আর কোন গুন নেই। বসে বসে শুধু পড়ি। তুই তো হিরো। একদিন নির্ঘাত কলেজ প্রিফেক্ট হবি।"

মিঠু হাসে। "কে হতে চায় ওসব! আমি খেলাধুলায় ভালো করতে চাই। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট সবগুলোতে কলেজ টিমে চান্স পেতে চাই।"

"পেয়ে যাবি। বছর দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে, এই আরকি। ফালতু চিঠিপত্র পাস নাকি আর?"

মিঠু হা-হা করে হাসে। "আরে না। আমাকে দেখলে ব্যাটা এখন সালাম দিতে বাকী রাখে। কিনু হারামীটা সবাইকে বলেছে। তুই লজ্জায় বাসায় বসে আছিস! আমার তো চাঁদে চলে যাওয়া উচিৎ।"

"তুইতো আর কিছু করিস নি। আমি তো এক প্রেমের কাব্য লিখে সর্বনাশ করেছি। কে জানতো রুবী সবাইকে দেখিয়ে বেড়াবে।"

"দেখিয়েছে কৃতিত্ব নেবার জন্য। তোকে ছোট করবার জন্য না। প্রেমপত্র তো রাজ্যের মেয়েরা পায়। অমন কাব্যি করে ক'জন লিখতে জানে? তুই খামোখা মন খারাপ করেছিস।"

শ্রাগ করে আলী। "রুবীকে আমি বুঝি না। নিশির গায়ে হাত দিয়েছে, শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।"

"সে জন্য মামা-মামীর কাছে ওকেও অনেক বকা খেতে হয়েছে। ওদের দুই বোনে সব সময়েই রেশারেশি চলছে। দেখা করতে যাবি?"

"নাহ। তোর মামা-মামী খুব ঝাড়বে নিশ্চয়।"

"লুকিয়ে যাবো। তারা দেখবে কেন?"

"না, থাক। আর ঝামেলা বাড়াতে চাই না।"

বানু খেতে ডাকছে। ওরা হাত ধুয়ে রান্নাঘরে চলে গেলো। মেঝেতে পাটি বিছিয়ে দিয়েছে বানু। পাশাপাশি বসে। বানু নিজ হাতে ওদেরকে বেড়ে দেয়। কথা কমই হয়। বানু টুকটাক ক্যাডেট কলেজ নিয়ে কথা চালায়, প্রশ্নই করে বেশী। ছেলের পড়াশুনা নিয়েই তার চিন্তা বেশী। মিঠু তাকে আশ্বস্ত করে।

আলী নির্ঘাত বোর্ডে স্ট্যান্ড করবে। বানুর মুখে হাসি ফোটে। ছেলেকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন।

চলে যাবার আগে আলীকে পরদিন বাসায় যেতে বলে গেলো মিঠু। তার ক্যাডেট কলেজ থেকে ফেরা উপলক্ষে পার্টি দিয়েছে ওর বাবা-মা। ওদের বেশ কিছু আত্মীয়-স্বজনেরা আসবে। আলীর ভালো ফলাফলের কথা শুনে মিঠুর বাবা-মা খুবই মুগ্ধ। তারাই আলীকে আসার জন্য বিশেষভাবে বলেছেন। আলী হ্যাঁ-না কিছুই বলে না। মিঠুর বাবা-মায়ের সামনে তার নিজেকে ছোট মনে হয়। তাদের আচার-আচরণ তাকে পরতে পরতে স্মরণ করিয়ে দেয় তার সামাজিক অবস্থানের কথা। নিজ বাবার কথা তার মনেও নেই। বানু কখন সেই প্রসঙ্গ তোলে না, সে-ও ওসব নিয়ে কথা বলে না। প্রয়োজন দেখে না। বানু একাই একশ। বাবার অভাব সে কখনই অনুভব করে নি।

সপ্তাহ খানেক পেরিয়ে গেছে। মিঠুর দাওয়াতে যায় নি আলী। সে রাগ করেছে হয়তো। কারণ বেশ ক'দিন আর কোন সাড়া শব্দ নেই। আলী বেশ কয়েকবার ভেবেছে ওর বাসায় যাবে; কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত না পেরে এক সন্ধ্যায় বাসার বাইরে পা রাখলো। রাস্তার বখাটে ছেলেরা সবাই বাসায় ফিরে গেছে। তবুও সাবধানের মার নেই। আলী রিক্সা নিয়ে হুড তুলে বসে। মিঠু হলে এইসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতো না। কিন্তু সে মিঠুর মতো দৃঢ় মনের নয়। কারো টিটকারী শুনতে তার ভালো লাগে না।

মিঠুর বাসায় গিয়ে বিপদেই পড়লো। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই রুবীর মুখোমুখি। রুবী ফুপির ভক্ত। প্রায়ই আসে। সে থমথমে মুখে তাকিয়ে থাকলো। আলী কি করবে বুঝতে পারে না। মিঠু ওকে রক্ষা করে। "এলি শেষ পর্যন্ত।"

আলী অপরাধী মুখে বললো, "সেদিন আসতে পারিনি। রাগ করেছিস নিশ্চয়?"

মিঠু হালকা গলায় হাসলো। "ভালো করে তাকিয়ে দেখ। রাগ কার হয়েছে বুঝতে পারছিস?"

আলী চেষ্টা করে রুবীর দিকে না তাকাতে। সে এখনও রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। ভালো ফ্যাসাদ। দোষ করলো নিজে, ছোটবোনকে চড়-থাপ্পড় মারলো, আবার রাগ দেখাচ্ছে আলীর উপর। খুবই অন্যায়।

পরিস্থিতি আরো রসময় করে তোলার জন্য মিঠু ব্যস্ততার ভান করে বললো, "তুই একটু বয় । আমি দু'মিনিটের জন্য একটু বাইরে যাবো ।"

বসতে সাহস হলো না আলীর । এমন রূপসী মেয়ের এতো রাগ থাকতে পারে সে ধারণাও করেনি । একা পেয়ে খামচা-খামচি শুরু করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ।

"কোথায় যাচ্ছিস? আমিও আসি?"

"চুপ করে বসো ।" ধমকটা এলো রুবীর কাছ থেকে ।

আলী বসে পড়লো । রুবীকে একাকী পাওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার । পরিস্থিতি খুব প্রীতিকর না হলেও সেই সুযোগ হারানোটা যুক্তিযুক্ত নয় । মিঠু মুচকি হেসে কেটে পড়লো ।

কয়েকটি মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটলো । আলী আড়চোখে কয়েক বার রুবীকে দেখেছে । রাগের বদলে সেখানে খানিকটা বিষণ্নতা । চোখ নামিয়ে বসে আছে । এখন আবার কি ভাবছে কে জানে?

"চিঠিটা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও ।" হঠাৎ বলে রুবী । এমন একটা আব্দারের জন্য প্রস্তুত ছিলো না আলী । এই চিঠি নিয়ে এতো কিছু । ছিঁড়ে ফেললেই ভালো হতো । সে নিঃশব্দে মাথা দোলায় । না ।

"কেন নয়? তুমি আমাকে দিয়েছো । ওটা আমার । নিশির কোন অধিকার নেই আমার জিনিষ ফিরিয়ে দেবার । দিয়েছি দুইটা থাপ্পড় । ভালো শিক্ষা হয়েছে ।"

"খুব অন্যায় করেছো ।" আলীর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ।

"নিশির জন্য খুব দেখি মায়া হয়েছে ।" ভ্যাঙচায় রুবী ।

"তুমি সবাইকে দেখালে কেন চিঠিখানা?" আলী উষ্ণতা ঢাকতে পারে না ।

"আমার জিনিষ আমি যা ইচ্ছা করবো । তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে? চিঠি ফেরত চাই । মিঠুর হাতে দিয়ে দেবে ।" রুবী উগ্র কণ্ঠে বলে ।

আলী উঠে দাঁড়ায় । "নিশির গায়ে হাত দেবার দরকার ছিলো না ।"

"যেওনা । বসো ।" রুবী ধমকে ওঠে ।

আলী মিঠুর বাসা থেকে বেরিয়ে আসে । ওর কান গরম হয়ে গেছে, বুকের ভেতরে ধুকধুক করছে । রাগের লক্ষণ । রুবীর সাথে সে ঝগড়া করতে চায় না । নিজেরই খারাপ লাগবে । ঘুম ছুটে যাবে । ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা যা করে করুক, কিন্তু ছোট বোনের শরীরে হাত তোলাটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় ।

পাশের ভিডিওর দোকানে মিঠুকে খুঁজতে গেলো । মিঠু সেখানে নেই । কোথায় গেছে কে জানে? বাসায় ফিরে গেলো আলী । রাতে অল্পই ঘুম হলো । বার বার শুধু রুবীর সাথে ঝগড়ার ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো মাথার মধ্যে ভাঙা রেকর্ডের মতো ঘুরতে থাকলো । কি যে বিপদ । এই অনুভূতি থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়?

পরদিন দুপুরে রিক্সা নিয়ে নিশি এলো, একাকী। দরজা খুলে মেয়েটাকে দেখে ঘাবড়েই গেলো আলী। এতো ঝুট-ঝামেলার পর এই মেয়ে আবার কোন সাহসে এলো। ওর কি কোন কিছুর ভয় নেই?

"কার সাথে এসেছো? আলী কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়।

"একাই।" নিশি গম্ভীর। বয়সের তুলনায় তার আবার আচরণ বরাবরই একটু বড়সড়। "চিঠিটা ফেরত নিতে এলাম।"

"কেন?" আলীর অবাক হবার পালা।

"আপু কাল রাত থেকে অনশন ধর্মঘট করছে। পানি পর্যন্ত খায় নি। সবাই আমাকে দুষছে।" নিশি বিরক্ত কণ্ঠে বললো।

বানু নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। "দিয়ে দে।" সে শান্ত কণ্ঠে বললো।

"সারা দেশময় জানিয়ে বেড়াবে মা।" আলী অসহায় কণ্ঠে বলে।

"জানাক।" বানু জোরের সাথে বলে। "নিশির উপর এই নিয়ে অনেক ঝড় গেছে। আর না। একটা প্রেমের চিঠি লিখেছিস। খারাপ কথা তো কিছু নেই। দিয়ে দে।"

নিশি চিঠিখানা নিয়েই চলে যায়। বানু বসতে বলে না। জানে ওর বাবা-মা খবর পেলে ক্ষুব্দ হবেন। আলী সাথে যেতে চাইলো। নিশি সোজা-সাপ্টা না করে দেয়। এতোটুকু মেয়ের এতো মনের জোর কিভাবে হয়? অবাকই হয় আলী।

ছুটির বাকী দিনগুলোতে রুবী বা নিশি কারো সাথেই তার আর দেখা হয় না।

টিলাময় শহর হান্টসভিল। ছিমছাম। ছবির মতো। হাইওয়ে ইলেভেন থেকে এক্সিট নিয়ে মেইন স্ট্রিট ধরতে হয়। এটাই শহরের বুক চিরে এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে হাইওয়ে ৬০ এ। শহরের দুই পাশে দু'টি বড় লেক ফেয়ারি লেক এবং লেক ভারনন। একটা চিকণ ক্যানেল যুক্ত করেছে দুই লেককে। শহরে ঢুকেই বিশাল হৈ চৈ দেখে সবারই মন চাঙ্গা হয়ে গেলো। চারদিকে বেশ একটা উৎসব-উৎসব ভাব। টুরিস্টে দোকান পাট, রাস্তা ঘাট গমগম করছে। ক'দিন আগেই জি-২০র সম্মেলন হয়ে গেছে এখানে। সেই কারণে হয়তো জন সমাগম কিছু বেশীই হয়ে থাকবে। অনেকগুলি বিশাল আকৃতির বাস সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো রাস্তার পাশে। চীনা বংশোদ্ভুত বিশাল একটি গ্রুপ এই বাসের বহর ভাড়া করে বেড়াতে এসেছে। বুড়োবুড়ি থেকে শুরু করে ছেলে মেয়েরা দৌড়া-দৌড়ি করে এলাকা মাতিয়ে ফেলেছে। পরে সদা কৌতুহলী মইনুল জনৈক টুরিস্টের সাথে আলাপ জমিয়ে জেনেছিলো এই বিশেষ গ্রুপটা প্রতি বছরই এই সময়ে জাকজমক করে হান্টসভিলে আসে। এই জায়গাটা তাদের পছন্দ। টরোন্টোর ব্যস্ত জীবন থেকে কয়েকটা দিনের জন্য নিস্তার পাওয়া য়া।

১২

মোটেল দেখে প্রথম কয়েক মুহূর্ত সবাই কিঞ্চিৎ অপ্রস্তত বোধ করলো। চারদিকে এতো সুন্দর সুন্দর মোটেলের মাঝখানে লক্কড় ঝক্কড় মার্কা দালানটাকে আদৌ মানাচ্ছে না। একটি টিলার শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকায় মোটেলের অর্ধেকটা মাটির নীচে। মেইন ষ্ট্রিট সংলগ্ন অংশটা প্রথম তলা - লবি, টিলা বেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা নিয়ে বাঁয়ে ঘুরলে পার্কিং লট - ফুট দশেক উঁচুতে। এই লেভেলেই অধিকাংশ কামরা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে আরো আট দশটি কামরা। সব মিলিয়ে তিন তলাই বলা যায়। মোটেলের পেছনে জংলী এলাকা, টিলার শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না। ঢাল বেয়ে উঠে আসা রাস্তাটা একটা বাঁক ঘুরে কাছেই অবস্থিত একটা ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে গিয়ে শেষ হয়েছে।

মোটেল বাছাইয়ের দায়িত্ব ছিলো বশীরের। সবার মুখে কিঞ্চিৎ মেঘের ছায়া দেখে সে দ্রুত বললো, "এর চেয়ে ভালো আর কিছু পাওয়া গেলো না। সব বুকড। দেখতে একটু ইয়ে হলেও একেবারে মন্দ নয়।"

লতা বাঁকা চাহনি দিলো। " আর মানুষ পেলো না এই অকম্মাকে দিয়েছে মোটেল খুঁজতে।"

শিলা বললো, "এতেই চলবে। বেড়াতে এসে এতো বাছাই করলে চলে নাকি। আমি তিন তলায় উঠছি।"

নুরী সন্দিহান দৃষ্টিতে কাঠের কাঠামোটাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললো, "আমি এই তলাতেই থাকতে চাই। কখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে....."

শিলা টিপ্পনি কাটলো, "পড়লে তোমার মাথার উপরেই পড়বো।"

একটা হাসির দমক গেলো। তাতে প্রাথমিক দ্বিধাটুকু কাটলো। বশীরের মনের জোর বাড়লো। সে গলা চড়িয়ে বললো, "কে কোন রুমে থাকতে চায়? অফিসে গিয়ে পৃথকভাবে রেজিস্ট্রি করতে হবে।"

রুম বাছাই নিয়ে কিছুক্ষন হৈ চৈ হলো। কয়েকজন দোতলায় থাকলো, বাকীরা গেলো তিন তলায়। আলী সবার বাছাইপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। সে একা মানুষ। এসব নিয়ে বাছবিচার করে না। কিন্তু শেষতক দেখা গেলো কোন এক মন্ত্রবলে তার এবং নিশির কামরা দোতলায় পাশাপাশি পড়ে গেলো। নিশির মামা-মামী তিনতলায় গিয়ে উঠলেন। মামাই নিশির রুম রিসার্ভ করেছেন। কিছু একটা চক্রান্ত যে পাকিয়ে উঠছে বুঝতে বাকী থাকলো না আলীর। এই ভাবীগুলো বাইরে হৈ হৈ রৈ রৈ করলেও নিজেদের মধ্যে খুবই হিসেব করে চলেন। তারা এমনভাবে কামরা বাছাই করেছেন যেন আলী ও নিশির

পাশাপাশি রুম পেতে কোন অসুবিধা না হয়। মামার সহযোগীতায় পুরো ব্যাপারটা খাপে খাপে লেগে গেছে।

নিশি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। তার যে এই বিশেষ পরিস্থিতিটা খুব মন্দ লাগছে না, তা বুঝতে তিন বছরের শিশুরও অসুবিধা হবে না। টিসা অবশ্য মায়ের আনন্দে অংশীদার হতে পারছে না। নুরীর মেয়ে পলির সাথে তার বেশ খাতির হয়েছে। পলি তিন তলায় থাকছে। তার কাছাকাছি থাকতে পারলেই সে খুশী হতো। "মা, আমি পলির সাথে স্লিপ ওভার করবো।" সে ঘোষণা দিলো।

নিশি ধমক দিয়ে উঠছিলো কিন্তু তার মুখের কথা লুফে নিলো নুরী। "নিশ্চয়। পলিও খুব খুশি হবে।" স্বামীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো সে। "হ্যাগো, আজ কি আকাশে চাঁদ উঠবে! ওদিকটাতে গাছ-পালার নীচে গিয়ে বসতে মন্দ লাগবে না।"

মইনুল ব্যাপারটা ধরতে পারলো না। সে বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "হ্যাঁ, মশার কামড় খেতে!"

নুরী মুখ বাঁকালো। "কিছু বোঝে না।"

ডালিয়া কৌতুহলী কণ্ঠে জানতে চাইলো, "কি বোঝে না ভাবী?"

শিলা হাত তুললো। "কিছু না। তোমাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে রাত হয়ে যাবে।"

ডালিয়া খিল খিল করে হাসতে লাগলো। শিলা সবাইকেই খোঁচা দিয়ে কথা বলে। এমনভাবে বলে যে শুনতে ভালো লাগে।

"বলেন না, শিলা ভাবী। কি হয়েছে?"

বশীর দুই হাত তুলে এই অপ্রয়োজনীয় আলাপ বন্ধ করে দিলো। "সময় নষ্ট করার মতো সময় নাই। সবাই তাড়াতাড়ি রুমে ওঠেন। খাবার-দাবার যেগুলো রান্না করে আনা হয়েছে ও গুলো দ্রুত সাবাড় করে উর্দ্ধে যাত্রা করতে হবে। বিকেল হতে বেশী বাকী নেই।"

বেলী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো, "উর্দ্ধে মানে? মহাশূন্যে নিয়া যাইবেন নি, বশীর ভাই?"

বশীর তর্জনী উঁচিয়ে ঠিক সামনেই মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টাকে দেখালো। "লায়ন্স লুক আউট পয়েন্ট। আমারতো এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"যান, পাংখা মেইলা যান। আমি কামরায় গিয়া বিছানায় ফ্লাট হমু, তিন ঘন্টায় উঠতাছি না। আরাম করতে আসছি, ছুটাছুটি করতে আসি নাই।"

বশীর হতবাক হয়ে সবার দিকে তাকায় সমর্থনের আশায়। "বলো কি? এমন সুন্দর জায়গায় এসে শুয়ে বসে কাটাবে?"

মইনুল হাসলো। "বশীর ভাই, বেলী আপনাকে একটু খোঁচাচ্ছে। এতোদিনেও ওকে চিনলেন না। তবে খাবারগুলো নামানো দরকার। গরমে গাড়ীর মধ্যে কয়েক ঘন্টা বসে আছে। নষ্ট না হলেই হয়।"

বেলী দুকোমরে হাত রেখে বললো, "বিরিয়ানি রাইন্ধা আনছি। নষ্ট হইলেও ওইডাই খামু।"

সে-ও এই দলে হাসি-তামাসার জন্য পরিচিত। সবাই মন খুলে হাসলো, অকারণেই।

মেয়েরা গেলো কামরার দখল নিতে। ছেলেরা গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করলো। বাচ্চারা স্বভাবমত ছোটাছুটি করে পরিবেশ মাতিয়ে ফেললো। বাবা-মায়েরা তাদেরকে পালাক্রমে ধমক দিয়েও ক্ষান্ত করতে পারলো না।

আলী কামরায় ঢুকে ইচ্ছে করেই দরজাটা খুলে রাখলো। ঘরের দরজার সাথে মনের দরজার যোগসাজশ যে একটা আছে তা মিথ্যে নয়। নিজের ঘরে মেয়েকে নিয়ে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে নিশি। মেয়েদের আবার ঘটা করে বাথরুম সংক্রান্ত নানান কাজকর্ম না সারলে চলে না। প্রাকৃতিক কর্ম থেকে শুরু করে রূপচর্চা সব কিছুই সময় সাপেক্ষ।

বশীরের কামরাতেই সব খাবার দাবার এনে তোলা হলো। প্যাকেট ভর্তি সস্তা কাগজের গ্লাশ প্লেটও চলে এলো। মহিলারা দল বেঁধে মাইক্রোওয়েভে রেঁধে আনা ঠান্ডা খাবার গরম করতে লেগে গেলো। বাচ্চাদের বাসার বাইরে পা রাখলেই ক্ষিধে বাড়ে। তারা খাবারের উপর হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বেলী তেতো কণ্ঠে বললো, "বাসার মধ্যে যাতা দিয়া খাওয়ন যায় না আর অহন দেহী তগো তর সইতাছে না।"

শিলা বললো, "সব কটা ফাজিল।"

মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বাচ্চাদের দল খিল খিল করে হাসতে লাগলো। নিশি টিসাকে সঙ্গে নিয়ে সবার সাথে যোগ দিলো। দু'জনাই জামা কাপড় পাল্টিয়েছে। ম্যাচিং করে নীল সালোয়ার কামিজ পরেছে। চুল ছড়ানো। সবাই ফিরে তাকালো।

ডালিয়া বললো, "বাহ্! দু'জনকে চমৎকার লাগছে, মনে হচ্ছে যেন দুই বোন।"

হেসে ফেললো নিশি। "এটা আমার আহ্লাদী মেয়েটার কাজ। মায়ের সাথে ম্যাচিং করে কাপড় পরবে।"

লতা বললো, "ভালোই তো! আমার একটা মেয়ে থাকলে দু'জনে সবকিছু ম্যাচিং করে পরতাম।"

আলী গুটি গুটি পায়ে ওদের পেছনে এসে দাঁড়ালো। নিশি তার খোলা দরজায় উঁকি দেয়নি। হয়তো আলী একটু বেশীই আশা করছে। সবার সামনে নিশি মনে হচ্ছে একটু এড়িয়েই চলছে। সেটাই স্বাভাবিক। এমনিতেই সবাই মুখিয়ে আছে, কোন সুযোগ দিলে আর টেকা যাবে না।

বেশ তোড়জোড় করেই খাবার পর্ব সারা হলো। এতোগুলো মানুষ হৈ-হট্টগোল করে খোলা করিডোরে দাঁড়িয়ে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে, পথচারীরা অনেকেই কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। তবে অনেকেই এখানে নিজেরাই বেড়াতে এসেছে। হৈ চৈ দেখে তাদের বরং মনে হলো ভালোই লাগছে। কোথাও বেড়াতে গিয়ে ভীড়-ভাট্টা আর আমোদ-প্রমোদের চিহ্ন না দেখলে আনন্দ অর্ধেকটাই মাটি হয়। খাওয়া শেষ হবার আগে থেকেই বশীর সবাইকে তাড়া দিতে শুরু করেছিলো। তার ভাষ্য অনুযায়ী বাঙ্গালীকে খোঁচাখুচি না করলে বাঙ্গালী নড়তে চায় না। বাচ্চারা অনেকেই এই কথা শুনে বেশ কৌতুহলী হয়ে পড়লো। তারা সবাই অল্প সল্প বাংলা বোঝে ও বলে। তারা বাঙ্গালী কেন নড়তে চায় না এবং তাকে

খোঁচা দেবার অর্থ কি এ নিয়ে বশীরকে ত্যাক্ত করতে শুরু করায় বশীর গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। "তোমরা গেলে গাড়ীতে ওঠো, নইলে আমি একাই চল্লাম।"

পাহাড় জাতীয় যে কোন কিছুর গল্প পেলেই ছেলে মেয়েরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বশীরের হুমকিতে কাজ হয়। তারা জানে বশীরের পিছু ছাড়লে বাস্তবিকই তাদের হয়তো মোটেলেই বিকেলটা কাটাতে হতে পারে। বাবাদের দল খেয়ে দেয়ে তাস নিয়ে বসে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই। কোথাও বেড়াতে গিয়ে তাবৎ আকর্ষণীয় জায়গাগুলো না দেখা পর্যন্ত বশীরের শান্তি নেই। বাকীরা তার অনুপ্রেরণাতেই বাধ্য হয়ে ঘোরাঘুরি করে। বের হতে আরোও আধ ঘন্টা গেলো। পার্কিং লটে পুরুষ ও মহিলাদের দলের আরেক দফা আড্ডা বসলো। বশীরের হৈ-চৈয়েও খুব কাজ হলো না। নিশি খুব মজা পাচ্ছে। বশীরের বিরক্ত মুখ আর কটুক্তি শুনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে সে।

শেষ পর্যন্ত সবাই গাড়ীতে উঠতে বশীর শান্ত হলো। নিশির মামা-মামী কৌশলে নিশিকে আলীর গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করলেন কিন্তু নিশি মুখ ম্লান করে তাদেরকে চোখ রাঙিয়ে তাদের গাড়ীতেই গিয়ে বসলো। বোঝা গেলো বেশী বাড়াবাড়ি করতে সে আগ্রহী নয়। আলী মনে মনে আশা করছিলো নিশি ওর গাড়ীতে আসুক। মুখে অবশ্য কিছু বলেনি।

লায়ন্স লুক আউট পয়েন্ট হান্টসভিল শহরের ভেতরেই। মোটেল থেকে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের ড্রাইভ। পার্ক রোডে অবস্থিত দর্শনীয় কানাডা সামিট সেন্টার যেখানে ক'দিন আগেই জি-২০র সম্মেলন হয়ে গেছে তার পাশ ঘেষেই বেশ ঢালু রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে হয়। অনেকেই হেঁটেই ওঠে তবে গাড়ী চালিয়েও যাওয়া যায়। মানুষ জনের ভীড় কাটিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরানো রাস্তা ধরে একেবারে চূড়ায় উঠে এলো ওরা সবাই। চারদিকে নানান জাতের গাছপালা, রঙের বাহারে চোখ ঝলসে যাবার মতো। শারদীয় রঙের সমাহার দেখে উপস্থিত টুরিস্টরা সবাই মুগ্ধ। একেবারে চূড়াতে কিছু পার্কিং করবার জায়গা আছে যদিও বেশী মানুষজন গাড়ী নিয়ে এলে স্থান সংকুলান হবে না।

গাড়ী পার্কিং করবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো শওকত মামাকে। আলী ঝট করেই একটা জায়গা পেয়ে গেলো। পার্কিং করবার জন্য ঘোরাঘুরি করতে তার মেজাজ খারাপ হয়। সে গাড়ী থেকে বেরিয়ে দলের অন্যদের খোঁজ করলো। অল্পতেই তাদের দেখা মিললো। টুরিস্টদের বসার জন্য ছোটখাটো একটা প্যাভিলিয়ন তৈরী করা হয়েছে। তার নীচে সবাইকে পাওয়া গেলো। শওকতের গাড়ী পার্ক করতে দেরী হচ্ছে দেখে নিশিও গাড়ী থেকে নেমে এলো। টিসা আগেই নেমে তার বান্ধবীর সাথে জোট পাকিয়েছে। নিশি প্যাভিলিয়নে এসে দাঁড়ালো। ছবি তোলার পর্ব শুরু হয়েছে। ভাবীরা ওকেও জোর করে দলে ভেড়ালো। আলী সেখান থেকে একটু সরে পাহাড়ের কিনারে এসে দাঁড়ালো।

পাহাড়টা সব দিকেই বেশ খাড়া। তবে কিছু দিকে চড়াইটা বিপদজনকভাবে ঝট করে নেমে গেছে। কেউ পা ফসকালে নির্ঘাত মৃত্যু। কম করে হলেও দু'শ ফুটের চেয়ে উঁচু হবে স্থানটা। নিরাপত্তার জন্য এই দিকগুলোতে বেশ উঁচু করে বেড়া দেয়া। যেদিকে দাড়ালে নীচে ফেয়ারী লেকটা দেখা যায় সেই পাশটা খোলাই রাখা হয়েছে। এদিকেও ঢালু তবে বিপদজনক নয়। নয়নাভিরাম দৃশ্য। ঝকঝকে পানির দুই তীরে ছবির মতো ছোট ছোট বাসা আর পাতার বাহার ছড়িয়ে দাড়িয়ে থাকা থরে থরে গাছপালা। লাল,

কমলা, হলুদ আর সবুজের মিশ্রণ মনকে দোলা লাগিয়ে দিয়ে যায়। বেশ কিছু যুবক যুবতী হাত ধরাধরি করে হা করে সেই দৃশ্য দেখছে। বুকের মধ্যে একটা অযাচিত খোঁচা টের পায় আলী। নারীসঙ্গ থেকে অনেকদিন বঞ্চিত। একাকী থেকে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ নিশির দেখা মেলায় চাপা পড়ে যাওয়া অনুভূতির স্রোতগুলো বইতে শুরু করেছে। সমস্যা হলো, নিশির মন মেজাজ বোঝা যাচ্ছে না।

একা একা হাটছিলো আলী, গাছপালার ভেতর দিয়ে ঝরে পড়া পাতা নাড়িয়ে হাঁটতে ভালোই লাগছিলো। চারদিকে মানুষজন গিজগিজ করছে। অনেকেই নীচে গাড়ি রেখে হেঁটে উপরে উঠছে। নিজ দলের মানুষজন ঠিক কোথায় আছে খেয়াল নেই আলীর। সবাই বউ-বাচ্চা নিয়ে এসেছে, বেশ একটা ভরপুর জীবন। এমনিতে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিংবা ঘামাতে চায় না। আজ কেন যেন সেই শূন্যতাটুকুই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওর মাথার মধ্যে খুব গোলামাল শুরু করে দিয়েছে। একাকী হাঁটতেই ভালো লাগছে। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে মনে হয়েছিলো হয়তো নিশিও নিঃসঙ্গ। কিন্তু মেয়েটার সহজ ব্যবহার দেখে তেমনটা মনে হয় না। হয়তো মেয়েদের নিঃসঙ্গতাবোধ পুরুষদের মতো এতো শক্তিশালী নয়। তারা সহজেই মানিয়ে নিতে পারে।

"এভাবে কি দেখা হচ্ছে? " নিশির গলা। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি আলী। আনমনে একটা ওক গাছের বিশাল গুড়ির দিকে চেয়ে ছিলো। কিছু দেখছিলো বলে মনে হয় না। ভাবছিলো। কি ভাবছিলো মনে করতে পারে না।

"কিছু না। তুমি একা? মেয়ে কোথায়?"

"আছে ওর বান্ধবীদের সাথে। মায়ের খোঁজও করছে না আর।"

"চমৎকার মেয়ে। খুব মায়াবী।"

নিশি মুচকী হাসলো। "তুমি খুব নিঃসঙ্গ।"

প্রশ্ন নয়। উক্তি। হেসে উঠলো আলী। সত্য চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। "একা থাকলেই কি মানুষ নিঃসঙ্গ থাকে। কাজে কর্মে খুবই ব্যস্ত থাকি।"

"বউয়ের সাথে কথা হয় না?"

"না। আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি। ও এড়িয়ে যায়। হয়তো অন্য কোন বন্ধুটন্ধু হয়েছে। থাক ও আলাপ।"

"ডিভোর্স কেন হয় নি এখনো?"

"জানি না। কখনও বন্ধন ছিলো বলে মনেই হয় না। ফলে বন্ধন ভাঙার প্রয়োজন পড়েনি। ঝামেলাটা সেরে ফেলতে হবে। হাঁটবে?"

"অন্যদিকে চলো। লেকটা সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"সবাই তো মনে হয় ওদিকেই ....."

"থাকুক। এতো লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমাদের এতো দিনের পরিচয়। আমরা কেমন অপরিচিতের মতো ব্যবহার করছি। আমারই দোষ। সবকিছুতে হিসাব করি। জীবনে ঠেকে ঠেকে এমন হয়ে গেছি।"

হাঁটতে হাঁটতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসে ওরা। ঠিক সামনেই ঝকঝকে লেক আর দূরে নীল আকাশ, শেষ বিকেলের রোদটা ভালোই দেখাচ্ছে।

"আমাদের জীবনটা অন্যরকমও হতে পারতো। তাই না?" হঠাৎ অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বললো নিশি।

আলী উত্তর দেয় না। নিশির এই আচমকা দূর্বলতা তার খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু সে এমন কিছু বলতে বা করতে চায় না যাতে নিশি আবার গুটিয়ে যায়। বরং চুপচাপ থাকাই ভালো।

"কিছু বলছো না কেন?" নিশি গভীর ভাবে তাকালো।

"সময়তো এখনো চলে যায় নি। তুমিওতো একা।" আলী সাহস করে বলে ফেলে।

নিশি গম্ভীর হয়ে পড়ে। "আমার জীবনে অনেক প্যাঁচ। আমার সাথে জড়ানোর চিন্তা না করাই ভালো। যখন সুযোগ ছিলো তখনই হয়নি। এতো বছর পর ঝরে যাওয়া ফুলে কি গন্ধ থাকে।"

টিসা বিশাল একটা মেপল পাতা খুঁজে পেয়েছে। সে মাকে দেখানোর জন্য ছুটে এলো। "মা দেখো, কি বিশাল! সুন্দর না?"

নিশি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। "হ্যাঁ। অনেক সুন্দর।"

"আরোও বড় বড় আছে। কুড়াবে?" টিসা হাত ধরে টানছে।

"চল।" নিশি চলে যায়। এক দল বাচ্চা মেয়েদের সাথে বড় বড় মেপলের পাতা কুড়াতে লেগে যায়। ওর বেনী করা চুলের গোছা কাঁধের এপাশ ওপাশ সাপের মতো দুলছে। আলীর বুকের মধ্যে খচ করে ওঠে। কিছু কিছু দৃশ্য এতো আপন মনে হয়। মনে হয় কত অসংখ্যবার দেখেছে।

ডালিয়া এবং ঝুমুর একমাত্র ছেলের জন্মদিন আজ। ওরা স্থানীয় রেস্টুরেন্টে সবাইকে রাতে খাওয়াবে। মোটেলে ফিরে দ্রুত পোশাক পাল্টে তৈরী হতে হলো সবাইকে। রেস্টুরেন্টে নয়টার পর নতুন খদ্দের নেবে না। তার আগে ভেতরে ঢুকতে হবে। যেতে যেতে সাড়ে আটটা হলো। অনেক রেস্টুরেন্ট এখানে। সব ধরণের। অনেক আলাপ আলোচনার পর একটা ইটালিয়ানই বাছাই হলো। বেশ প্রশস্ত, লাইন দিয়ে সাজিয়ে রাখা বেশ কয়েকটি টেবিল, প্রতিটিকে ঘিরে ছয়টি কাঠের গদি আলা চেয়ার। চারদিকে বেশ কাঠের কারুকার্জ। রুচিপূর্ণ। ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোর একটা গড়পড়তা ইমেজ আছে। এটিও তার অন্যথা নয়। ভেতরে ঢুকবার জন্য অপেক্ষা করতে হলো না। একজন মহিলা কর্মী ওদেরকে পথ দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ভীড়ের পাশটিতে নিয়ে এলো। বাচ্চারা হৈ চৈ করে কে কোথায় বসবে, কে কার পাশে বসবে, সেসব নিয়ে চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি করলো। সমস্যা মিটতে সময় লাগে না। নিজেরাই ব্যবস্থা করে ফেলে। পাশাপাশি দুটো টেবিল দখল করেছে তারা। বড়রাও দু'টি টেবিল দখল করলো। সবার জায়গা হবে না দেখে আলী একটা পৃথক টেবিলে বসেছিলো। মামা, মামীসহ নিশিও সেটাতেই বসতে যাচ্ছিলো, বশীর ভাই খুবই হৈ চৈ করে শওকত এবং লায়লাকে তাদের টেবিলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

সেখানে নাকি দু'জনার জায়গা আছে। তাদেরকে বশীর ভাই কিছুতেই আলাদা বসতে দেবেন না। অপাংতেয়ের মতো পড়ে থাকলো নিশি। সে মুখ ঢেকে হাসতে লাগলো।

আলী হাসি চেপে বললো, "বসে পড়ো। জনগনের চাওয়ার মূল্য দিতে হয়।"

নিশি মুখোমুখি বসলো। ফিসফিসিয়ে বললো, "লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। সবাই এমন করলে হয়? আমরা কি ছেলেমানুষ?" সে কুলকুলিয়ে হাসতে লাগলো।

আলী চেষ্টা করলো স্বাভাবিক থাকতে। আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো বড়রা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেনুর উপর, যেন আর কোন কিছুই তারা খেয়াল করছে না। বাচ্চারাও মেনু নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। টিসাও সবার সাথে বেশ জমে গেছে। নিশি তাকে পাশে এসে বসার জন্য ডাকলো, সে শুনলই না।

অর্ডার পর্ব ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলো। মুখরোচক এপেটাইজার ঝটপট চলে এলো। সবাই মনে হলো ক্ষুধার্ত ছিলো, কারণ ঝট করেই প্লেটগুলো ফাঁকা হয়ে গেলো।

মেইন অর্ডার আসতে একটু সময় লাগছে। অনেকগুলো অর্ডার গেছে। বিশ-পঁচিশ মিনিটতো লাগবেই। বশীর ভাইরা হৈ চৈ করে গল্প করছে। মহিলারাও নিজেদের একটা আলাদা টেবিল নিয়ে কলকাকলীতে মেতে উঠেছে। আলী এবং নিশিই চুপচাপ মুখোমুখি বসে। আলীকে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে বিরক্ত হলো নিশি।

"সবাই মজা করছে আর আমরা দুই গাধা সঙের মতো বসে আছি।" বিড়বিড় করে বললো সে।

"বসে থাকতে কে বলেছে। যাও, ভাবীদের দলে গিয়ে ভেড়ো।"

"নিলে তো। আমাদের ঘটকালি না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই।

"আপত্তির তো কিছু দেখছি না।"

"থাক। বুড়া বয়সে আর রঙ্গ তামাশা করতে হবে না। আমার মাথা ধরেছে। আশে পাশে কোথাও ঔষধের দোকান আছে নাকি?"

"রাস্তার ওপাশেই শপার্স ড্রাগমার্ট আছে। বসো, আমি নিয়ে আসছি।"

"আমিও আসবো। একটু বাতাস দরকার।"

ওদের দু'জনাকে উঠতে দেখে শওকত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মামী চোখ টাটানোয় চেপে গেলেন। আলী বা নিশির নজর এড়ালো না। বাইরে বেরিয়ে এসে পার্কিং লটে নামলো ওরা। অন্ধকারই। কিছু আলো আছে, কিন্তু বেশ দূরে দূরে। নিঃশব্দে আলীর গাড়ীতে উঠে বসলো দু'জন। টিসা দৌড়ে বাইরে এসেছে।

"মা, কোথায় যাচ্ছো" চীৎকার করছে সে।

"ঔষধ কিনবো।" নিশি বললো। "তুমি ভেতরে থাকো।"

"ঔষধ কেন?"

"মাথা ধরেছে। তুমি ভেতরে যাও। চলে আসবো।"

টিসা ভেতরে গিয়ে বাকী বাচ্চাদের সাথে যোগ দিলো। নিশি বললো। "মেয়েটা স্কুলের বাইরে একাকীই থাকে। কিন্তু খুব বন্ধু পছন্দ।"

গাড়ী নিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এলো আলী। "মায়ের মতো নয়, দেখা যাচ্ছে।"

"থাক, আর আমার বদনাম করতে হবে না।"

ঔষধের দোকানের সামনে রাস্তায় পার্কিং পাওয়া গেলো। সেখানে গাড়ী রাখলো আলী। নিশি ঔষধ কিনবার কোন আগ্রহ দেখালো না। গাড়ীতেই বসে থাকলো। আলীকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে চোখ মটকালো। "ভীড় থেকে বেরিয়ে এলাম । হাঁটবো।"

"ফুটপাথে?"

"চাইলে বনে জঙ্গলেও যেতে পারি।"

আলী হাসলো। "খোঁচা দিতে তোমার জুড়ি নেই। চলো, হাঁটি।"

ফুটপথে আলো আছে। অনেকেই চলাফেরা করছে। ওরা কিছুক্ষন নিঃশব্দে হাঁটালো।

"কি যেন হয়েছে আমার জানো?" হঠাৎ বললো নিশি 'শুধু আগের কথা মনে পড়ছে। পুরানো দিনের কথা।"

আলী হাসলো। "আমারও।"

"ভার্সিটির কথা বেশী না।"

"খুলনার কথা, নিশ্চয়।"

খিল খিল করে হাসলো নিশি। "হ্যাঁ। ছোটবেলার কথাই বেশী মনে পড়ছে। আশ্চর্য তাই না? মনে আছে রুবী আপা আমাকে থাপ্পড় দিয়েছিলো?"

"মনে থাকবে না? একটা কথা কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করিনি। সেই চিঠি ফেরত পেয়ে রুবী কি করেছিলো?"

"তুমি জানো না? কখনো বলিনি তোমাকে?"

"না। রুবীকেও কখনো জিজ্ঞেস করিনি।"

"ভালো করেছো । সেই চিঠি আমি রুবী আপাকে কখনো দেই-ই নি।"

"চিঠি নিয়ে কি করেছিলে তাহলে?"

"কিছুই করিনি। আমার কাছেই আছে।"

"এখনো?"

"দেখবে?"

"সাথে নিয়ে ঘুরছো?"

"হ্যাঁ। একটা কারণে।" নিশি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করলো। "দেখো তো, চিনতে পারো কিনা।"

কাগজটির বয়স হয়েছে, ভাঁজগুলো পুরানো হয়েছে, কিন্তু চিনতে কষ্ট হয় না। নিজের হাতের লেখা চিনতে ভুল হবার প্রশ্ন আসে না। "আশ্চর্য। এতো বছর ধরে এটা জমিয়ে রেখেছো কেন?"

ঝট করে ছিনিয়ে নেয় কাগজটা নিশি। "কোনদিন আবার দেখা হবে ভাবিনি। কেন ফেলে দেইনি জানো?"

"নিশ্চয় মন্দ কোন উদ্দেশ্য আছে।"

নিশি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটে। "ছোটবেলার স্মৃতিগুলোই মনে হয় সবচেয়ে মধুর, তাই না?"

"হ্যাঁ, অকালপক্কদের জন্য।"

হেসে ফেললো নিশি। "ভালোবাসার বয়স নেই।"

একটা ময়লা ফেলার ক্যানের পাশে থামলো নিশি। চিঠিটা বের করে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো ওটার মধ্যে।

আলী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলো। "কি করছো?"

"ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।"

"কেন? এতোদিন ধরে জমিয়ে রেখেছিলে ।"

"ছিঁড়বো বলেই রেখেছিলাম। তোমার সামনে। ঐ চিঠিতো আমাকে লেখা নয়। ঐ কবিতাও আমার জন্য নয়। ওটার জন্য আমার কোন মায়া নেই।"

"তাহলে রেখেছিলে কেন? রুবীকেই বা দাওনি কেন?"

"ইচ্ছে করেই দেই নি। কেন দেব?"

আলী হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। "নিশি, বয়স কত হয়েছে তোমার? "

"এখনও বুড়ো হইনি।"

"রুবীর সাথে তোমার এখনও রেষারেষি?"

"গত পাঁচ বছর আমার সাথে দেখা নেই।"

"বলো কি? কোথায় থাকে ও?"

" ফ্লোরিডা| "

"তাই! কবে এসেছে?"

"অনেক দিন। তোমার সাথে যোগাযোগ নেই?"

"নাহ। চলো ফিরি। ওরা নিশ্চয় অপেক্ষা করবে।"

"না যাবো না। আরেকটু হাঁটি।" নিশি ফুটপথ ধরে হাঁটতে থাকে। পিছু নেয় আলী। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটে ওরা।

"কেমন আছে রুবী?"

"ভালোই আছে। মনে হয়। অনেকদিন আলাপ নেই।"

আলীর অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু নিশির অনাগ্রহ দেখে চেপে গেলো। এতো বছরেও দু'বোনের সম্পর্কের কোন উন্নতি হয় নি, ভেবে অবাকই লাগছে। ভার্সিটিতে থাকতেও সারাক্ষণ লেগে থাকতো। আলী যে ওদের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলো সে জন্যে ওরাই দায়ী। থামলো নিশি। ভাবলো। "চলো ফিরেই যাই। টিসা আবার চিন্তা করবে। আমাকে নিয়ে ওর চিন্তার শেষ নেই।"

নিশি ফিরতি পথ ধরলো। আলীও নিঃশব্দে পিছু নিলো। বেশ মনোরম একটা বাতাস বইছে। চোখে মুখে ঝাপ্টাটা প্রীতিকর লাগছে। নিশির চুল উড়ে ওর মুখে এসে বাড়ি খাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো নিশি, হাসলো। "বদলাওনি।"

আলীও হাসলো। ভার্সিটিতে থাকতে ইচ্ছে করেই এক কদম পিছিয়ে হাটতো ও। বাতাসে ওর এলোমেলো চুল উড়ে এসে গালে ছুয়ে যেতো, অসম্ভব ভালো লাগতো। ছোট্ট, সামান্য জিনিষ, অথচ কারো কারো কাছে তা কতখানি মূল্যবান হতে পারে। আলী নিজেও অবাক হয়। পিয়ারও লম্বা চুল ছিলো। বাতাসে উড়তো। কিন্তু কখনো একই অনুভুতি হয় নি। অনুভুতির বীনায় কোন তারে কোথায় যে কিসের বাদ্য বাজে মানুষ নিজেও হয়তো তার সব খবর রাখে না। তার হঠাৎ নিশির হাত ধরেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ধরে না। ভার্সিটিতে থাকতেও দু'একবারের বেশী ধরা হয় নি। এতো কাছের দুটি মানুষ কখনই সেভাবে ঘনিষ্ট হয় নি। অবাকই লাগে। কিভাবে এমনটা হয়? কত নারী-পুরুষ দু'দিনের পরিচয়ে আরোও অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ে।

গাড়ীতে উঠে নিশি বললো। "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"বলো।"

"তুমি আমাকে নিয়ে কখনো কিছু লেখনি কেন? রুবী তোমার অনুপ্রেরণা হতে পারে। আমি পারি না?"

আলী সীটে হেলান দিয়ে কুলকুলিয়ে হেসে ওঠে।

"হাসছো কেন?" বিরক্ত হয় নিশি। "হিংসুটে ভাবছো? কে জানে আরোও কত জনকে নিয়ে কবিতা, গান লিখেছো শুধু এই হতভাগীকে দেখলে তোমার কাব্য উড়ে যায়।"

আলী জোরে জোরে হাসতে থাকে।

"হাসছো কেন?" ধমকে উঠে নিশি।

"বলবো না। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য তোমার শাস্তি হওয়া দরকার। এটা তোমার শাস্তি।"

"আচ্ছা, বলো না। আমি জানতে চাই না। ফেরো।"

আলী ফিরতি পথেও হাসতে থাকে। নিশিকে দেখানোর তারও কিছু আছে। এতোগুলো বছর সেও যে একটা জিনিষ সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছে ভাবাই যায় না।

তারা ফিরতে সবাই হৈ চৈ করে উঠলো। কেমন কান্ড জ্ঞান তাদের? কতক্ষণ হলো গেছে। কারো কাছে ফোন নাম্বারও নেই যে ফোন করে খবর নেবে। মুখ টিপে হাসলো দু'জন। আলীর ফোন নাম্বার সবার কাছেই আছে। নিশির মামা ভাগ্নিকে ইতিমধ্যেই ওয়ারলেস ফ্যামিলি প্ল্যানে ঢুকিয়ে ফেলেছে। সত্যি কথা হলো, তারা ওদের বিরক্ত করতে চায়নি। টিসা পর্যন্ত আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে। আলী গোপনে গোপনে ওকে লক্ষ্য করছে। টিসা কি হিংসা করছে? আলীকে কি ওর পছন্দ? ওর মায়ের সাথে আলীর ঘনিষ্টতা হলে ও কেমন চোখে দেখবে? ওয়েট্রেস ওদের খাবার অনেক আগেই দিয়ে গেছে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকান বন্ধ করে দেবে। দ্রুত খাওয়া সারলো আলী। নিশি তেমন কিছুই খেলো না। বোঝা গেলো ভাবছে, খুব একটা তাকাচ্ছে না। মনে মনে হাসলো আলী। কৌতুহল চেপে রাখতে পারবে মনে হয় না। দু'এক দিনের মধ্যে প্রশ্নটা নিশ্চয় করবে আবার।

১৩

ছুটির পর কলেজ ফিরে যাবার সময় খুব মন খারাপ করলো বানু। ছেলেটা কাছাকাছি ছিলো, কখনো নিজেকে একাকী লাগেনি। কিন্তু সময়টা এতো দ্রুত কেটে গেলো! আলী অবশ্য হাফ ছেড়ে বাঁচলো। পাগলা কিনুর ভয়ে অধিকাংশ সময় বাসার ভেতরেই কাটিয়েছে। মিঠুর দেখাও পাওয়া গেছে কালে ভদ্রে। রুবী একটা ভয়ানক প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে। কলেজে ফিরে গেলে হয়তো ভালো লাগবে। যদিও সেখানকার ধরা বাঁধা জীবনও খুব একটা টানে না ওকে। না এদিক না ওদিক। নিজের উপর বিরক্তিই লাগে।

মিঠু নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু আলী বাসে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো। সবসময় ওর কাছ থেকে উপকার নিচ্ছে, কখনো কিছু দেবার সুযোগ হয় না। দেবেই বা কি? কোন দিক দিয়ে কম সে? এমনকি লেখা-পড়াতেও ভালো। তুখোড়! ওর মতো হতে ইচ্ছে করে আলীর।

ঝিনাইদহে নামার পর বেশ একটা ভালো লাগার অনুভূতি হলো। শহরটার প্রতি ইতিমধ্যেই মায়া ধরে যাচ্ছে। কলেজের ছায়াঘেরা চত্বরে ঢুকেও চমৎকার একটা অনুভূতি হলো। অনেক কিছুই ভালো লাগে, অনেক কিছুই লাগে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত আশা-নিরাশা, হাসি-কান্নার বিনুনীতে গাঁথা প্রতিটি দিন, সব

মিলে মিশে একটা অপূর্ব অনুভূতি হয়। মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে একটা। এই সেমিস্টারটা কেমন যাবে কে জানে? পিটি, প্যারেড, সিনিয়রদের হুমকি, মারপিট, লেখা-পড়া সব মিলিয়ে খুবই ব্যস্ত জীবন। ও কোন ঝামেলায় যায় না। কিন্তু ঝামেলা এড়িয়ে চলাও কি সহজ?

ওর ঘনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে সবাই ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। তারা ওকে দেখে ছুটে আসে। সগীর, জিকু, বাকের, ইমন, নকিব। আবার মনটা ভয়াবহ রকম ভালো হয়ে যায়। ওর ভয় ভাবনা মুহূর্তে দূর হয়ে যায়। বন্ধুত্বের এক অসম্ভব প্রীতিকর অনুভূতিতে সমস্ত হৃদয় ছেয়ে যায়। ওরা সবাই জড়ো হয়ে খুব হৈ চৈ করে গল্প করে। কে কি করেছে ছুটিতে আলাপ হয়ে। মাঝে একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে এলো মিঠু এসেছে কিনা। মিঠু ওকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, "সাবধানে থাকিস।"

"কেন? কি হয়েছে?" আলী অবাক হয়।

"হয়নি কিছু। কিন্তু এটা সেটা শুনলাম। আমাদের সিনিয়র ব্যাচগুলোর মধ্যে ফাটাফাটি হতে পারে। জানতে পারবি পরে। তুইতো আবার বোকা সোকা। তাই তোকে বিশেষ করে সাবধান করলাম।"

মিঠু খোলাসা করে বলেনি। হয়তো জানেও না। চালাক ছেলে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ঠাহর করছে কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারছে না। আলী কাউকে কিছু বললো না। ওর ঘনিষ্ট বন্ধুদেরকেও না। কোন উল্টো পাল্টা ব্যাপারে ও নিজেকে জড়াতে চায় না।

দুই তিন সপ্তাহ পরেই ঘটলো ঘটনাটা। একদিন রাতে সবাই বিছানায় যাবার ঠিক আগে হাউস প্রিফেক্ট সবাইকে টিভি রুমে ডেকে পাঠালো। জুনিয়াররা কেউই কিছু জানে বলে মনে হলো না। সিনিয়ারদেরকে গম্ভীর মনে হলো। তারা হয়তো কিছু জানে। টিভি রুমে সারি বেঁধে বেঞ্চ আছে। সেখানে সবাইকে বসতে বলা হলো। জুনিয়ররা সামনে, সিনিয়ররা পেছনে। হাউসের প্রিফেক্টরা সবাই দাঁড়ালো দেয়াল ঘেষে, সবার মুখোমুখি। কয়েকজন ক্লাশ টুয়েলভের ছেলে লাবলু এবং শিবলীকে ঠেলতে ঠেলতে ভেতরে এনে ঢোকালো। তাদেরকে দেখেই বোঝা গেলো কিছু মার-টার খেয়েছে। চোখ-মুখ ফুলে আছে। সদর দরজাটা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়া হলো। টিভি রুমে পিন পতন নিস্তব্ধতা।

হাউস প্রিফেক্ট মুস্তফা ভাই কলেজের ডিবেট টিমের প্রতিনিধি। চমৎকার কণ্ঠস্বর। সে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা দিলো, "ক্যাডেটরা, আমরা আজ এখানে জমায়েত হয়েছি কারণ আমাদের দু'জন সহপাঠির সবার কাছে কিছু বলার আছে। লাবলু এবং শিবলীকে তোমরা অনেকেই চেনো। বেশ কিছুদিন ধরেই তারা জুনিয়র ছেলেদেরকে নানানভাবে উত্ত্যক্ত করছে। আমরা তাদেরকে হাতে নাতে ধরেছি এবার।"

পরবর্তি আধা ঘন্টায় যা জানা গেলো তাতে আলীর হাত পা ঠান্ডা হয়ে এলো। লাবলু এবং শিবলী বেশ কয়েকজন জুনিয়র ছেলেকে শুধু প্রেমপত্র লিখেছে তাই নয় তারা নাকি ছেলেরা ঘুমিয়ে যাবার পর তাদের বিছানায় গিয়ে তাদেরকে ছোঁয়। যে ছেলেটি তাদেরকে হাতে নাতে ধরে ফেলে এগিয়ে এসেছে সে আর কেউ নয়, তাদের সগীর। সগীর সবার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপা কণ্ঠে বর্ণনা করলো কিভাবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় তার এবং সে তার বিছানায় শিবলীকে তার পাশে ঘনিষ্টভাবে শুয়ে থাকতে দেখে।

লাবলু এবং শিবলীকে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হলো। তারা বাধ্য ছেলের মতো কথামত কাজ করলো। প্রতিজ্ঞা করলো আর কখন এসব করবে না। এই পর্যায়ে হঠাৎ বাইরে তুমুল হৈ হট্টগোল শোনা গেলো। তাদের দু'জনার বেশ কিছু ঘনিষ্ট বন্ধু আছে যারা অন্য হাউসে থাকে। তারা খবর পেয়ে জোট পাকিয়ে এসেছে দু'জনকে রক্ষা করতে। আমাদের ক্লাশ টুয়েলভের কয়েকজন বাইরে পাহারা দিচ্ছিলো। তাদেরকে মারধোর করে দরজায় লাথি দিয়ে ছিটকিনি ভেঙে ফেলে হুড়মুড় করে পনেরো বিশজনের দলটা ভেতরে ঢুকলো। আলী এদেরকে দেখেছে কিন্তু অধিকাংশের নামই তার খেয়াল নেই। টিভি রুমে দুই দলে হাতাহাতি হয় কিছুক্ষণ। আলী দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ে।

কামরায় ফিরে এসে সারারাত ঘুমাতে পারে না আলী। এমন কিছু যে ঘটতে পারে সে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। সগীর তার এমন ঘনিষ্ট বন্ধু, কিন্তু এই ঘটনার কথা সে কিছুই বলেনি তাকে।

সগীরকে সে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত করলো না। আলীকে সবাই একটু ভাবুক বলে জানে। হয়তো অকারনে ভয় পাইয়ে দিতে চায়নি। পরদিন মিঠু ওকে বললো, "ওদের দুইজনকে মনে হয় বের করে দেবে। প্রিন্সিপালের কানে গেছে।"

"বের করে দেয়াই উচিৎ।" আলী মৃদু কণ্ঠে বলে। "এইসব জঘন্য কাজ করে। আমার এখন রাতে ভয় করে।"

মিঠু হেসে ফেলে। "তোর ভয় পাবার কিছু নেই। তোর ভাব দেখলে ওরা তোর ছায়াও মাড়াবে না। যেমন গম্ভীর হয়ে থাকিস। এটা ভালো। ওদের মতো অনেক হারামী আছে এখানে।"

কয়েকদিন পরেই জানা গেলো দুই সমকামী বন্ধুকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে সমস্যার যে সমাধান হলো না সেটা সবাই মোটামুটি জানে। মিঠু কয়েকজনের ব্যাপারে তাকে সতর্কও করে দিয়েছে। তাদেরকে সবাই 'আলুখোর' বলে।

ক'দিন পর একটা অদ্ভুৎ ঘটনা ঘটলো। নিশির চিঠি পেলো আলী। রুবী একটা চিঠি লিখলে সে আদৌ অবাক হতো না। কিন্তু আট-নয় বছরের একটা মেয়ে তাকে তিন পাতার বিশাল একটা চিঠি লিখবে এটা তার মনে কখনো আসেই নি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নিশি এতো সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছে যে মনেই হয় না তার বয়স এতো অল্প। চিঠিখানা পড়ে হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না। সম্পূর্ণ চিঠিতে রুবীর সম্বন্ধে নানান ধরনের কথা লেখা। কিভাবে রুবী একই সাথে কম করে হলেও অর্ধ ডজন ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। নিশি লিখেছে আলীর মতো ভালো ছেলের উচিৎ নয় রুবীর সাথে মেশা। সে অনেক কষ্ট পাবে ভবিষ্যতে। রুবী একদিন অনেক বড়লোক একটা ছেলেকে বিয়ে করবে। কারণ সে সুন্দর এবং চালাক। আলী সহজ সরল ও বোকা। আলীর কোন চান্স নেই।

আলী চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কেউ দেখে ফেললে অযথা কথা উঠবে। মিঠুকেও সে কিছু বলে না। নিশিকে সে কোন ঝামেলায় ফেলতে চায় না। রুবীকে লেখা কবিতাটা নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক ঝামেলা হয়েছে। আর নয়। মিঠু অবশ্য ওকে রুবীর চিঠি দেখালো। অনেক কথা লিখেছে রুবী। ছেলেরা উত্ত্যক্ত করছে ওকে। স্কুলে যাবার পথে দাঁড়িয়ে থাকে। পাগলা কিনুর বোনকে বলে দেবার পর কিনু এসে একটাকে ধরে ধোলাই দিয়েছে। সেই ছেলের বড় ভাই এসে আবার কিনুকে

পিটিয়েছে। পরে বড়দের মধ্যেও ঝামেলা হয়েছে। রুবী বেশ কিছুদিন স্কুলে যায়নি। চিঠিতে আলীর কথাও জিজ্ঞেস করেছে। খারাপ ব্যবহার করেছিলো বলে মন খারাপ করেছে। দেখা হলে ওর হয়ে মাফ চাইতে বলেছে। যে চিঠি নিয়ে এতো গোলমাল সেটার কথা কিছু উল্লেখ করে নি।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলো আলী। ও আর রুবী খুব সুন্দর একটা জায়গায় গেছে, চারদিকে ফুলের সমারোহ, রুবী ওর শরীর ঘেষে দাঁড়িয়ে। রুবীর শরীরের মিষ্টি গন্ধে চারদিক ভরে গেছে, কেমন এক অদ্ভুৎ আবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলছে আলীকে, তার মন এবং শরীর ছমছম করছে অচেনা ভালো লাগায়। হঠাৎ করে গরম কিছু একটার ছোঁয়া পেতে তড়াক করে লাফিয়ে বসে পড়লো ও। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো ওর লিঙ্গ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে, ধক ধক করছে বুকের মধ্যে, প্যান্টের মাঝামাঝি ভেজা, চ্যাটচেটে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে সে। বীর্য স্খলন এটাই তার প্রথম নয়, কিন্তু এমন গভীর অনুভূতি এর আগে কখনো হয় নি। তরলীয় অনুভূতিটা ভালো না লাগলেও বিছানায় চুপচাপ শুয়ে অনেকক্ষন রুবীর কথা ভাবলো। বাথরুমে গিয়ে বীর্যটা ধুয়ে ফেলা দরকার । কিন্তু সকাল হতে এখনও বেশ বাকী। দরজা খুলে উম্মুক্ত করিডোর ধরে হেঁটে বাথরুমে যেতে হয়। যাবে কি যাবে না নিয়ে কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ারই সিদ্ধান্ত নিলো। শুকিয়ে যাবে। সগীরের ঘটনা শোনার পর তার ভয় ধরে গেছে।

সেমিষ্টারের শেষ দিকে আরেকটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠলো। ক্লাশ নাইনের সাথে ওদের ব্যাচের বেশ গোলমাল শুরু হলো। তেমন কোন কারণ নেই। ছোট খাটো ব্যাপার নিয়ে। দুই ক্লাশেই বেয়াড়া ছেলেরা আছে। অকারনে উষ্ণতার সৃষ্টি করে। আলীদের হাউসে অধিকাংশ সিনিয়ররাই বেশ ভালো কিন্তু তার মধ্যে দুই-তিনজন ঝামেলা বাঁধাতে ওস্তাদ। ক্লাশ নাইনের এমন কয়েকজনের মধ্যে ছিলো মাজাহার আর আরিফ। পড়াশুনায় মধ্যম মানের। এদের কাজই হচ্ছে জুনিয়রদেরকে উত্ত্যক্ত করা। যেসব ব্যাপার সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায় তারা সেগুলো নিয়েই হৈ চৈ করে তুমুল কান্ড করে। বাকেরের সাথে তাদের প্রায়ই গোলমাল লাগে। বাকের ক্লাশ এইটে পড়লেও সে বয়সে দুই-তিন বছরের বড় হবেই। ক্লাশের অন্যদের চেয়ে তার শরীর অনেক পেশীবহুল। অনেক ক্ষেত্রেই সে মাজাহার এবং আরিফের কথাবার্তা শোনে না। কিছু করতে বললে এড়িয়ে যায়। বাকেরের সাথে আলীদের কয়েকজনের খাতির বেশী থাকায় তারাও অনাকাংখিতদের তালিকায়।

একদিন ব্যাপারটা বেশ খারাপের দিকেই গড়ালো। ঠিক কি নিয়ে ঝামেলা হয়েছিলো আলী জানে না, সে রুমে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিলো। প্রতি সপ্তাহে বেশ কয়েকটা নিয়ে আসে, গোগ্রাসে গিলে ফেরত দিয়ে আবার নতুন কতকগুলো নিয়ে আসে। প্রচুর ইংরেজী কিশোর সাহিত্যের বই। লাইব্রেরিতে গেলে তার পাগল হবার দশা হয়। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে?

হঠাৎ বাইরে বেশ একটা হৈ হট্টগোল শোনা যাওয়ায় সে কৌতুহলী হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। যা দেখলো সেটা খুব একটা স্বাভাবিক দৃশ্য নয়। ইমন খালি পায়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, আঙুলের উপর ভর দিয়ে, তালু উঁচিয়ে, তার পায়ের তালুর নীচে দুটা পিন রাখা। কোন কারণে ক্লান্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলেই পায়ে ফুটে যাবে। এক ইঞ্চি লম্বা পিন। পায়ে ঢুকলে যন্ত্রনার ব্যাপার হবে। ইমন কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে না জানলেও এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে বেশীক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে

পারবে না। তার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে পাহারা দিচ্ছে মাজাহার এবং আরিফ। ক্লাশ এইটের বেশ কয়েকজন ছেলে নিকটেই জোট পাকিয়েছে। সেখানে জিকু, বাকের, সজীব এবং নকিবও আছে। সব মিলিয়ে আট-দশ জনের মতো। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে রফি। খুলনার ছেলে। হ্যাংলা-পাতলা, ভদ্র স্বভাব, সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু তার মধ্যে একটা চাঁপা শক্তি আছে। ঝট করে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, শুধুমাত্র কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হলেই তা বেরিয়ে আসে। সে যোগ ব্যায়াম করে, দার্শনিকের মতো কথা বলে, ফুটবলে লাথি দিতে গেলে ধপাস করে পড়ে যায়। কিন্তু তারপরও তার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতরে সেই দারুণ শক্তিমত্তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। গান্ধীর মত। আলী এর আগে এমন কাউকে দেখেনি। তার বয়সী কাউকে তো নয়ই। রফির কণ্ঠস্বর বেশ উঁচু। সে গলা আরোও চড়িয়ে বললো, "ক্লাশ এইটের সবাই বাইরে আসো। আমরা হাউস প্রিফেক্টকে বলবো এটা বন্ধ করতে।"

মাজাহার এবং আরিফ চীৎকার করে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে বলছে। কেউ কানে নিলো না। ক্লাশ এইটের সবাই একে একে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। ক্লাশ নাইনের অনেকও বেরিয়ে এলো। মাজাহার এবং আরিফকে তাদের বন্ধুদের সবাই বিশেষ পছন্দ করে না। কিন্তু দলছুট হয়ে তাদেরকে মানাও করতে পারছে না। দুই ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হলো। বাকের বক্সিং খেলে। সে ক্ষেপে যাচ্ছে দেখে রফি তাকে থামালো। "আমরা মারপিট করতে চাই না। এই শাস্তি গ্রহনযোগ্য নয়। এটা অমানবিক। অন্য কোন শাস্তি দেয়া হোক।"

মাজাহার চীৎকার করে বললো, " ভেতরে যাও সবাই। নইলে এডজুটেন্টকে ডেকে সব কটাকে কলেজ থেকে বের করে দেবো।"

আরিফও তার সাথে গলা মেলালো।

ক্লাশ এইটের কয়েকজন হৈ চৈ করে উঠলো।

গোলমাল শুনে মুস্তফা ভাই উঠে এলো। ক্লাশ এইটের সবাইকে নিজ নিজ রুমে পাঠিয়ে দিলো সে। একটু পরে ইমনও ছাড়া পেলো। মাজাহার এবং আরিফ তার সাথে নীচে তার কামরায় গেলো। এরপর কয়েকটা দিন তারা বেশ ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করলো। মুস্তফা ভাইয়ের হাতে দু-একটা চড় থাপ্পড় খেয়েছিলো কিনা আলী জানে না। কিন্তু সেই সেমিস্টারে তারা আর কোন ঝামেলা করে নি।

খুলনায় ফিরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো আলী। বানুকে আগের চেয়ে উজ্জল দেখায়, প্রাণবন্ত লাগে। সে ছুটিতে বাড়ী এলে মা যে খুশী হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এবারের খুশী স্বাভাবিকের মতো নয়। কোথাও কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে। ঝট করে ধরতে পারে না ও। কিন্তু মাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। মাথার মধ্যে আবোল তাবোল চিন্তা বয়ে যায়। করো সাথে বানুর ঘনিষ্টতা হয়েছে কি? হলেও অবাক হবার কিছু নেই। সুন্দরী, অল্প বয়স্ক বানু এখনও অনেক যুবকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

দুই তিন দিন চুপচাপ পেরিয়ে যায়। ছুটিতে বাড়ী আসার পর কয়েকদিন বাসায় থাকে আলী। মায়ের সাথে সময় কাটায়। মায়ের গত মাসগুলো কেমন কেটেছে তাই নিয়ে খুচরা আলাপ করে। বানু রান্নাবান্না করে, সে মন ভরে খায়। ক্যাডেট কলেজের খাওয়া মন্দ নয় কিন্তু তারপরও মায়ের হাতের মজার রান্নার সাথে কি কোন কিছুর তুলনা হয়।

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকালে উঠে নাস্তাপর্ব সারা হতেই বানু বললো, "আজকে নিশি আসবে।"

আলী একটু অবাকই হয়। নিশির কথা এই প্রথম উঠলো। এবার ফিরে আসা অবদি সে রুবীদেরকে নিয়ে কোন প্রসঙ্গ তোলেনি। রুবীর সম্বন্ধে নিশি যেসব কথা লিখেছিলো তার কতখানি সত্য কে জানে। তার অবশ্য খুব একটা বিশ্বাস হয় নি। নিশি একটু হিংসুটে।

"কেন?" সংক্ষেপে জানতে চায় আলী। নতুন করে কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

"আমার কাছে সেলাই শেখে।" বানুকে খুশী খুশী লাগে।

"কবে থেকে?"

"তোরা ক্যাডেট কলেজে চলে যাবার পর থেকেই।"

"ওর বাবা-মা জানে?"

"জানবে না কেন? ওর মা এসেছিলো। মহিলাতো খুবই ভালো। খুটিয়ে খুটিয়ে আমার হাতের কাজ দেখলো। নিশি নাকি খুব স্পর্শকাতর। মেয়েটাকে নিয়ে খুব চিন্তা তার। আমি বললাম আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেলাই শিখাবো। রাজী হয়ে গেলেন।"

মায়ের পরিবর্তনের কারণটা খানিকটা পরিষ্কার হলো। আলী চলে যাবার পর বানু একরকম নিঃসঙ্গই থাকতো। নিশি আসায় তার জীবনের সেই শূন্যতাটুকু পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। সমমনা একটি মেয়ের মাতৃময় ভূমিকা পালন করবার সুযোগ পেয়ে নতুন প্রেরণা পেয়েছে বানু। তার কোন মেয়ে নেই। তার সেই অভাব পূরণ হয়েছে। আলী একটু হিংসা বোধ করে। সব কিছুতেই ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ নিশি। রুবীর সাথে গ্যাঞ্জাম করিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, এখন মায়ের মন কেড়ে নিয়ে আলীর ভালোবাসায় পর্যন্ত ভাগ বসিয়ে দিয়েছে।

নিশি ওকে দেখে কঠিন দৃষ্টি হানলো। বানুর নজর এড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে জানতে চাইলো," চিঠি পেয়েছিলেন?"

মাথা নাড়ে আলী। 'হ্যাঁ'

"উত্তর দেননি কেন?"

"সময় পাই নি।" এড়িয়ে যায় আলী। রুবী এক দিকে ত্যাড়া, এই মেয়েটি অন্য দিকে। দুই বোনের কথাকেই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায় না। কখন যে কি পরিকল্পনা ঘুরছে ওদের মাথায় কে জানে। সাবধান থাকাই ভালো।

"একাই এসেছো?"

"না। লাবলু ভাই নামিয়ে দিয়ে গেলো।"

"লাবলু কে?"

"রুবী আপার বন্ধু। বয়সে অনেক বড়। কিন্তু অনেক টাকা। নতুন মটরসাইকেল। চিঠিতে লিখেছিলাম।"

"মটর সাইকেলের কথা কিছু লেখনি।"

"কেন হিংসা হচ্ছে?"

"যাও, মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"যাচ্ছি। রুবী আপার পেছনে ঘুরে কোন লাভ নেই। বেশী তেড়িবেড়ি করলে লাবলু ভাই ধরে এয়সা পিটান দেবে....." সে কথা শেষ না করে ভেতরের ঘরে চলে যায়। বানু খুবই নিবেদিত প্রাণ শিক্ষিকা। মেঝেতে মাদুর পেতে সেলাইয়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে অপেক্ষা করছিলো, নিশিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

আলী বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি ঘোরে। পরে যায় বই ভাড়া করে আনতে। মাসুদ রানার কয়েকটি বই সংগে করে ফিরছিলো পথে দেখা হয়ে গেলো রফি এবং রিপনের সাথে। দু'জনাই ওর সাথে ক্যাডেট কলেজে পড়ে। একই হাউসে। গত সেমিষ্টারেই দু'জনার সাথে আলীর খানিকটা ঘনিষ্টতা হয়েছে। তারা অবশ্য অনেক দিনের বন্ধু। একই সাথে স্কুলে পড়েছে। রফি দৃঢ়মনা, রিপন দিলখোলা। ওকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠলো রিপন। "চল, বাসায় চল। আমার ঘরে বসে খুব আড্ডা দেবো।"

আপত্তি করবার সুযোগ মেলে না। ওরা একরকম ধরেই নিয়ে যায় তাকে। রিপনের পরিবার বেশ খ্যাতিমান এই এলাকায়। তার বাবা ডাক্তার। এলাকায় বহুল পরিচিত। তার ছয়টি ছেলে। রিপন ছোট। বড় ছেলেগুলির যথেষ্ট দাপট আছে শহরে। সবাই অল্প বিস্তর সমঝে চলে। রিপনের বাবা মেজাজী মানুষ। ওদেরকে দেখে অকারণে ধমকে উঠলেন, ফাও ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? যাও, বাসায় গিয়ে পড়াশুনা কর।"

রিপন অম্লান বদনে বলে, "এইতো বাবা, পড়বো। বই পত্র দেখছো না।"

"বোকা পেয়েছো আমাকে। মাসুদ রানা আমি চিনি না। সব পড়া আছে আমার। কি নাম তোমার?" প্রশ্নটা আলীকে লক্ষ্য করে করা।

আলী ভড়কে গেলো তবে নামটা বলতে পারলো। রিপনের বাবা কড়া দৃষ্টিতে ওকে জরীপ করে নিয়ে বললেন, "মাসুদ রানা পড়ার বয়স হয়েছে তোমাদের এখনো? বনহুর পড়বে। কুয়াশা সিরিজ।"

রিপন হাত ধরে টেনে সরিয়ে ফেলে ওকে। ফিসফিসিয়ে বলে, "ভয় পাস না। বাবা একটু মজা করে। আমার বন্ধুরা তাকে দেখলেই উল্টো ঘুরে দৌড় দেয়।"

রিপনের ঘরটা খুবই অগোছালো। বিছানা-পত্র, জামা-কাপড় সব এদিক সেদিক। তার মধ্যেই চেয়ারে বসলো আলী। রিপন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। রফি একপাশে পা ঝুলিয়ে বসলো। রিপনের মা অসম্ভব ভালো মানুষ। দশ মিনিটের মধ্যে কাজের ছেলেটাকে দিয়ে অনেক খাবার-দাবার পাঠিয়ে দিলেন। মিষ্টি, বিস্কুট, চা। মিঠুর বাসাতেও এইরকম আপ্যায়ন পায় না আলী।

কথায় কথায় এই সমাবেশের একটা বিশেষ কারণ জানা গেলো। রফি এবং রিপনের কানে এসেছে জনৈক ছেলে সবাইকে নাকি বলে বেড়াচ্ছে সে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র। এই রকম ভূয়ামী সহ্য করাটা সত্যিকারের কোন ক্যাডেটের পক্ষে কি সম্ভব? আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ছেলেটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রিপনের ঘরে এনে একটু ধোলাই দেয়া হবে। আলী জীবনে কারো শরীরে হাত তোলেনি। সে হু-হাঁ করে গেলো। ধোলাই যা দেবার রিপনই দেবে। আলী শুধু সাথে থাকবে।

আলাপের মাঝেই রিপনের খালাতো ভাই মনি এসে হাজির হলো। মনির কথা রিপনের মুখে দু'একবার শুনে থাকবে আলী কিন্তু কখনো দেখেনি। না দেখলেই ভালো ছিলো। কারণ মনি একটা ঝড় বিশেষ। সে ভেতরে ঢুকেই হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ তুলে নানান গল্প বলতে শুরু করলো। কবে কাকে মেরেছে, কাকে শাষিয়েছে, কোন মেয়ের সাথে প্রেম করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করে তার প্রিয় বিষয় দেখা গেলো- পুলিশ পেটানো এবং মেয়েদের শরীর নিয়ে আলাপ করা। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আলীর জানা হয়ে গেলো সে ইতিমধ্যেই কত পুলিশের হাত-পা ভেঙেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর কত মেয়ের সাথে যে শুয়েছে সে হিসাব কে রাখে? মেয়েরা তাকে দেখলেই পায়জামা খুলে দাঁড়িয়ে যায়। সে একা আর কতজনকে সামলাবে। সে রসিয়ে রসিয়ে বললো কিভাবে তার প্রতিবেশীর বারো বছরের সুন্দরী মেয়েটাকে সে একা পেয়ে কোন কিছুই করতে বাকী রাখেনি ইত্যাদি ইত্যাদি। আলী তার কথায় বিন্দু-মাত্রও বিশ্বাস না করলেও মনে মনে আনন্দ পেলো। তার বিশেষ বস্তুটি দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে দেখে মনে মনে খানিকটা অস্বঃস্তিও বোধ করে। পাপ-টাপ হবে না তো? এমন পচা কথা শুনছে? ফেরার আগে ঠিক হলো পরদিন দুপুরে আবার রিপনের বাসায় মিলিত হবে ওরা।

বাসায় ফিরে দেখলো বাসার সামনে ঝকঝকে নতুন একটা মটর সাইকেল দাঁড়ানো। দরজা ভেড়ানো ছিলো। ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রুবীর মুখোমুখি পড়ে গেলো। তার পাশেই ঊনিশ বিশ বছরের একটা সুদর্শন ছেলে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় লাবলু ভাই।

"কেমন আছো আলী?" রুবী হাসিমুখে জানতে চাইলো। "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। মিঠুর ওখানে গিয়েছিলে?"

আলীর বুকের ভেতরটা জ্বলছে। পাগলার সাথে তবুও না হয় প্রতিযোগীতা চলে। মিঠুকেও হয়তো যাদু বলে পরাজিত করা সম্ভব, কিন্তু এই লাবলু ভাইকে কোনভাবেই হারানো যাবে না। তার কোন দিকেই কোন কমতি নেই। কিন্তু রুবী এতো কম বয়সী একটা মেয়ে কেন একটা যুবকের সাথে ঘুরবে? রুবী কিছু একটা নিয়ে খিল খিল করে হাসছে। আলী কিছুই শোনেনি। তার কান-টান লাল হয়ে উঠেছে।

নিশি ক্ষতে লবন দেবার জন্য বললো। "লাবলু ভাই। আলী ভাইকে আপনার মটর সাইকেলে একটু চড়াবেন?"

"না, আমি চড়তে চাই না ।" বিরক্ত কণ্ঠে ধমকেই ওঠে আলী ।

"একদিন আমরা সবাই মিলে কোথাও বেড়াতে যাবো ।" রুবী বললো । "মিঠুকে্ও বলবো । লাবলু ভাই আমাদের দুঃসম্পর্কের ভাই হয় ।

আলীর রাগই হয় । এসব তার কাছে আর ভালো লাগে না ।

তারা লে যেতে নিশির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে বানু । আলী কিছু বলে না । মায়ের সময় যে ভালো কাটছে তাতেই সে খুশি । রুবী অথবা নিশি কাউকে নিয়েই সে আর ভাবতে চায় না । নিশির ভাব-সাবও তার কাছে পরিস্কার হয় না । মাত্র নয় বছরের একটা মেয়ে তার কাছে কি চায়? রুবীই তাকে অকালে পাকিয়ে দিয়েছে ।

১৪

পরদিন ভূয়া ক্যাডেটকে ধোলাই দিতে গিয়ে বিরাট গোলমাল পাকিয়ে গেলো । সব প্ল্যান মোতাবেকই এগুচ্ছিলো । রিপনকে ছেলেটা মনে হয় অল্প বিস্তর চিনতো । সে তাকে কোন কিছুর লোভ দেখিয়ে নিজের কামরায় এনে ঢোকালো । সামান্য জেরাতেই ভুয়া ক্যাডেট চোখের জল নাকের জল এক করে স্বীকার করলো সে ক্যাডেট নয় তবে প্রি-ক্যাডেট স্কুলে গিয়েছে । রিপন তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে বললো, "আর কখন করবি? ক্যাডেটদের ইজ্জত নষ্ট করছিস তুই ।"

ভুয়া ক্যাডেট রিপনের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য নিজের নাম পাল্টাতেও রাজী । তার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা । সমস্যা পাকিয়ে গেলো যখন ঘুরতে ঘুরতে মনি এসে জোট পাকালো । তার সম্ভবত কাজ কর্মের অভাব । ঘটনা শুনেই সে ভুয়া ক্যাডেটের পেটে ধাই করে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলো । ছেলেটা ঠাস করে মেঝেতে পড়ে গেলো, দুই হাতে পেট চেপে ধরেছে, তার মুখ নীল । শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে বলে মনে হচ্ছে না । রিপন ভয় পেয়ে গেলো । মরেটরে গেলে ফাঁসির কেসে পড়ে যাবে । এরপর আধা ঘন্টা ধরে চললো পরিচর্যা । রিপনের বড় ভাইদের দু'জন ঘটনা শুনে চলে এলো । তাদের হাতে ভয়াবহ ধমক খেতে হলো ।

দু'দিন বাদে মিঠুর সাথে দেখা হতে সে হাসলো । "আর কাজ পাস না । পাগলা রিপনের সাথে জোট পাকিয়ে ছিস?"

"রিপনের কোন দোষ নেই । মনি এসেই গোলমাল পাকিয়ে দিলো ।"

"সে কিন্তু পাগলের ওস্তাদ । সাবধান থাকিস । পারত পক্ষে ওর কাছে না ঘেষলেই ভালো । তুই যে গাধা । দেখা যাবে পুলিশী ঝামেলায় পড়ে গেছিস ।"

"ওর তো গল্পের শেষ নাই। কতটুকু সত্যি?"

"কিছু তো সত্যি হবেই। ওর গুষ্টিতে অর্ধেকই মস্তান। ওর বোন গুলাও মস্তান।"

হেসে ফেলে আলী। " আর যে মেয়ে টেয়ে নিয়ে অনেক গাল গল্প করে, সেগুলো?"

"তোর কি মনে হয়? কোন মেয়ে ওর কাছে আসবে? বাদ দে ওর কথা। লাবলু ভাইকে কেমন দেখলি? "

শ্রাগ করে আলী। "তোদের নাকি আত্মীয়?"

"আত্মীয় না ছাই। পাড়াতো ভাই। সবাই কথা তুলবে তাই আত্মীয় বলে চালিয়ে দিচ্ছে।"

মিঠুর বিরক্তি কান এড়ালো না আলীর। একটু অপরাধ বোধ হলেও ভেতরে ভেতরে অদ্ভুৎ একটা ভালো লাগার অনুভূতিও হলো। আলীকে কখন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি মিঠু। কিন্তু লাবলুর সাথে প্রতিযোগীতা করবার সাধ্য তার নেই। ফলে সে ইতিমধ্যেই পরাজয় মেনে নিয়েছে।

"তোর খালা-খালু কি বলেন?"

"রুবীর কথায় তারা ওঠেন বসেন। কি আর বলবেন? যাবি নাকি? "

"রুবীদের বাসায়?

"আর কোথায়? লাবলু ভাইয়ের জন্য তাকে তো পাওয়াই যায় না। "

যেতে ইচ্ছে হয় আলীর। রুবীর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি দেখলেই তার শত উষ্মা ঝরে যায়। সে যেন এক অপূর্ব প্রকৃতির দৃশ্যের মতো। কোন কিছুতেই সেই দৃশ্যে কালিমা মাখানো যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না যাবারই সিদ্ধান্ত নেয় আলী। নিজেকে বার বার ছোট করতে তার আর ইচ্ছা হয় না। রুবীর কাছে যতখানি নয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষুদে মেয়েটার কাছে। বাসায় গেলেই দেখা যাবে সে কটমট করে তাকিয়ে আছে। পরে হয়তো মায়ের কানেও কিছু একটা লাগিয়ে দেবে। ভালোই বিপদে পড়া গেছে।

পরের সপ্তাহে রুবীদের সারা পরিবার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে চলে গেলো। নিশির মনে হয় যাবার ইচ্ছা ছিলো না। সে বানুর কাছে খুব মন খারাপ করলো। গ্রামের বাড়ীতে তার ভালো লাগে না। কিছু করার নেই। আলী নিশির মুখোমুখি পড়তে চায়নি। নিশির অগোচরে বেরিয়ে পড়েছিলো। কয়েকটা বই ফেরত দেবারও দরকার ছিলো। ফিরতে ঘন্টা দুয়েক লাগলো।

"নিশি তোর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলো।" বানু বললো।

"কেন?"

"জানি না। মেয়েটার মায়া খুব। হয়তো কিছু একটা বলতো। তুই কলেজে যাবার আগে তো আর দেখা হবে না।"

সেটা আন্দাজ করেছে আলী। কেন যেন একটু খারাপই লাগলো। রুবীকে দেখতে পাবে না, শুধু সেই জন্যেই নয়, নিশির জন্যেও তার খানিকটা মায়া পড়ে গেছে। বোঝাই যায় আলীর জন্য তার একটা কোমলতা আছে।

রাতে বিছানায় শুতে গিয়ে জিনিষটা আবিষ্কার করে আলী। একটা সাদা রুমাল তার বালিশের নীচে সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা। ভাঁজ খুলতে লাল সুতায় সেলাই করা লেখাটা জ্বলজ্বল করে ওঠে।

"আমায় ভুলো না।" নিশি।

আলী হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না। নিশির কি মাথায় গোলমাল আছে? মাত্র নয় বছরের একটা মেয়ে এই সবের কিইবা বোঝে। রুবীই তার মাথাটা খেয়েছে। রুমালটা নিয়ে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে আলী। কি করবে বুঝতে পারে না। বানুকে দেখাতে চায় না। সে হয়তো মনে কষ্ট পাবে। পরিশেষে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে। কলেজে গিয়ে ফেলে দিলেই হবে। নিশি সাহস করে কখনো জিজ্ঞেস করবে বলে মনে হয় না। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

বশীর দৈনন্দিন কাজ কর্মে ভুল ভ্রান্তি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না কিন্তু কোথাও দল বেঁধে বেড়াতে গেলে তখন পান থেকে চুন খসলেও তার চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। পরদিন সকালে দশটার মধ্যে সবার রাস্তায় নামার কথা। কাগজে কলমে প্ল্যান করে এসেছে বশীর, প্রিন্ট করে সবার হাতে একটা করে শেডিউল পর্যন্ত গছিয়ে দিয়েছে। তারপরও যখন সকাল গড়িয়ে চললো অথচ কেউ প্রস্তুত হচ্ছে না, তখন মেজাজ বাস্তবিকই খিঁচড়ে গেলো। সে কতক্ষণ লতার উপর অকারণে বকাবকি করলো, পরে গলা চড়িয়ে যে সব ভাবীরা তখনও বিছানা ছাড়েনি তাদেরকেও দু'কথা শুনিয়ে দিলো। বেড়াতে বের হয়ে এতো নবাবগিরি করলে চলে? সব মহারাণীর দল। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বশীরের কাজ কারবার কারো জানতে বাকী নেই। এলগনকুইন পার্ক কি পালিয়ে যাচ্ছে?

বের হতে হতে বারোটা বাজলো। আগের দিনের বেঁচে যাওয়া বিরিয়ানী আর কাবাব দিয়ে কোনরকমে নাস্তা সারা হলো। কষ্ট করে খাবারগুলো রেঁধে আনা হয়েছে। নষ্ট করে তো লাভ নেই। আলী সকালে সাধারণত খায় না। একেবারে লাঞ্চ করে। অভ্যেস হয়ে গেছে। নিশি অবশ্য বেশ তারিয়ে তারিয়ে কাবাব খেলো। এমন চমৎকার কাবাব নাকি সে বহুদিন খায়নি। সব কৃতিত্ব আসলাম ভাইয়ার। কাবাব তার বানানো।

এক রকম ধমকে সবাইকে গাড়ীতে ওঠালো বশীর। তার পরিকল্পনা মোতাবেক কোন কিছুই করা যাচ্ছে না, সেটা তার ভালো লাগছে না। বেড়াতে বেরিয়ে এতো খাওয়া-দাওয়া, সৌখিনতা সাজে? সবাই তাকে নিয়ে হাসছে দেখে সে আরোও বিরক্ত হচ্ছে। আলী তার গাড়ীতে একাই সওয়ার হয়েছে। মনে মনে আশা করেছিলো নিশি হয়তো মেয়েকে নিয়ে তার সাথে আসবে। বাস্তবে নিশি সে ব্যাপারে কোন

আগ্রহই দেখালো না। তার মামা-মামী বোধহয় কোন ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন। সে তাদেরকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে তাদের গাড়ীতেই চেপে বসলো। মেয়েটাকে বোঝা কষ্ট। এক পা এগোয় তো দুই পা পিছায়।

তাদের আজকের গন্তব্য এলগনকুইন পার্ক ভিসিটর সেন্টার। কানাডার সবচেয়ে পুরাতন প্রভিনশিয়াল পার্ক, আকারে প্রায় ৮হাজার বর্গ কিলোমিটার। একদিকে জর্জিয়ান বে আর অন্যদিকে অটোয়া রিভার। টরোন্টো থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ হওয়ায় পার্কটা খুবই জনপ্রিয়। পার্কটির অধিকাংশ এলাকাই জংলী, রাস্তাঘাট নেই। উত্তরে ট্রান্স-কানাডা হাইওয়ে , দক্ষিণে হাইওয়ে ৬০। প্রায় আড়াই হাজার নানান আকারের হ্রদ আর স্রোতস্বিনী রয়েছে পার্কটার মধ্যে। বহু মানুষজন গ্রীষ্মকালে এখানে ক্যাম্পিং করতে চলে আসে। ভিসিটর সেন্টারটা হাইওয়ে ৬০ এর উপর অবস্থিত। কিলোমিটার ৪৩এ। যারা শুধুমাত্র বেড়াতে আসে তারা ভিসিটর সেন্টারেই থামে। এখানে বেশ কিছু ট্রেইলও আছে। বশীর ট্রেইলে উঠতে পছন্দ করে। সে বেছে বেছে পাহাড়ী পথ গুলোই নেয়। তার ভয়াবহ উচ্চতাভীতি আছে তবুও উঁচুর দিকেই তার চোখ। উপরে উঠে অবশ্য হাত পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। সেটাও সবার হাসির খোরাক যোগায়।

সবাই লাইন দিয়ে রাস্তায় নামলো ওরা। সবার আগে স্বাভাবিকভাবেই বশীর। হাইওয়ে ৬০ ধরে কিছুদুর যেতেই রাস্তা ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। দু'পাশে অসংখ্য গাছ-গাছালি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট হ্রদ বা স্রোতস্বিনী ঝিলিক দিয়ে যায়, দৃশ্যের একঘেয়েমী ঘোচে। দেখা গেলো এদিকে এবার শরৎ একটু দ্রুতই চলে এসেছে। অধিকাংশ গাছেরই পাতা বিবর্ণ হলুদ হয়ে গেছে, অনেক পাতা ঝরেই পড়ে গেছে। একটু আশাহতই হলো ওরা। এলগনকুইনে সবাই আসে শরতের বাহারী পাতার রং দেখতে। এমন শুকনো চেহারা দেখতে হবে কে ভেবেছিলো? বোঝাই যাচ্ছে, তারা এক সপ্তাহ দেরী করে এসেছে। শরতের রং খুব স্পর্শকাতর। কয়েক দিনের ব্যবধানেই তার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য শুকিয়ে কাঠ-খোট্টা রূপ নিতে পারে। ভিসিটর সেন্টারে পৌঁছাতে খুব বেশীক্ষণ লাগলো না। সব মিলিয়ে হয়তো ঘন্টাখানেক। পাহাড়ী পটভূমিতে অনেকখানি স্থান নিয়ে অবস্থিত আধুনিক কায়দায় তৈরী দালান। মানুষজনে গমগম করছে। ভেতরে ওয়াশরুম, রেস্টুরেন্ট, লবি এবং সুপ্রশস্ত একটা বেলকনী রয়েছে। ভীড় ঠেলে সবাই সেই বেলকনীতেই গিয়ে জমায়েত হচ্ছে। কারণটা পরিষ্কার। এখানে দাঁড়িয়ে নীচের বিস্তীর্ণ মাঠের এবং দূরের জঙ্গলের দৃশ্যটা চোখে লেগে থাকার মতো। পটাপট ছবি তুলছে সাবই। কোথাও বাবা-মা-ছেলেমেয়েরা

দল বেঁধে, কোথাও প্রেমিক-প্রেমিকা জড়াজড়ি করে, কোথাও আবার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল ফোকলা দাঁতে মুখভর্তি হাসি নিয়ে।

আলী ছবি তুলতে খুব একটা পছন্দ করে না। তবে সে অন্যদের ছবি তুলে দিতে পছন্দ করে। কোন এক দিব্য বলে তাকে দেখলেই অচেনা মানুষেরা ক্যামেরা ধরিয়ে দেয়। আব্দার ধরে তাদের ছবি তুলে দেবার। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রথমে ধরলো বুড়ো বুড়ীদের একটা দল। পরে এক তরুণ দম্পতি। সেন্টারে ঢোকার সময় আলী লক্ষ্য করেছে দলের সবাই-আশে পাশেই আছে। বাচ্চা-কাচ্চা জড়ো করে ভেতরে ঢুকতে তাদের কিছুক্ষণ লাগবে। আলী ভেতরে ঢুকে একটা চক্কর মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিশি এবং টিসা মামার গাড়ীতে ছিলো। শুধু তাদেরকেই সে দেখেনি। মামা একটু ধীরে গাড়ী চালায়। চলে আসবে। এখানে রাস্তা বলতে এই একটাই। হারানোর কোন ভয় নেই।

ঘন্টা খানেক পর খুব ঘটা করে বাথরুম পর্ব এবং ছবি তোলার পর্ব সেরে বশীরের নেতৃত্বে আলীদের দলটা ভিসিটর সেন্টারের ঠিক বাইরেই বিশাল পাথুরে ঢালের উপর অবস্থান নিলো। সাথে খাবার দাবার কিছু নিয়ে আসা হয়েছে। সেগুলোই সাবাড় করা হলো। দলের বেশ কয়েকজন হালাল ছাড়া খান না। রেস্টুরেন্ট থাকলেও সেখানকার খাবার তারা ছোঁবেন না। ফলে অন্যরাও চেষ্টা করে দলছুট হয়ে রেস্টুরেন্টে না খেতে। মাছের কিছু থাকলে খাওয়া যায়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই দামটা বেশী পড়ে।

ছেলেরা আর মেয়েরা দু'ভাগ হয়ে গেলো। নিশি ভাবীদের সাথে দল বেঁধে ঘাসের উপর গোল হয়ে বসেছে। সবাই খুব হৈ চৈ করে গল্প করছে। পুরুষেরা অনতিদূরে বাচ্চাদের সাথে দল পাকিয়ে বসে আছে। বশীর একটু পর পরই সবাইকে তাড়া দিচ্ছে। সে ট্রেইলে যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে আছে। লুক আউট ট্রেইলটা নাকি খুবই সন্দুর। দেড় কিলোমিটারের মতো। পাহাড় বেয়ে এক দিক দিয়ে উঠে অন্যদিক দিয়ে নামা যায়। তার তর সইছে না। মহিলাদের দলটিকে সে ইতিমধ্যেই বার দুয়েক তাড়া দিয়ে এসেছে। তারা পাত্তাই দেয়নি।

ভিসিটর সেন্টার থেকে আরোও দশ মিনিটের ড্রাইভ লুক আউট পয়েন্ট ট্রেইলটা। বাচ্চারা সবাই উত্তেজিত। একসাথে হলেই তাদের আচার-আচরণ পাল্টে যায়। গাড়ীতে বন্ধুরা একসাথে বসবে। দেখা গেলো সমবয়েসী বাচ্চারা এক একটা গাড়ীতে গিয়ে জমায়েত হয়েছে। এরা সবাই ছোটবেলা থেকে একই সাথে বড় হচ্ছে। ঘনিষ্টতা অনেক বেশী। বড়রাও খুব একটা আপত্তি করে নি। বেড়াতে বের হয়ে একটু স্বাধীনতা না দিলে আনন্দ-পূর্ণ হয় না। ঘটনা চক্রে আলীর গাড়ীতে একদল ছেলে মেয়ে এসে ভীড়

করেছে। তার মধ্যে টিসাও আছে। আলী সবাইকে ভালো মতন না চিনলেও চেহারায় চেনে। ভিসিটর সেন্টার থেকে লুক আউট ট্রেইল পর্যন্ত সামান্য পথটুকুই তাদের কর্ণবিদারক চীৎকার-চেঁচামেচিতে মাথা ভনভন করে ঘুরছে আলীর। এইগুলো যে এমন বিচ্ছু তার জানা ছিলো না। এমনকি টিসাও তাদের দলে ভীড়ে গেছে।

হাইওয়ে ৬০ ঘেঁষে বেশ কিছু ট্রেইল আছে। কিছু দীর্ঘ, কিছু দুর্গম, কিছু মাঝামাঝি। অনেক দেখেশুনেই লুক আউট পয়েন্ট ট্রেইলটা বাছাই করেছে বশীর। মাত্র এক কিলোমিটার বা তার চেয়ে সামান্য বেশী দীর্ঘতায়, চড়াই এবং উৎড়াই মোটামুটি, একটু কষ্ট হলেও পড়ে টড়ে যাবার ভয় নেই। ট্রেইলের পাশে মাঝারি আকারের একটা পার্কিং এর জায়গা থাকলেও সেখানে স্থান পাওয়া গেলো না। শ'য়ে শ'য়ে মানুষের ভীড় এলাকাটিতে। রাস্তার দু'পাশ ঘেষে গাড়ি পার্ক করে হেঁটে ট্রেইলে উঠছে সবাই। আলীরাও বেশ দূরে পার্ক করলো।

বাচ্চারা ট্রেইলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদেরকে ধরে রাখাই সমস্যা। বশীর, আসলাম এবং মইনুল প্রায় একই সাথে পৌঁছেছিলো। তারা বাচ্চাদের দলটাকে নিয়ে এগিয়ে গেলো। আলী একটু পিছিয়ে থাকলো। নিশিরা এখনও আসেনি। টিসা তার গাড়ীতে ছিলো। নিশি জানে কিনা সে নিশ্চিত নয়। ভীড় ভাট্টার মধ্যে ঝট করে রওনা হয়েছিলো, খোঁজ নেবার কথা মনে হয় নি। টিসা ওকে কয়েকবার ডাকলো। "তুমি আসবে না, আংকেল?"

"তোমার মা কি জানে তুমি আমার সাথে এসেছো?" আলী তৃতীয়বারের মতো জানতে চাইলো।

"জানে। বলেছিতো।" স্পষ্টতই বিরক্ত হয় টিসা। তার দল এগিয়ে গেছে। সে যাবে কি যাবে না বুঝতে পারছে না। "আমি যাবো ওদের সাথে?" শেষে বাধ্য হয়ে জানতে চাইলো।

"যাও। যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি তোমার মায়ের জন্য অপেক্ষা করবো।" আলী স্রোতের মতো বহমান গাড়ীর ভীড়ের মধ্যে নিশির মামার গাড়ীটিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করে। কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

টিসা দ্বিধা-দ্বন্ধে দুলতে দুলতে দাঁড়িয়েই থাকলো। তার বন্ধুরা চীৎকার করে ডাকছে। সে হাত নেড়ে আসবে না জানিয়ে দিলো। বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "তোমার জন্যে আমি যেতে পারলাম না।"

তার সুন্দর মুখে রাগ, বিরক্তি এবং তিক্ততার কালো ছায়া খেলা করে যাচ্ছে, দেখে ঠোট টিপে হাসলো আলী। রাগলে মেয়েটাকে একেবারে নিশির মতো লাগে। যদিও সে ঠিক নিশির মতো দেখতে নয়। তার

বাবা সম্পর্কে কিছুই জানে না আলী। কিন্তু ভদ্রলোক যে সুন্দর ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দেখেছে মেয়েরা সাধারণত বাবার আদলটাই বেশী পায়, আর ছেলেরা মায়ের।

তাকে হাসতে দেখে আরো তেতো হলো টিসা। "হাসছো কেন? মা ঠিকই বলে! তুমি অকম্মার ধাড়ি।"

আলী চমকালো। "তোমার মা বলেছে আমি অকম্মার ধাড়ী?"

"বলবেই তো। খামাখা আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে। মাকে তো আমি বলেছিই। দেখো, ওরা সবাই মজা করতে করতে যাচ্ছে। আমাকে একা একা যেতে হবে।"

তার উষ্ণার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না আলীর। দলছুট হওয়াটা বাচ্চাদের জন্য খুবই হৃদয় বিদারক হতে পারে। সে আরেকবার রাস্তায় এগিয়ে আসা গাড়ীর বহর পর্যবেক্ষণ করলো। আরিফ এবং ঝুনু পৌছে গেছে। মামার এখনও কোন খবর নেই। তবে জানা গেলো তারা মামাকে বেশ পেছনে ফেলে এসেছে। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে গাড়ী চালানোয় তার পেছনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে।

"হলো এবার?" টিসা কড়া কণ্ঠে ধমকে উঠলো।

"তুমি দেখি তোমার মায়ের মতো শুধু ধমকাও।" আলী মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ করে।

"বাজে কথা বলো না। মা তোমাকে কখন ধমকিয়েছে? তুমিইতো শুধু পিছু পিছু ঘুরছো। ভেবেছো আমি কিছু বুঝি না?"

আলী আড়চোখে মেয়েটাকে দেখে। এই মেয়ে অনেক পাকনা। এর সাথে সাবধানে আলাপ চালানো প্রয়োজন। তাকে না ক্ষেপানোই ভালো। মায়ের চেয়ে সে কোন অংশেই কম ত্যাড়া নয়। তার অপছন্দের তালিকায় পড়ে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। সে নরম কণ্ঠে বললো, "আমরা না হয় চলেই যাই। একটু দৌড় দিলে ওদেরকে এখনও ধরা যাবে।"

টিসার মন নরম হলো। তারা কিছুক্ষণ দৌড়ালো। মানুষজন দল বেধে হাটছে। রাস্তার পাশে জায়গা সামান্যই। পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য থামতেই হয়। তাছাড়া একটু পর হাপিয়েও গেলো ওরা। বাকীদেরকে ধরবার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হলো না। আলী মনে মনে প্রমাদ গুনলো। এই বোধহয় মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বাস্তবে অবশ্য টিসা তেমন কিছু করলো না। সে সুবোধ বালিকার মতো বললো, "যাক। ওদেরকে ধরতে হবে না। আমরা দু'জনাই যাই। তোমার সাথে কথা আছে।"

"তাই নাকি? কি কথা?" আলী কণ্ঠস্বর গম্ভীর রাখে। মেয়েটার কথাবার্তায় বড় বড় ভাব আছে। কিন্তু সেটা সে তাকে বলতে দিতে চায় না। ক্ষেপিয়ে দিলে আরোও কত কথা বেরিয়ে পড়বে কে জানে। নিশি তাকে 'অকম্মার ধাড়ী' মনে করে এটা তার জানা ছিলো না।

"তোমার সব কথা মা আমাকে বলেছে।" টিসা মুরুব্বীয়ানা কণ্ঠে বললো। "তোমাদের অনেক দিনের লাভ এফেয়ার, রাইট?"

আলী থমকালো। "এটা নিশি তোমাকে বলেছে?"

"আরোও অনেক কিছু বলেছে। তুমি একটা ভীতু।"

"সত্যিই ভীতু বলেছে? তুমি বানিয়ে বলছো না?"

"আমি বানিয়ে কথা বলিনা।"

একটা পাহাড়ের পাদদেশে ট্রেইলটা শুরু হয়েছে। দুই পাশে হাল্কা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বেশ প্রশস্ত পায়ে চলা পথ উতরাই বেয়ে উপরে উঠে গেছে। পিঁপড়ের সারির মতো নানান বয়সের মানুষজন উঠছে। কাছেই আরেকটি পথ ধরে নীচে নেমে আসছে আরেক দল। উঠতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। ঢালটা সাধারণের চেয়ে বেশী কিন্তু অসহনীয় নয়। তবে কিছু দূর ওঠার পর অনভস্তদের হাঁফ ধরে যাচ্ছে। অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিশেষ করে বয়সী মানুষেরা। একাধারে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে হচ্ছে বলে পায়ের পেশীতে যথেষ্ট চাপ পড়ছে। একটু পরে টিসাও দাড়িয়ে পড়লো।

"আমার পা ব্যথা করছে।"

"একটু দাঁড়াই তাহলে।" আলী ট্রেইলের এক পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়।

"মাকে কি দেখা যাচ্ছে?" টিসা নীচের দিকে তাকিয়ে মানুষের ভীড়ে নিশিকে খোঁজার চেষ্টা করে। আলীও খোঁজে। দেখা যায় না। আরিফ এবং ঝুনুরা দল বেঁধে আসছে।

"ঐ মানুষটা এমন ধীরে গাড়ী চালায়।" বিরক্ত কণ্ঠে বললো টিসা। "তার গাড়ীতে উঠলে মনে হয় হাঁটছি।"

হেসে ফেলে আলী। "এই জন্যেই আমার গাড়ীতে উঠেছিলে?"

"বাকীরাও উঠলো যে।"

"এখানে স্কুলে তোমার বন্ধু হয়েছে?"

"কয়েকজন। দেশে অনেক বান্ধবী ছিলো। খুব মিস করি।"

"এখানেও অনেক বন্ধু পাবে। চলো উঠি।" আলী আবার হাটতে শুরু করে। টিসা ওর সঙ্গ নেয়। একটু খানি গিয়ে সে আলীর বাহু ধরে। আলীর অসম্ভব ভালো লাগে। বহুবার নিজের সন্তান হলে কেমন অনুভূতি হতো মনে মনে বোঝার চেষ্টা করেছে সে। বোঝাটা সহজ নয়। টিসার মতো একটা মেয়ে থাকলে মন্দ হতো না। যেমন পাকনি, তেমনি মায়াময়। ওর মৃত বাবার জন্য তার খারাপ লাগে। এমন চমৎকার মেয়েটার সঙ্গ পেলো না বেচারী। কোথায়, কিভাবে আছে সে কে জানে? মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? তার ধর্ম বিশ্বাস নড়বড়ে। হয়তো দৃঢ় হলেই ভালো হতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্ধের মতো কোন কিছুকে গ্রহণ করলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। বানুর মৃত্যুর পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। মায়ের স্মৃতি এখনও খুবই জীবন্ত। তার জন্যে সমস্ত জীবন ব্যয় করেছিলো বানু। নিজের সুখ ও দুঃখের দিকে ফিরেও তাকায়নি। দূর্ভাগ্যবশত পিয়ার সাথে বনিবনা হলো না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আলী। এই প্রসঙ্গে সে চিন্তা করতেও ভয় পায়। পিয়া সরাসরি না বললেও আলী জানে সে বানুকেই দোষারোপ করে তার সংসার ভাঙার জন্য। আলী মাকে দোষারোপ করবার কথা চিন্তাতেও ভাবতে চায় না। জ্ঞান হবার পর থেকে এই মানুষটা এমন নিঃস্বার্থভাবে তাকে ভালোবেসেছিলো যে তার সম্বন্ধে কোন মন্দ কিছু চিন্তা করাও অসম্ভব।

"কি ভাবছো, আংকেল?" টিসা হাত-ঝাঁকিয়ে জানতে চাইলো।

চমকে বাস্তবে ফিরে এলা আলী। প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো। "টিসা, তোমার বাবাকে মনে পড়ে?"

টিসা মাথা নাড়ে। "নাহ। বাবা নাকি আমি অনেক ছোট থাকতে মারা গেছে। ছবিও তো নেই। মাকে বললে মা একটু রেগেই যায়। ভয়ে আমি কিছু বলি না।"

আলীর একটু অনুশোচনাই হয়। এই প্রসঙ্গ না তুললেই ভালো হতো। নিশি শুনলে হয়তো বিরক্তই হবে। টিসা মনে হয় তার মনের কথা বুঝতে পারলো। "ভেবো না। মাকে কিছু বলবো না।"

হেসে ফেললো আলী। "তুমি অনেক বোঝো। খুব স্মার্ট।"

"তুমি খুব সোজা মানুষ। তোমাকে বোঝা সহজ।" টিসা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। ঢালটা এখন আরোও খাড়া হয়েছে। সামনে ঝুঁকে উঠতে হচ্ছে। ভারসাম্য রাখার জন্য। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাটলো ওরা। "তোমার কোন বাচ্চা নেই কেন?" হঠাৎ জানতে চাইলো টিসা।

আবার হাসলো আলী। "আন্টিই নেই। বাচ্চা থাকবে কেমন করে।"

"মা বলে তুমি যেমন গাধা তোমার সাথে কোন মেয়েই থাকবে না।"

"সত্যিই বলেছে?"

"একবার তো বলেছিই আমি বানিয়ে কথা বলি না। তবে মা কিন্তু আদর করে বলেছে। কষ্ট পেও না আবার।"

"নাহ কষ্ট পাবো কেন? আমি 'অকম্মার ধাড়ী' 'ভীতু', 'বোকা'। আর কি কি বলেছে আমি জানতেও চাই না।"

খিল খিল করে হেসে ওঠে টিসা। "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মাকে বলবে না কিন্তু।"

"করো।"

"মা কি তোমার গার্ল ফ্রেন্ড ছিলো?"

হেসে ফেলে আলী। "গার্ল ফ্রেন্ড? নাহ। তার চেয়েও বেশী। তোমার মা তোমাকে কি বলেছে?"

"কিছু বলে না। বলে, পরিচিত। কিন্তু যেভাবে তোমাকে নিয়ে কথা বলে তাতেই বুঝি কিছু একটা গড়বড় ছিলো।"

"তুমি আরেকটু বড় হলে তখন তোমাকে সব খুলে বলবো। এখন বললেও তুমি বুঝবে না।"

"আমি অনেক কিছু বুঝি। আমি ততো ছোট না।" টিসা গম্ভীর কণ্ঠে বলে। ঠোট টিপে হাসে আলী। তার ভয়ানক ইচ্ছা হয় এই মেয়েটার জীবনের একটা অংশ হতে। দূর থেকে নয়। কাছ থেকে। প্রতিদিন। বছরের পর বছর। বালিকা থেকে তরুণী, সেখান থেকে যুবতী, প্রেম-ভালোবাসা, বিয়ে, সন্তান-ওর চোখের সামনে খুব আনন্দময় একটা ঘটনার স্রোতের মতো ভবিষ্যতের ছবিগুলো ভেসে যায়। হাসি পায়। কেমন উদ্ভট সব চিন্তা। তবে একটা সন্তানের অভাব সে গভীরভাবে অনুভব করে।

"মা খুব একা।" টিসা আনমনে বললো। "তার খুব একটা বন্ধুও নেই।"

"বাংলাদশেও ছিলো না?"

"নাহ। কেউ আমাদের বাসায় আসতো না। নানু, নানীও না।"

একটু অবাক হয় আলী। "কেন?"

"জানি না। আমরাও খুব একটা যেতাম না। বছরে হয়তো একবার দেখা হতো। আত্মীয়-স্বজন কেউ আসতো না।" একটু নীরবতার পর আবার বললো, "মা কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করে। আমি বুঝতে পারি। সত্যিই পারি। তুমি আবার ওর বন্ধু হবে?"

"হতে পারি। তুমি কি বলো?"

কাঁধ ঝাকায় টিসা। "আমি বলি, চেষ্টা করে দেখো। তুমি বোকা-বোকা, এটা ভালো। মা বেশী চালাক লোকদের পছন্দ করে না। বলে তারা দুষ্ট। ভয় পায় ও। তোমাকে ভয় পায় না।"

আলী হেসে আলতো করে টিসার গলা জড়িয়ে ধরে। "আমাকে কেন ভয় পাবে? আমি তার অনেক কাছের বন্ধু।"

"তাহলে তোমাকে কখনো দেখি নি কেন? দেশে থাকতে তো তোমার কথা মা কখনো বলেও নি।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে আলী। কোন উত্তর দেয় না। সেই সব জটিল মনস্তত্ব এই ছোট মেয়েটি বুঝবেও না, তাকে সেসব কথা বলাও যায় না। ঢালটা এখন কমে এসেছে। ট্রেইলটা ঘন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে একটা খোলামেলা লুক-আউট পয়েন্টের দিকে। মানুষের ভীড়ের সাথে ওরাও হাঁটতে থাকে সেদিকে। দূর থেকেই বাকী ছেলোমেয়েদেরকে দল বেঁধে বসে থাকতে দেখে ওরা। টিসা হৈ চৈ করে ওঠে। "ঐ তো ওরা। আমি দৌড়ে যাই।"

"তোমার ইচ্ছা হলে যাও।"

"তুমি মন খারাপ করবে না তো? তোমাকে একা রেখে চলে যাচ্ছি বলে?"

আলী হেসে ফেললো। "নাহ। এইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি মন খারাপ করি না আর।"

দৌড় দেয় টিসা। ওর বিনুনী করা চুল কাঁধের এপাশ ওপাশ দুলতে থাকে। আলীর চোখের কোণ অকারণে ভিজে ওঠে। মায়া পড়ে যাচ্ছে। বেশী মায়া আবার ভালো না। বিচ্ছেদ অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার এখন ভালোবাসতে ভয় হয়। যে কোন ধরনের ভালোবাসাতেই। মানুষ যেমন চায় তেমনটি

কালেভদ্রেই ঘটে। তার নিজের জীবনটা একেবারেই প্ল্যানমাফিক চলেনি। চল্লিশে এসে সে এমন নিঃসঙ্গ একা হয়ে যাবে কে ভেবেছিলো? এই ছোট মেয়েটা কি তার জীবনে নতুন আনন্দের স্রোত নিয়ে আসবে? নিশিকে বোঝা যায় না। কে জানে, হয়তো একদিন সে হঠাৎ করেই অন্য কোথাও চলে যাবে। আবার সব ভেঙে যাবে। ভাঙা-ভাঙির খেলায় আর মত্ত হতে চায় না আলী। একাকিত্বই ভালো। নিঃসঙ্গতাই চলুক।

১৫

লুক আউট পয়েন্টটা মানুষজনে গম গম করছে। পাহাড়েরর কিনারে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। সমতল পাথুরে চত্তরটুকুর পরেই পাহাড়টা ঝুপ করে নেমে গেছে কয়েক শ'ফুট, প্রায় খাড়া হয়ে। কোন রেলিং নেই, কোথাও। সামনে তাকালে আদিগন্ত বন-জঙ্গল এবং ছোট ছোট টিলার সমাহার এক অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। লাল, কমলা, হলুদ আর সবুজের মন কাড়া ছোপ বিছিয়ে থাকা নানান গাছ-গাছালির গালিচায়। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো একটা দৃশ্য। দল বেঁধে ছবি তুলছে সবাই। বাচ্চারা দৌঁড়া-দৌঁড়ি করছে। অনেকেই ঢালের বেশ কাছে চলে যাচ্ছে ক্যামেরায় পোজ দেবার জন্য। আলীর শরীর শির শির করে। এতো উপর থেকে দূর্ঘটনা বশত পড়ে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু। বশীরও সম্ভবত একইভাবে চিন্তা করছে কারণ সে বাচ্চাদের দলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঢাল থেকে সরিয়ে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের স্বভাবে নেই। সবাইকে খেয়াল করাও কঠিন। বশীর হিম সিম খাচ্ছে।

ঠিক হলো দলের বাকীরা না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে ওরা। তারপর সবাই মিলে নীচে নেমে একসাথে মোটেলে ফিরে যাবে। তাতে দলছুট হবার সম্ভাবনা কম থাকবে। পনেরো বিশ মিনিট পরেই আরিফ এবং ঝুনুদের দলটা লুক আউট পয়েন্টে এসে হাজির হলো। নিশিরা এলো আরোও মিনিট পাঁচেক পর। তারা অন্যদিক দিয়ে উঠে আসায় দ্রুত চলে এসেছে। নিশি বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "আমি আর মামার গাড়ীতে উঠছি না। একটা কচ্ছপও ওর চেয়ে জোরে চলে।"

মামা হা হা করে হাসতে লাগলো। "আরে, সাবধানে চালাই। কত ফাজিল ড্রাইভার আছে জানো?"

নিশি তিক্ত কণ্ঠে বললো, "তোমার পেছনে তিন মাইল লম্বা লাইন পড়ে গেছিলো। সেটা খেয়াল করেছিলে?"

মামা খুশী গলায় হাসতেই থাকে। লায়লা তাকে একটা খোঁচা দেয়। "চুপ করো তো, হা হা করে হেসো না। সবাইকে দেরী করিয়ে দিয়েছো। এতো খুশী হবার কি হলো?"

শওকত সেই কথায় কান দিলো না। ক্যামেরা বের করে ফটাফট ছবি তুলতে লেগে গেলো। তার ছবি তোলার বাতিক আছে, বোঝা গেলো। দল বেঁধে বেশ কিছু ছবি তোলা হলো। বাচ্চারা আলাদা, পুরুষেরা আলাদা, মহিলারা আলাদা, বাচচা এবং মহিলারা একসাথে, পরিশেষে সবাই একসাথে। ছবি তোলা নিয়ে বেশ খানিকটা হৈ চৈ হলো। বিশেষ করে পুরুষ এবং মহিলারা কে কোথায় দাঁড়াবে তাই নিয়ে অনেক হাসাহাসি হলো। ভাবীরা নিশিকে আলীর দিকে ঠেলে দেয়ায় নিশি ছবি তুলবেই না হুমকি দেয়ায় ভাবীরা বাধ্য হয়ে তাকে নিজেদের দলে নিলো। মহিলারা একপাশে, পুরুষেরা অন্য পাশে, বাচ্চারা সামনে হাঁটু গেড়ে বা দাঁড়িয়ে, তাদের উচ্চতার উপর নির্ভর করে। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নিয়েও আলাদা ছবি তোলা হলো। শওকত আলীর সাথে নিশি ও টিসাকে ছবি তুলতে বলায় নিশি তাকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলতে যা বাকী রাখলো। টিসা অবশ্য আলীর হাত ধরে একটা ছবি তুললো। আলী বললো, "মামা, এই ছবিটার একটা কপি আমাকে পাঠিয়েন। আমার ইমেইল এ্যাড্রেসটা আমি লিখে দেবো।"

নিশি ভ্রু কুচকালো। একটু খিটখিটে হয়ে আছে মনে হলো। ছবি তোলার পর্ব শেষ হতে ফিরে যাবার পালা। নিশি হিল পরে এসেছে, নামতে কষ্ট হচ্ছে।

শওকত ঝট করে দৌঁড়ে বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেলো। আলীর অন্তত বুঝতে অনুবিধা হলো না তার কি মতলব। নিশি যেভাবে নামছে তাতে তার যে শীঘ্রই কারো উপরে ভর করে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নইলে পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। সে টিসাকে ধরে পা পা করে নামছে। টিসা নিজেই টলমল করছে। আলী এগিয়ে গেলো। "আমার হাত ধরো।" ধমকে উঠলো নিশি, "হ্যাঁ, নাটক করতে? লাগবে না।"

টিসা বিরক্ত গলায় বললো, "আমি তোমাকে ধরে নামতে পারবো না। দু'জনাই পড়ে যাবো। জামা কাপড় ময়লা হবে।"

"যা তুই । তোকে লাগবে না।" রাগ হয়ে গেলো নিশির। "আমি একাই পারবো। পাহাড়ে পর্বতে উঠবো তাতো জানতাম না। জানলে কেডস নিয়ে আসতাম।"

হাসলো আলী। "আচ্ছা হাত ধরতে হবে না। আমি তোমার সামনে সামনে থাকি, দরকার হলে আমার পিঠ ধরে ব্যাল্যান্স করো।"

সমাধানটা পছন্দ হলো। না হয়ে উপায় নেই। টিসা ইতিমধ্যেই নেমে গেছে খানিকটা। শার্টের পেছনে খামচি দিয়ে ধরলো নিশি। পা পা করে নামছে। ভাবীরা অন্য দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

"টিসা তোমার সাথে ছিলো?" নিশি জানতে চাইলো।

"হ্যাঁ। তোমার জন্যে নীচে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম আমরা।"

"মামাকে লাইসেন্স দেয়াই ঠিক না। মনে হয় গরুর গাড়ী চালাচ্ছে। ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো আমার।"

সশব্দে হেসে উঠলো আলী। "টিসাও তাই বলেছে।"

"টিসার সাথে খুব ভাব হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"তা হয়েছে। দারুণ মেয়ে। খুব চালু।"

"পাকনা বেশী। সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে তো।"

"বললো তোমার নাকি কোন বন্ধু নেই।"

"বুড়ো বয়েসে বন্ধু দিয়ে কি করবো? যারা ছিলো তাদেরকেই-তো ধরে রাখতে পারি নি।"

"বুড়ো? এতো শীঘ্রই?"

"আমি বুড়িয়েই গেছি। বাইরে না হলেও মনে। বীতশ্রদ্ধা ধরে গেছে সব কিছুর উপর।"

"তোমার বাবা-মায়ের সাথে কি হয়েছে?"

"সেটাও বলা হয়ে গেছে? মেয়েটা বেশী পট পট করে।"

"কি নিয়ে ঝগড়া?"

"ঝগড়া না। সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। টিসার জন্যেই খারাপ লাগে। বেচারী একাকীই থাকে অধিকাংশ সময়।"

"সে তো বললো তার অনেক বন্ধু আছে। তোমারই কেউ নেই।"

"তা থাকবে কেন? তোমার পথ চেয়ে বসে আছি তো?"

"থাকতে তো একসময় ।"

'সেই কাল অনেক আগে পেরিয়ে গেছে ।"

"সত্যিই গেছে? শুনলাম আমি নাকি গাধা, বোকা, অকম্মা"

হাসতে লাগলো নিশি । "ইস, মেয়েটার যদি কোন কান্ডজ্ঞান থাকে ।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"ভনিতা করছো কেন?"

"ওর বাবার ছবিও ওকে কেন দেখাওনি? ও বড় হচেছ এখন । ওর জানতে ইচ্ছা করবে না এসব?"

নিশি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে । "ও মারা যাবার পর মন খারাপ করে সব পুড়িয়ে ফেলেছিলাম । "

আলী এই প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ায় না । নিশির মন খারাপ করে দিতে চায় না সে ।

নীচে নেমে দেখলো সেখানে আরেক নাটক শুরু হয়েছে । গত দু-তিন বেলা ধরে বাসা থেকে রেঁধে নিয়ে আসা খাবার সাটছিলো সবাই । কোন একটা বা দুইটা খাবার হয়তো কিঞ্চিৎ নষ্ট মতন হয়ে গিয়ে থাকবে, কারণ দলের বেশ কয়েক জনের পেট ছুটে গেছে । আর ছুটবি তো ছোট এমন জায়গায় যেখানে ধারে কাছে কোন ভদ্রগোছের বাথরুম নেই । বন-জঙ্গলই ভরসা । মইনুল ভাই পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতর থেকে ঘুরে এসে হাসি মুখে জানান দিলেন, এবারের মতো পাতা দিয়েই কাজ সারতে হলো । বাচ্চাদের মধ্যে তিন-চারজন ছুটাছুটি শুরু করে দেয়ায় তাদেরকে নিয়ে গাছ পালার ভীড়ে পাড়ি জমাতে হলো বাবা-মায়েদের । মহিলাদের কয়েকজনকেও দেখা গেলো চোখ মুখ চেপে কোনরকমে অবাঞ্চিত চাপ সহ্য করবার চেষ্টা করছে ।

সবাই গাড়ীতে চেপে রওনা দিতে আরোও মিনিট পনেরো গেলো । টিসা এবার বাকী বাচ্চাদের সাথে দল বেঁধে উঠলো আসলামের গাড়ীতে । নিশি বোধহয় শওকতের গাড়ীতেই উঠতো, যদি সে আগেই লায়লাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে না পড়তো । গজ গজ করতে করতে আলীর পাশেই উঠে বসলো নিশি । "কেমন শয়তান । ইচ্ছে করে আগে আগে ভেগেছে ।"

আলী হাসি মুখে বললো, " তোমার মামার উপরে মানুষ হয় না ।"

"তোমার তো খুশী ধরছে না ।" মুখ ঝামটা দেয় নিশি । "সবাই আমাকে নিয়ে কথা বলবে ।"

"বললেই বা কি? তুমি একলা । আমিও একলা । দোকলা হতে অসুবিধা কি?"

"হ্যাঁ এবার সিনেমার কায়দায় একটা গানও ধরো ।"

হেসে ফেলে আলী । "কখনো ভাবিনি তোমার সাথে আবার এভাবে দেখা হবে ।"

নিশি কিছু বলে না । আলী আড়চোখে ওকে দেখে । "তুমি ভেবেছিলে?"

"ভাবার কিছু নেই । জানতাম দেখা হবে, তুমি কোথায় কিভাবে আছো সব আমার জানা ছিলো ।"

"কিভাবে?"

"জানতে চাইলেই জানা যায় । সেন্টারে আবার একটু থেমো ।"

"কেন?"

"পেটটা গোলাচ্ছে । তাড়াতাড়ি যাও । কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবো জানি না ।"

আলী স্পিড বাড়িয়ে দিলো । "বেশী খারাপ লাগলে রাস্তার পাশে থামি । জঙ্গলে গিয়ে সেরে ফেলো ।"

"মরে গেলেও না । দরকার হলে তোমার গাড়ীতেই করবো ।"

আলী কথা বাড়ালো না । এই মেয়েকে দিয়ে কোন কিছুই অসম্ভব নয় । সেন্টারের গেটে গাড়ী থামাতেই লাফিয়ে নেমে সোজা বাথরুমে ছুটলো নিশি । সেখান লাইন না থাকলেই হয় । আবার বার ছিলো । আলী পার্কিং লটে গাড়ী রেখে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে এলো । নিশিকে বাইরে দেখা গেলো না । তার মানে সে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে । তার অবস্থা বেশ বেগতিকই মনে হচ্ছিলো । করিডোরের দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে ও ।

মিনিট পাঁচেক পরেই বেরিয়ে আসে নিশি । তাকে দেখেই বোঝা যায় একটা বিরাট বোঝা নেমে গেছে । লাজুক হাসি দেয় । "ভাগ্যিস ভীড় ছিলো না । নইলে খুব কেলেংকারী হতো । ধরে রাখতে পারতাম না ।"

হাসতে থাকে আলী । "বেশ হতো । ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে সবাইকে বিলি করে বেড়াতাম ।"

"ছাই করতে । ক্যামেরাই নেই যে ছবি তুলবে । চলো, ফিরি ।"

"বসবে এখানে? কিছু খাবে?"

"নাহ ।" একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বের পর বলে নিশি । "চলো ফিরেই যাই ।"

আলী জোর করে না । বেশী চাপাচাপি করাটা ঠিক হবে না । তাছাড়া সময়তো আছেই । নিশি টরোন্টোতে থাকলে কাছাকাছি হবার সুযোগ অনেক পাওয়া যাবে । তাদের দু'জনার জীবনে যা যা ঘটেছে, তারপর আবার কাছাকাছি যেতে না পারাটাই হবে ব্যর্থতা ।

গাড়ীতে উঠে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয় না । নিশি কি যেন ভাবছে ।

"টিসা তোমাকে ওর বাবার কথা কি বলেছে?"

"কিছুইতো জানে না । সেটাই বললো ।"

"তোমাকে পছন্দ করে ।"

"বুঝেছি । কিন্তু বাবার স্থান কেউ পুরণ করতে পারে না ।"

"আমার বাবার সাথে আমার নয় বছর কোন কথা হয়নি ।"

"নয় বছর?"

"হ্যাঁ । মায়ের সাথে কথা হয় । বাবা কথা বলে না ।"

"কেন?"

"বলা যাবে না । থাক, একটু চুপ করে থাকি দু'জন । মন খারাপ করবে না তো?"

"না ।"

আলী গাড়ী চালানোয় মনোযোগ দেয় । নিশি চোখ বুজে ঘুমানোর চেষ্টা করছে । রহস্যটা পরিষ্কার হচ্ছে না আলীর কাছে । ভয়াবহ কিছু একটা ঘটেছে এই মেয়ের জীবনে, যখন আলী তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো । মেয়ে দুটির জন্য পাগল ছিলেন ওর বাবা । তিনি নয় বছর ছোট মেয়ের সাথে কথা বলবেন না, এটা স্বাভাবিক নয় । তার মাথার মধ্যে উদ্ভট সব চিন্তা ঘুরতে থাকে । খোঁজ নেবার চেষ্টা করবে? হয়তো ঠিক হবে না । নিশির অনেক রাগ । জানতে পারলে হয়তো আর কখানো মুখই দেখবে না ।

"ঘুমাচ্ছো?" নীচু গলায় জানতে চায় সে ।

নিশি কোন জবাব দেয় না ।

কিভাবে বছর ঘুরে গেলো টের পায়নি আলী। ক্যাডেট কলেজের চার দেয়ালের মধ্যেই অধিকাংশ সময় কেটেছে। সকাল থেকে রাত অবধি নানান কর্ম তৎপরতায় সময় বয়ে যায় দ্রুত। মানুষ অভ্যাসের দাস। যেসব কাজ কর্ম শুরুতে ওর একেবারেই পছন্দ হতো না সেগুলোই ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করে। ভোর বেলা উঠে পিটি করতে যাবার ব্যাপারে ওর আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু প্যারেড করতে ভালো লাগে না। সৈনিক হবার কোন ইচ্ছাই সে অনুভব করে না। এতো কড়া নিয়ম কানুনও তার ভালো লাগে না।

আরোও একটা জুনিয়র ব্যাচ ঢুকে গেছে এর মধ্যে। ক্লাশ নাইনে ওরা এখন। ক্যাডেট কলেজের পটভুমিকায় এটা যথেষ্ট সিনিয়র ক্লাশ। সবার ভেতরেই কম বেশী পরিবর্তন এসেছে, চলনে বলনে কথা বার্তায় গভীরতা এসেছে। তাদের সিনিয়রাও এখন অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ হয়েছে। যদিও ক্লাশ টেনের সাথে গোলমালটা আরোও পাকিয়ে বসেছে। এটা সেটা নিয়ে খিট মিট লেগেই থাকে। এখনও তেমন খারাপ কোন কিছু ঘটেনি। তবে ঘটতে কতক্ষণ?

আলীর খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। সে বরাবরই চুপচাপ, পড়ুয়া ধরনের। ইদানিং চশমা পরে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট মেডিকেল সেন্টারে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করে চশমা নিতে হয়েছে। ক্লাশে ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পাচ্ছিলো না। লেখা পড়তে কষ্ট হতো। চশমা নেবার পর তাকে এখন পুরোদস্তর বিজ্ঞ বিজ্ঞ লাগে। তবে সমস্যা হয়েছে পড়াশুনার চেয়ে তার গল্প কবিতা পড়া এবং লেখাতেই বেশী মনোযোগ। ক্লাশে অমনোযোগীতার জন্যে প্রায়শই শিক্ষকদের বকুনি সহ্য করতে হয়। সে চেষ্টা করে কারো সাতে পাঁচে না থাকতে। ঝামেলা করলেই ঝামেলা বাড়ে।

তার বন্ধুত্বের গন্ডীটা কিছু বেড়েছে। সগীর, জিকু, বাকের, ইমন, রফি, রিপনের সাথে ঘনিষ্টতা তুঙ্গে। অন্য হাউসের কিছু ছেলের সাথেও দোস্তি হয়েছে। সে ভালো ফুটবল খেলে। ফলে মাঠেও এক দল ছেলের সাথে তার গলায় গলায় ভাব। শুধু জসীমের সাথে মাঝে মাঝে খোঁচা খুঁচি হয়। জসীম ওদেরই এক শিক্ষকের ছেলে। একটু পাগলা পাগলা। কখন কি যে তার মাথায় ঘুরছে বোঝা দুষ্কর। হঠাৎ হঠাৎ উদ্ভট সব কথাবার্তা বলে। তবে দিলখোলা। একবার বন্ধুত্ব গাঢ় হলে সে জীবন দিয়ে দিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত আলীকে তার বিশেষ পছন্দ নয়। দু'জনাই দাবা খেলে। দাবার বোর্ডের রেষারেষি সে

বাস্তবেও পোষন করে। একই হাউসে থাকে। আলী এই অবাঞ্ছিত রেষের বিরুদ্ধে কিভাবে যুঝবে বুঝতে পারে না। চেষ্টা করে এড়িয়ে চলতে। কিন্তু সবসময় সম্ভবও হয় না।

বিকালে খেলাধুলা করে ফেরার পর অল্প সময় থাকে সবার গোছল সেরে নামাজের জন্য তৈরী হবার। প্রায়ই বাথরুমে লাইন পড়ে। যারা দেরীতে যায় তাদেরকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এমনই একটা লাইনে সে এবং জসীম অপেক্ষা করছিলো। জসীম তার ঠিক পেছনে। তার পালা যখন এলো তখন পেছন থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে জসীম। আলী রুখে দাঁড়ালো। হাতাহাতি শুরু হলো। সগীরও গোসল করবার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সে শক্তিশালী। এসে দু'জনকে পৃথক করে দিলো। সে দিনের মতো সমস্যা মিটলেও ঝামেলা মিটলো না। অসহায় বোধ করে আলী। মারপিটে সে জড়াতে চায় না। শিক্ষকদের কানে গেলে অবধারিত টারমিনেশান। বানুর সারা জীবনের স্বপ্ন জলাঞ্জলি হবে। সে চেষ্টা করে এড়িয়ে চলতে।

মিঠুর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং সপ্রতিভ ব্যবহার শিক্ষক, ছাত্ররা সবাই পছন্দ করে। সে যে একদিন বড় কোন পদে আসীন হবে সে ব্যাপারে কারোরই কোন সন্দেহ নেই। কলেজ প্রিফেক্ট হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আলীর সাথে ইদানিং দেখা একটু কমই হয়। ক্যাডেট কলেজে নিজ হাউজের বন্ধুদের সাথেই সময় বেশীক্ষণ কাটে। আলী অন্য হাউজে হওয়ায় একাডেমিক ব্লকে বা খেলার মাঠেই শুধু দেখা হয়। ছুটিতে খুলনায় নিদেন পক্ষে দু-তিনবার দেখা হয়ই। যত ব্যস্তই থাক মিঠু বাসায় এসে বানুকে একবার দেখা দিয়ে আসেই। বানু যে তাকে দ্বিতীয় পুত্রের মতো দেখে সেটা সে জানে। সম্ভবত সেই সূত্রেই আলীর সাথে তার সম্পর্ক কখনই শীতল হয় না। দেখা হোক আর না হোক, কথা হোক আর না হোক। তারা যেন দুই ভাইয়ের মতো। চোখের আড়ালে থাকলেও মনের আড়াল কখনই হয় না।

রুবীর জীবনে নানান সঙ্গীতের মূর্ছনা। তার সৌন্দর্যের খ্যাতি যেমন ছড়িয়েছে সেই একই হারে স্তাবকের সংখ্যাও বেড়েছে। কিনু পাগলা এখন তার ধারে কাছেও যাবার সুযোগ পায় না। তার বড় ভাইয়েরা রুবীর পেছনে লাইন দিয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো শরীরের পরতে পরতে সৌন্দর্য আর উদ্দীপনার এক অপূর্ব সমাবেশ নিয়ে কিশোরী থেকে তরুণীতে পদার্পণ করতে চলেছে রুবী। সে যখন আকাশ নীল পোশাকে শরীর জড়িয়ে, ফিনফিনে ওড়নায় ফুরফুরে বাতাস কাঁপিয়ে, মসৃণ পিঠময় সযত্নে ছড়ানো কালো চুলে ঢেউ তুলে যায় তখন চোখ ফেরানো দুষ্কর হয়। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে

থাকতে হয়। সেই দৃশ্যকে ছোঁয়া যাক বা না যাক, শুধু দেখারই যে আনন্দ তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে কষ্ট হয়। আলীর তো হয়ই। সম্ভবত মিঠুরও হয়। মিঠু ইদানিং রুবীর কথা বেশী বলে না। কিন্তু আলী বুঝতে পারে। রুবীকে নিয়ে সে যেমন অলস মুহূর্তে ভাবে, খুব সম্ভবত মিঠুরও নির্জন মুহূর্ত একইভাবেই কাটে। এখনও কি রুবী মিঠুকে চিঠি লেখে? সে সাহস করে জিজ্ঞেস করেনি। মিঠুও বলেনি। এই একটা ব্যাপারে আলী অবাক হয়ে আবিষ্কার করে মিঠুর প্রতি সে কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ। রুবী তাকে আর কোন চিঠি লেখেনি। লিখতে কি পারতো না? আলী চিঠিখানা মিঠুকে গর্ব ভরে দেখিয়ে বলতো, রুবীর চিঠি। তোর কথাও লিখেছে। তেমনটি হবার আর কোন সুযোগ নেই। রুবী এখন রুই কাতলাদের জগতে চলে গেছে। তাকে নিয়ে অনেক উজ্জল নক্ষত্রেরা স্বপ্ন দেখে।

নিশির রুমালটি আলী ফেলবে ভেবেছিলো; কিন্তু ফেলতে পারেনি। ছোট একটা মেয়ে আদর করে একটা জিনিষ নিজ হাতে বানিয়ে দিয়েছে, ফেলতে পারেনি। বাক্সের মধ্যে অন্য কিছু কাপড় চোপড়ের সাথে রয়ে গেছে। ছুটিতে ফিরে গিয়েও আর বের করা হয়নি। ওভাবেই এক কোণায় পড়ে আছে। একটু বড় হয়েছে সে। হঠাৎ করেই যেন বেশ লম্বা হয়ে গেছে। গড়ন দেখে মনে হয় রুবীর চেয়ে লম্বা হবে সে। রুবীর উজ্জলতা বা উচ্ছলতা না থাকলেও তার কোমল অভিমানী মুখ মেঘলা আকাশের মতো মন ছুয়ে যায়, তার শান্ত সমাহিত দৃষ্টির সামনে বিব্রত হতে হয়। সেই দৃষ্টি ছোট কোন মেয়ের নয়। সেখানে স্পষ্ট বিজ্ঞতার ছাপ, গভীরতার ছাপ। যেন বড় একটি মানুষকে ছোট একটা শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সে যেভাবে গভীর দৃষ্টি মেলে আলীর দিকে তাকিয়ে থাকে তাতে আলীর অস্ব:স্তি লাগে। এই মেয়েটা এখনও কৈশোরে পা রাখেনি। তার দিকে তাকিয়ে ভুলক্রমেও অসংলগ্ন কোন চিন্তা সে তার মনের মধ্যে প্রবাহিত হতে দিতে চায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই ব্রত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তার একহারা শরীরটিকে বাঁকিয়ে লম্বা চুলের রাশি দুলিযে সে যখন শান্ত দৃষ্টি মেলে জানতে চায়, "আমাকে চিঠি লেখো না কেন আলী ভাই?" তখন নিজের অজান্তেই বুকের মধ্যে আলতো হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। এই মেয়েটার হৃদয় কাড়া কোমলতা যেন মনটাকে ঘিরে থাকে, একটা পাতলা পর্দার মতো সারাক্ষণ ঢেকে রাখে, আছে কি নেই বোঝা যায় না। কিন্তু মনের ভেতরে ভালো করে তাকালেই তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। আলীকে সে প্রতি মাসে একটা করে চিঠি লেখে। প্রথমে কাঁচা কাঁচা চিঠি লিখতো। যা মনে আসতো তাই লিখতো। লম্বা লম্বা চিঠি। এখন ছোট করে লেখে। বেছে বেছে শব্দ চয়ন করে। কিন্তু সেই চিঠি ভাইকে লেখা ছোট বোনের চিঠির মতো নয়। ভিন্নতাটুকু বুঝতে কারোরই অসুবিধা হবে না।

“আজ হঠাৎ করে ঝড় হলো। বাতাস আর বৃষ্টিতে চারদিকে সব কেমন এলোমেলো। সামনের মোড়ের আম গাছের বড় একটা ডাল ভেঙে ইলেকট্রিক লাইনে পড়েছে। বাসায় আলো নেই। হারিকেন জ্বালিয়ে আমার ঘরে বসে আছি। একা। রুবী আপু মায়ের ঘরে। লুকিয়ে এই চিঠি লিখছি। কেন যেন লিখতে ইচ্ছে হলো। বানু খালা ভালো আছে। ইতি, নিশি।”

আলী এসব চিঠি কাউকে দেখায় না। মিঠুর কাছ থেকে বিশেষ ভাবে সাবধান থাকতে হয়। তার হাউজের বন্ধুদের অনেকের সাথে মিঠুরও বেশ ভালো সম্পর্ক। তারা কেউ জেনে ফেললে মিঠুর কানে চলে যাবার সম্ভাবনা ষোল আনা। সবাই জানে মিঠু এবং সে দুই ভাইয়ের মতো। ক্যাডেট কলেজে চিঠিপত্র খুব ঘনঘন আসে না। এলে তখন বেশ খবর হয়ে যায়। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখার জন্য। বিশেষ করে হৃদয় সংক্রান্ত কোন কিছুর ইঙ্গিত পেলে শুধু বন্ধুরা নয়, বড় ক্লাশের ছেলেরাও লাফ দিয়ে পড়ে। এই চার দেয়ালের মধ্যে এতোগুলো তরুণ একরকম নারী বর্জিত জীবন কাটাচ্ছে, এটাই স্বাভাবিক। যদিও ক্যাম্পাসে বেশ কিছু শিক্ষকদের বসবাস। তাদের অনেকেরই মেয়ে আছে, যারা ইদানিং তারুণ্যে পদার্পণ করেছে। একাডেমিক ব্লকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, মুভি নাইটে কিংবা অন্য কিছু বিরল ক্ষেত্রে এই মেয়েগুলি দল বেঁধে আসে। তখন বেশ একটা হৈ চৈ, আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বয়স এবং ক্লাশের বিভেদ ক্ষনিকের জন্য ভুলে গিয়ে সবাই যেন উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। হৃদয় চঞ্চল হয়।

নিশির চিঠি সে একবার পড়েই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাথরুমের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসে। কেউ ভুলেও সেটার মধ্যে হাতাতে যাবে না। কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষতো নয়ই। জসিমকে নিয়ে অবশ্য ভয় থেকেই যায়। সে ঈগলের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সর্বক্ষণ আলীর কাজ কর্ম প্রত্যক্ষ করে। মনে হয় সুযোগ পেলেই হাতে নাতে ধরে ফেলবে। আলী চেষ্টা করে তাকে একটু তোয়াজ করে চলতে। কিন্তু দাবার কারনেই জসীমের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আলীর খেলার মান বাড়ার সাথে সাথে জসীমের পরাজয়ের সংখ্যাও বাড়ে। ব্যাপারটা গ্রহণ করতে তার হয়তো কষ্ট হয়। কিন্তু শত্রুতার প্রকোপটা ধীরে ধীরে কমে আসে, যদিও একেবারে চলে যায় না।

১৬

হঠাৎ করেই ধর্মে খানিকটা আসক্ত হয়ে পড়ে আলী। খুব সম্ভবত বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজনের উৎসাহ তার মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে থাকবে। বিশেষ করে সগীর। এই ছেলেটার প্রতি আলীর বরাবরই একটা কোমল অনুভুতি আছে। সে স্বভাবে চুপচাপ, স্বাস্থ্যবান, ক্ষেতের কাজে খুবই আগ্রহী, ভদ্র। কারো কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না। লাবলু এবং শিবলীর ঘটনার পর বেশ কিছুদিন বেচারীকে মাথা নীচু করে চলতে হয়েছে। যেন সেই ঘটনার পেছনে তার কোন দোষ ছিলো। সময়ের সাথে সাথে সেই স্মৃতি মুছে গেছে। তাকে সকলেই পছন্দ করে। কোন এক অজানা কারণে নাইনে ওঠার পর হঠাৎ করেই নামাজ-কালাম নিয়ে ভয়ানক আগ্রহী হয়ে পড়ে সগীর। সে আলীকেও দলে ভিড়াতে চায়। আলী কখনই তেমন ধার্মিক ছিলো না। আবার মায়ের জোরাজুরির কারণে নামাজ পড়া, কোরাণ পড়াও নৈমত্তিক হারে চালিয়ে গেছে। সগীরের সাথে জোট পাকিয়ে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করলো। রাতে যখন সব নিঃশব্দ হয়ে যায় তারা দু'জন লুকিয়ে হাউজের ছোট মসজিদ ঘরে গিয়ে জিকির করে। নিজের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে আলী। তার মনোসংযোগ বাড়ছে। স্রষ্টার সাথে তার ঘনিষ্টতা কোন পর্যায়ে সেটা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু নিজ চেতনার মধ্যে এক ভিন্ন জগৎকে আবিষ্কার করে। গভীর রাতের নিঃশব্দতায় অজানা, অচেনা এক মহাশক্তির নাম ডাকতে ডাকতে সে অনুভব করে এক কালো চাদর যেন তার চেতনার ক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছে, সেখানে বিস্তার করে নিথর এক সমুদ্র -শান্ত, নিষ্পাপ, কোমল; হঠাৎ হঠাৎ এক বালিকার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠে। প্রথম প্রথম সে অপরাধী বোধ করতো, নিজেকে বাধ্য করতো অন্য চিন্তায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার সেই-ভীতিবোধ কেটেছে। তার মনে হয় তার জ্ঞানের পরিধি, বোঝার পরিধিও যেন বিস্তৃত হয়েছে। স্রষ্টার নিরাকার রূপের সাথে তার সৃষ্টির সৌন্দর্য মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতেই থাকে। তাতে দোষের কি আছে?পুরো একটা সেমিষ্টার এভাবেই চলে। তারপর। হঠাৎ যেভাবে শুরু হয়েছিলো সেভাবেই ঝট করে সেই মুর্ছনা থেকে বেরিয়ে আসে আলী। তার ভয় হয় তার এই অবাঞ্চিত অনুভূতির স্রোত তাকে এক ভিন্ন, ভুল পথে নিয়ে যাবে। স্রষ্ঠার প্রকৃত উপস্থিতি অনুভব করবার যে ব্যগ্রতা সে অনুভব করেছিল তা যেন হঠাৎ করেই ম্লান হয়ে যায়। সগীর সমান আগ্রহ এবং নিষ্ঠা নিয়ে রাতের গভীরে জিকির করে; কিন্তু ধীরে ধীরে আলী তার পাশ থেকে উধাও হয়ে যায়। সগীর লক্ষ্য করে কিন্তু কিছু বলে না। তারা দু'জন পাশাপাশি সবজীর বাগানে

কাজ করে, ছুটাছুটি করে একই দলে ফুটবল খেলে, একজনের বিপদে আরেকজন ছুটে আসে। দল বেঁধে থেকে এই একটা জিনিষ ওরা দু'জনাই শিখেছে, আরো সবার মতো, নানান ঘটনা আর সময়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাবে জীবন, আশা-নিরাশা-ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই বাঁচতে হবে, কিছু হার মানতে হবে কিছু রুখতে হবে। যা আছে সেটুকু উপভোগ করতে হবে। যা নেই তার জন্য আফসোস করা অর্থহীন।

শীতকালে ক্যাম্পাসের দেয়ালের বাইরে সার বেঁধে থাকা খেজুর গাছে চাষীরা ভাড় বসায় রস সংগ্রহের জন্য। সেই রস কিছু কাঁচা বিক্রি হয়, কিছু জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো হয়। সগীরের সাথে এক রাতে রস চুরি করতে গেছে আলী। রস চুরির ব্যাপারটা বেশ জনপ্রিয়। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যে নয়। কাঁচা রস অনেকেই খায় না কিন্তু দেয়াল টপকে ওপারে গিয়ে চুরি করে রসের ভাড় পেড়ে নিয়ে আসার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে সেটার তুলনা কিসে? আলী অনেক শুনেছে রস চুরির কথা, কখনো নিজে যাবে চিন্তাও করেনি। কেউ যে কখনো ধরা পড়েনি তা নয়। গ্রামবাসীরা কয়েকবার হাতে নাতে ক্যাডেটদেরকে রস চুরি করতে ধরেছে। তারা অবশ্য ভদ্রভাবে সব বারেই চোরদেরকে কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। বেধড়ক পিটুনি না দিয়েই। কলেজ কর্তৃপক্ষ সাধারণত এই কারণে কাউকে কলেজ থেকে বের করে দেয় না। তবে তাদের নামের পেছনে একটা কালিমা লেগে যায়। আলী এমন কোন উজ্জল নক্ষত্র নয়। কিন্তু নিজের নামে কালিমা লাগাতেও তার আগ্রহ নেই। মা জানতে পারলে জীবনটা বারো ভাজা করবে।

তারপরও সে সগীরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো। সগীর নাকি এর আগেও কয়েকবার গেছে। একাই গেছে। অচিন্তনীয়। সিনিয়রদের চোখ এড়িয়ে, কলেজের নাইট গার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে তারের বেড়া দেয়া উঁচু দেয়াল টপকে, গ্রামবাসীদের নজর এড়িয়ে খেজুর গাছে উঠে রসের ভাড় নিয়ে নেমে সেটাকে নিরাপদে ভিতরে নিয়ে আসা রীতিমতো মাসুদ রানার স্পাই এসাইনমেন্টের মতো। ঝুঁকি থাকলেও এই অভিজ্ঞতা জীবনে একবার না হলে জীবনটাও বৃথা।

দু'জনে নিভৃতে বসে বেশ জল্পনা কল্পনা হয়। যদিও সে এর আগে গেছে তারপরও পুরো ব্যাপারটার মধ্যে সযত্নে পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। কোথাও সামান্য ভুলত্রুটি করে ধরা পড়ে গেলে যে মহা হেনেস্থা হতে হবে সেটা অবশ্য ভালো করেই জানে। এর আগের বছরেই মাঝরাতে হঠাৎ বিশাল হৈ চৈ। শিক্ষকরা হাউজে হাউজে গিয়ে সবাইকে ডেকে তুলে মাথা গুনতে শুরু করে। নাইট গার্ড বোধহয় কিছু একটা দেখে থাকবে। সে রিপোর্ট করে দিয়েছে। ক্যাডেটরা গ্রামের অশিক্ষিত গরীব চাষীদের গাছের

সামান্য রস চুরি করতে গিয়ে ধরা খেলে এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা, খ্যাতি এবং নামের সমূহ অপমান। এই এলাকায় সবাই ক্যাডেট কলেজকে গন্য করে সামরিক বাহিনীর ছোটখাটো একটা আখড়া হিসাবে। ক্যাডেটদেরকে সবাই যথেষ্ট সমীহের চোখে দেখে থাকে। সেই শ্রদ্ধার পিট থেকে নেমে যাওয়াটা সব দিক দিয়েই মন্দ। কিন্তু তারপরও ছেলেরা যায়। নিরাপদে ফিরেও আসে এবং খুব বুক ফুলিয়ে সেই গল্প করে বেড়ায়। কেউ কেউ নাকি আরো সাহসের পরিচয় দিয়ে ঝিনাইদা শহরে গিয়ে সিনেমাও দেখেছে। কিন্তু ধরা পড়ার ভয় তাতে অনেক বেশী। ছোট ছোট করে আর্মি কায়দায় চুল ছাটা অল্পবয়স্ক তরুণ দেখলেই সবাই ধরে নেয় এরা ক্যাডেট। কলেজে খবর চলে আসাটা অসম্ভব নয়। কিন্তু রোমাঞ্চ ছাড়া তরুণ মস্তিষ্ক বোধহয় যথাযথ কাজ করে না। এই বদ্ধ প্রাঙ্গনের মধ্যে আর কিইবা করার আছে? সিনিয়র ছেলেরা দল বেঁধে সিগ্রেট টানে, সম্ভব হলে হয়তো দু'এক বোতল মদ ভেতরে চালান করে আয়েশ করে খাওয়া হয়। শিক্ষকদেরকে উত্তক্ত করা আর নয়তো যৌনতা-কেউ ভাবনায়, আলাপে; কেউ কর্মে।

সগীর জানে কিভাবে কি করতে হবে। রাতের কোন্ প্রহরে সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়, নাইট গার্ডেরা ঠিক কোন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দু মুহুর্তের জন্য চোখ বুজে নেয়, কখন গ্রামের ক্ষেত পাহারাদাররা বাড়ী ফিরে যায়। সব তার নখদর্পনে। আলী অবাক হয়। নামাজী ভদ্রস্বভাবের সগীরের এই নতুন রূপ তার কাছে অভিনব মনে হয়। তাকে দেখে কেউ চিন্তাই করবে না। সে অবশ্য স্বীকার করলো বাকেরের কাছেই তার হাতে খড়ি। বাকের কলেজের গার্ডের ছেলে, ক্যাডেট কলেজের সীমান্তের কাছেই একটা গ্রামে তাদের বাস। সে যদি না জানে এসব, তাহলে আর কে জানবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বাকের এইসব ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। সগীরের আগ্রহ বেড়েছে। তার ভেতরের বাষ্পকে বের করে দেবার জন্য এই রোমাঞ্চটুকু তার দরকার। সহজ কণ্ঠেই স্বীকার করে সে। এই চৌর্যবৃত্তিতে জড়ানোর কোন প্রয়োজন আলীর নেই। কাঁচা রস সে পছন্দ করে কিন্তু এতো ঝুঁকি নিয়ে রস খাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু হঠাৎই কোন এক মন্ত্রবলে তার মনে ঝুঁকির ভয়টুকু উবে গিয়ে রোমাঞ্চটুকুই প্রবল হয়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা তার না হলেই নয়।

সেই রাতে বিছানায় শুলেও দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না আলী। সগীর বলেছে সে ডর্মের বাইরে থেকে শিষ বাজাবে। দুই ডর্ম ডানে তার রুম। তার শিষ শুনলে আলীকে নিঃশব্দে উঠে বাইরে যেতে হবে। কেউ টের পেলে সর্বনাশ। এসাইনমেন্ট ভন্ডুল। ঘুমিয়ে পড়লেও সব গোলমাল হয়ে যাবে। আলীর ঘুম গভীর। দেখা যাবে শিষ বাজিয়ে সারা ক্যাডেট কলেজ জাগিয়ে দিয়েছে সগীর কিন্তু আলী তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে।

রাত একটার দিকে বাইরের বারান্দায় খুব হালকা শিষের শব্দ শুনে আলীর বুকের মধ্যে তড়াক তড়াক নৃত্য শুরু হলো। সত্যি সত্যিই কি যাবে সে? মুহূর্তের জন্য দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যায় আলী। কিন্তু পিছিয়ে যাবার আর সময় নেই। সগীরের চোখে নিজেকে ছোট করতে চায় না সে। নিঃশব্দে মশারী তুলে নীচে নামে। কেডস পরে খুট করে দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে। বাথরুমের দিকে যেতে ইঙ্গিত করে সেখানে দ্রুত ওকে পুরো প্ল্যানটা আবার বলে সগীর। টিভি রুমের ভেতর দিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওরা। হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল পর্যন্ত যাবে। দেয়ালে একটা বিশেষ স্থানে তার কাঁটায় ফোকর আছে। সেই ফোকর দিযে খুব সাবধানে ডানে যেতে হবে। তার কাছে টর্চ লাইট আছে কিন্তু টর্চলাইটের আলো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সে পারতপক্ষে জ্বালায় না।

পরিকল্পনা মাফিকই সব এগিয়ে চলে। মাঠে নেমে আলীর বুকের দুরু দুরু অনেকখানি কমে গেলো। স্বচ্ছ রাতের আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের জ্বলজ্বলে আলোর নীচে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে এগুতে নিজেকে অসম সাহসী এক যোদ্ধার মতো মনে হয়। দেয়াল টপকে যাবার ব্যাপারটা যতখানি কঠিন মনে হবে ভেবেছিলো তার সিকিভাগও হলো না। দেয়ালের ওপারে পা রাখার পর হঠাৎ করেই একটা অদ্ভুৎ অনুভূতি হলো। মুক্তি? স্বাধীনতা? আলী ঠিক বুঝতে পারে না। চুরি করতে এসে এমন খাঁচাছাড়া পাখীর মতো আনন্দে আর উচ্ছলতায় মন ভরে উঠবে এটা সে আদৌ আশা করেনি। গাছপালার আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে চারদিকটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ওরা। কাউকে দেখা যায় না। সগীর হাত দেখায়। ভয়ের কিছু নেই। সব পরিষ্কার।

অন্ধকারে দৃষ্টি সয়ে গেছে। নক্ষত্রের আলোতে বেশ পরিষ্কার দেখতে পায় ওরা। সগীর জানে কোন গাছের রস কেমন স্বাদের। সে তরতর করে একটা গাছে উঠে গেলো। একটু পরেই রসভর্তি একটা মাটির হাড়ি নিয়ে সাবধানী ভঙ্গিতে নেমে এলো। "খা।" আলীর দিকে ভাড়টা এগিয়ে দেয় সে। "ভাড়টা আবার জায়গা মতো রেখে যাবো। সকাল হতে হতে আর্ধেকটা ভরে যাবে।"

আলী বললো, "তুই খাবি না?"

"এটা তুই খা। আমি পাশের গাছটা থেকে খাবো।"

আলী গল গল করে তরল রস মুখে ঢেলে দেয়। খেজুরের রসের মাদকীয় একটা গন্ধ ওর নাকে ঝাপটা দেয়। মিষ্টি, স্বাদালু অনুভূতি ঠোঁট, জিভ, গলা, পেট বেয়ে পাকস্থলীতে গিয়ে স্থির হয়। ভালোই লাগে

আলীর। ভাড় অর্ধেকটা ভরা ছিলো। পুরোটাই খেয়ে ফেলে সে। ভাড়টা নিয়ে আবার তর তর করে গাছে উঠে যায় সগীর। জায়গা মতো ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে আসে।

দ্বিতীয় গাছে উঠে গিয়ে সেখানে বসেই রস খায় সগীর। আলী গাছের নীচে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ভয় চলে গেলেও উদ্বেগটা জাকিয়ে বসছে তার মধ্যে। প্রায় ঘন্টা খানেক হলো ডর্ম ছেড়ে বেরিয়েছে ও। কেউ যদি বাথরুমে যাবার জন্য উঠে তার শূন্য বিছানাটা দেখে কিছু একটা সন্দেহ করে বসতে পারে। ফেরার সময় কলেজের গার্ডের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে। গ্রামের পাহারাদাররাও ফিরে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারলেই সে বাঁচে। একটা অভিজ্ঞতা হবার দরকার ছিলো। কিন্তু আর নয়। সমস্যা হচ্ছে সগীরের মধ্যে কোন চিন্তার বালাই নেই। সে নিশ্চিন্ত মনে ঢক ঢক করে রস সাটছে। নীচ থেকেও তার খাওয়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ফিস ফিস করে সগীরকে ডাকতে যাচ্ছিলো আলী। আচমকা এক হুতুম প্যাঁচার বিকট ডাকে তার পিলে চমকে ওঠে। সগীর উপর থেকে বললো, "কুহু। ভয় পাস না। ঐ গাছেই থাকে।"

আলীর শরীর ছমছম করে উঠে। প্যাঁচার ডাকের সাথে নানান ধরনের অশরীরি অস্তিত্বের যোগ সাজশ অকারণেই মনের মধ্যে উঁকি দেয়। রাতের গভীরে যখন সবাই ঘুমে অচেতন তখন অশরীরি আত্মার মতো বিশাল দুই চোখ মেলে শিকার করতে হয় এই অদ্ভুত দর্শন পাখী। বুক কেঁপে ওঠার মতই।

সগীর নেমে এসেছে। ফিসফিসিয়ে বললো," এমন সিটিয়ে আছিস কেন? প্যাঁচার ডাক আগে কখন শুনিসনি?"

"এই রকম গভীর রাতে শুনিনি। চল। ফিরে যাই।"

"চল।" ফিরতি পথে গাছ পালার ঝাড়ে ঢুকে একটা অভাবনীয় কাজ করলো সে। মুখে হাত দিয়ে অবিকল হুতুম প্যাঁচার মতো ডেকে উঠলো। একবার। দু'সেকেন্ডের নীরবতার পর গাছের উপর থেকে ডেকে উঠলো কুহু। সগীরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধা হলো না আলীর। "ও আমাকে চেনে।" সগীর বললো। "ও আমার বন্ধু।"

ফিরতি পথে কোন ঝামেলা হয় না। বিছানায় শুয়ে ঘড়ি দেখে আলী। তিনটা। ভোর হতে কয়েক ঘন্টা বাকী। কাল সকালে পিটি আছে। একটু ঘুমিয়ে না নিলে সারাদিন ঢুলতে হবে। একটু আগের অভিজ্ঞতার উত্তেজনা মুছে ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে যাবার চেষ্টা করে সে। দূর থেকে ভেসে আসে প্যাঁচার

ডাক। কুহু? এই জন্যেই কি বার বার এতো ঝুঁকি নিয়ে সেখানে ফিরে যায় সগীর? অদ্ভুৎ একটা চিন্তা। কিন্তু মাথা থেকে সরাতে পারে না আলী।

বন্ধুত্বের চেয়ে বড় বোধহয় পৃথিবীতে কিছু নেই। সেই বন্ধুত্ব শুধু দুটি মানুষের মধ্যেই হবে এমন কথা কে দিব্যি দিয়ে বলেছে।

আবার ডেকে ওঠে কুহু। আবার। নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে আলী।

মোটেলে ফিরে বিশ্রাম, গোছল এবং কিছুক্ষণ আড্ডা চালিয়ে কাছেই একটা রেষ্টুরেন্টে রাতের খাবার সারলো সবাই। দেখা গেলো দলের অর্ধেকেরই কম বেশী পেটের সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া হাল্কার মধ্যে রাখা হলো। যারা হালাল ছাড়া খায় না তারা মাছ কিংবা সব্জি দিয়ে ঝটপট খাবারের পালা চুকিয়ে নিলো। আলীর প্রচন্ড ক্ষিধা লেগেছিলো। সে বেশ জাকিয়ে বসে পেট ভরে খেলো। নিশি তার গাড়ী থেকে বের হয়ে সেই যে নিজের কামরায় ঢুকেছিলো আর বেরই হয়নি। শওকত গিয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে জানতে পারলো তার মাথা ব্যথা করছে। পেটটাও ভালো না। রাতে কিছু খাবে না। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছে। তারা যেন টিসাকে নিয়ে যায়। রেষ্টুরেন্টে টিসা সবাইকে ফেলে আলীর সাথে একই টেবিলে এসে বসে। আলী মনে মনে বেশ খুশি হয়। এই পাকনি এখন গুরুতর কোন আলাপ শুরু না করলেই হয়। এতো মানুষের সামনে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সে আলাপ করতে চায় না। দেখা গেলো টিসার কান্ডজ্ঞান খুবই প্রখর। সবার অগোচরে সে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো "মা'র মন খারাপ কেন?"

"জানি না। গাড়ীতে আমার সাথে কথাই বলে নি।"

"নানুর কথা তুলেছিলে?"

"আমি তুলি নি, নিশিই তুলেছিলো।"

"নানু একদম কথা বলে না মায়ের সাথে। নানী বলে। মাঝে মাঝে। আমাকে আবার দু'জনাই খুব ভালোবাসে। অনেক কিছু কিনে দেয়।"

টিসার বন্ধুরা তাকে ওদের সাথে বসার জন্য ডাকাডাকি করছিলো। টিসা বাধ্য হয়ে উঠে যায়। মোটেলে ফিরে গিয়ে একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব করে শেষ পর্যন্ত নিশির দরজায় টোকা দেয় আলী। ভেতর থেকে নিশির বিরক্ত গলা শোনা গেলো। "জ্বালিও না। যাও।"

"ঠিক আছো তো?"

"না থাকলে কি করবে?"

"অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

"তোমাকে কোন ব্যবস্থা করতে হবে না। আমি ভালো আছি। একটু পরে বের হবো। এবার দয়া করে যাও।"

আলী সরে যায়। পুরুষেরা তিন তলার একটা কামরায় জমায়েত হয়ে দল বেঁধে তাস খেলতে লেগে গেছে। তারা অকশন ব্রিজ খেলে। একটু পর পরই তর্কাতর্কি লেগে যায়। আবার হো হো হা হা হাসির ফোয়ারা ওঠে। রাজনৈতিক আলাপও চলে, ব্যক্তিগত আলাপও চলে। সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ। আলী তাদের সাথে গিয়েই জোট পাকালো। সে তাস তেমন খেলে না। যদিও একসময় খুব দক্ষতা ছিলো। টরোন্টোতে আসা অবধি কখনই খেলেনি। তবে অন্যেরা খেললে দেখে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা মনে পড়ে। শহীদুল্লাহ হল আর ফজলুল হক হলে কত রাত জেগে তাস খেলেছে বন্ধুদের সাথে। তারপর সকাল বেলা গেছে সবাই মিলে নাস্তা খেতে। গরম গরম পরটা এবং লাবড়ি নয়তো কলিজা। এখনও সেই স্বাদ তার জিভে লেগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ঘনিষ্ট বন্ধুদের সাথেই তার বেরিয়ে আসার পর আর কখনও দেখা হয় নি। টরোন্টোতে দু'তিন জন আছে। তাদের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। দেখা হলে কথা ফুরাতে চায় না। ক্যাডেট কলেজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়কে জড়িয়েও কত অসংখ্য সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে। বন্ধুত্বের সেই বন্ধন আত্মীয়তার মতো দৃঢ়। আদর্শনে ক্ষীণ হতে পারে কিন্তু হারিয়ে যাবার উপায় নেই।

মেয়েরা পাশেই আরেকটি কামরায় জমায়েত হয়ে মহা শোরগোল তুলে দিয়েছে। তারা কি নিয়ে আলাপ করছে বোঝা যায় না। কিন্তু সারা শহর যে তাদের কল কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে পুরুষ মহলে কারোরই কোন সন্দেহ নেই। শীঘ্রই পুরুষেরা ক'দিন আগেই বিরাট গোলমাল সৃষ্টি করে হয়ে যাওয়া জি-২০ মাহাসম্মেলন নিয়ে আলাপে মত্ত হয়। এখানকার বাংলাদেশী সমাজে এখনও স্থানীয় রাজনীতির চেয়ে দেশীয় রাজনীতির আলাপই বেশী হয়। আলীর কাছে ব্যাপারটা বরাবরই বেশ

কৌতুককর মনে হয় । লিবারেল আর কনসার্ভেটিভরা চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও অধিকাংশ দেশীয়রা ফিরেও তাকাবে না । কিন্তু আওয়ামী এবং বি.এন.পির কথা উঠলেই তড়াক করে লাফিয়ে সজীব হয়ে উঠবে । জি-২০ মহাসম্মেলনের সময় টরোন্টোতে বেশ গোলমাল হয়েছিলো । পুলিশের গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় তরুণদের একটা দল । এক বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়েছিলো নিরাপত্তার জন্য । নানান শহর থেকে পুলিশ ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিলো । তারপরও ঝামেলা তেমন কিছু কম হয় নি । অনেক বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো এই অসম্ভব খরচের খতিয়ান শুনে । এমনকি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি পর্যন্ত মন্তব্য করলো, ফ্রান্সে সে এর এক দশমাংশও খরচ করবে না ।

সবাই মিলে বেশ কিছুক্ষণ হারপার এবং ফাইনান্স মিনিষ্টার কে নিয়ে পড়লো । অকারণে এতোগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করার কোন অর্থ আছে । পুলিশের গাড়ীতে আগুণ ধরিয়ে দেবার পর সেটাকে দীর্ঘক্ষণ সেভাবে আগুন জ্বলতে দেবার পেছনেও যে কোন পরিকল্পনা ছিলো তাতেও কারো কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । বিলিয়ন ডলার খরচ করবার একটা পোক্ত কারণতো জনগনকে দেখাতে হবে । হাজার হোক জনতার ট্যাক্সের টাকা দিয়েইতো এতা আগড়ম বাগড়ম ।

রাত-আরেকটু গভীর হতে খেলায় খানিকটা ঝিমুনী এলো । মেয়েমহল থেকে গান বাজনার শব্দ আসতেই পুরুষেরাও একেএকে সেই আসরে গিয়ে যোগ দিলো । বেলী বেশ ভালো আধুনিক গান গায় । সে খালি গলাতেই পরপর কয়েকটা গান শুনিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো । গানের শব্দে নাকি ভালো বোধ করছিলো বলে নিশি গুটি গুটি পায়ে ওদের আসরে যোগ দিলো । মামা ওকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠলো । "নিশি কিন্তু দুর্দান্ত গান করে ।" নিশি চোখ মটকালো । "বাজে কথা বলবে না, মামা ।"

মামীও আব্দার ধরলো, "গাও না । লজ্জা পাচ্ছো কেন?"

এই কথার পরে ভাবীদের দলটা ওর উপর সওয়ার হলো । নিশি বাধ্য হয়ে রাজী হলো । বহু বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিশি গান গাইতো । তার অনুরোধে আলী একটা গানও লিখে দিয়েছিলো । আশ্চর্য হলেও সত্য গানটা খুব বাজার পেয়েছিলা । আজ এতো দিন পর সেই গানের প্রথম কয়েকটি চয়ন ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না আলীর । নিশি মাথা নীচু করে নীচু গলায় গান ধরতেই সুরটা চিনতে তার কষ্ট হয় না । কদিন আগে ডওস রোডের অনুষ্ঠানে এই গানটাই গেয়েছিলো । এক মুহূর্তের মধ্যে বহু বছর আগে ফেলে আসা এক ঝাঁক ছেলেমানুষী অনুভূতির ঝাঁক ওর সমস্ত অস্তিত্বে ঝাপটা মেরে যায় ।

মন বলে কিছু নেই, আছে শুধু যাতনা

ভালোবাসার কথা বলো, অভিমান বোঝো না

মন বলে কিছু নেই.....

নীল শাড়ী পরে আমি বসেছিলাম বাতায়নে

প্রতীক্ষাতে ছিলাম তুমি আসবে কখন ও পথ ধরে

চলে গেলে আপন মনে, কোথায় আমায় খুঁজে এলে

মনটা আমার থাকলো একা, কোথায় তোমার মন হারালে

মন বলে কিছু নেই আছে শুধু যাতনা

দু'চোখে তারার আলো মনে চাঁদ হাসে ওগো

তোমাকে কত বলি কাছে এসো কাছে এসো

ভাবুক তুমি ভুল পথে যাও চলে একলা মনে

কত আর থাকবো বসে তোমার পথ চেয়ে চেয়ে

চোখে চোখ রেখেও তুমি আমায় দেখো না

মন বলে কিছু নেই.....

নিশির কণ্ঠে যেন যাদু ভর করে। এতোগুলি মানুষ নিস্তব্ধ, নির্বাক হয়ে ওর গান শোনে, ওর কণ্ঠের লালিত্যের সাথে বেদনার অপূর্ব সংমিশ্রণ হৃদয়কে দুলিয়ে যায়। মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা পুঞ্জীভূত দুঃখের রাশি উপচে বেরিয়ে আসে। কারো কারো চোখের কোণ ভিজে ওঠে পুরানো দিনের কথা ভেবে। যৌবনের সেই প্রেমময় দিনগুলো। বাতাসে যেন সুগন্ধ লেগে থাকতো। অচেনা রমণীর চঞ্চল কেশের ঝাঁকে অচিরেই মন হারাতো। পুরুষদের দৃষ্টি রোমান্টিক হয়ে ওঠে। নিশি গান শেষ করে চোখ তুলে সরাসরি আলীর দিকে তাকায়। ওদের দৃষ্টি পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়। নিশির এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে তার কষ্ট হয় না। এই দৃষ্টি ধিক্কারের, কষ্টের ভৎসর্নার। কাপুরুষ! আলী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে । মানুষ ভাবে একরকম আর ঘটনার প্রবাহ তাকে নিয়ে দাঁড় করায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। সেই সব কথা ভাবতেও হৃদয় মুচড়ে ওঠে আলীর।

গান শেষ হতে সবার হাত তালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। এক যোগে অনুরোধ ওঠে আরেকটা গান গাইবার। কিন্তু নিশি নীরবে মাথা নেড়ে আসর থেকে বেরিয়ে যায়। সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে অন্ধকার পার্কিং লট পেরিয়ে পেছনের নির্জন পথে পা রাখে। আলীকে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে ধমকে ওঠে শিলা। "হা করে তাকিয়ে কি দেখছেন? যেতে পারছেন না? অন্ধকারে একা যাচ্ছে? আশ্চর্য!"

সম্মিলিত কণ্ঠের ধমকানীতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিশির পিছু নেয় আলী। পাশের আরেকটা কামরাতে বাচ্চারা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে। এইসব নাটকে তাদের কোন আগ্রহ নেই। টিসার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সে টের পেয়ে দৌড়ে না এলেই হয়। তার সামনে মন খুলে কোন কথাই বলা যায় না। আলী হাঁটার গতি বাড়ায়। নিশি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ম্যাকডোনালসে এখনও আলো জ্বলছে। সেদিকেই যাচ্ছে নিশি। হঠাৎ এই খামখেয়ালীপনার কারণটা পরিষ্কার হলো না।

আলী তার সঙ্গ ধরতে সে আড় চোখে তাকালো। "গান কেমন হয়েছে?"

"দারুন। আমারতো পুরো গান মনেও নেই ।"

"আমি সহজে কিছু ভুলি না। অভিশপ্ত স্মৃতি। সবকিছু মনে থাকে।"

দু'জনে কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটলো।

"কফি খাবে?" আলী জানতে চায় এক পর্যায়ে।

"একটু হাঁটতে ইচ্ছে হলো। মনটা ভালো নেই। হঠাৎ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে। অসুস্থ। হার্টের অসুখ। কখন কি হয়। তবুও আমার সাথে কথা বলবে না।"

রেষ্টুরেন্টে ঢুকে দু'কাপ কফির অর্ডার দেয় নিশি। নিজেই দাম মিটিয়ে দেয়। তাকে দেখে চিন্তিত, মগ্ন মনে হয়। আলী চুপচাপ থাকে। ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। কফি নিয়ে এক কোনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে দু'জন। নিঃশব্দে কয়েকবার কাপে চুমুক দেয় নিশি।

"কাজটা তুমি ঠিক করনি। একদম নয়। পালিয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না।" নিশি আপনমনেই বিড়বিড়িয়ে ওঠে।

আলী জানে নিশি কোন্ প্রসঙ্গ টানছে। সে কোন উত্তর দেয় না। নিশি আবার বললো। "সব দোষ তোমার। সব। তোমার জানা দরকার। ভেবেছিলে চোখের আড়ালে চলে গেলেই সব সমস্যা শেষ হয়ে যাবে। যায় না। কোন সমস্যাই শেষ হয় না। সমস্যার সমাধান করতে হয়।"

এতো কাল পরে সেই পুরানো কথায় ফিরে যেতে চায় না আলী। যা হবার হয়ে গেছে। জীবন বয়ে গেছে আপন গতিতে। সেই সব কথা তুলে লাভ কি?

নিশি হঠাৎ কঠিন দৃষ্টিতে ভস্ম করতে চায় ওকে। "জানো, কেন বাবা আমার সাথে কথা বলে না? কেন আমি কাছে গেলে ফিরেও তাকায় না?"

আলী জানে না। জানাটা কি দরকার? সে নিশ্চিত নয়।

নিশি ক্ষ্যাপা গলায় বললো, "বলবো না। তোমাকে বলে কি লাভ? রুম থেকে বাবাকে ফোন করেছিলাম। মা কথা বললো। বাবার হাতে দিতে লাইন কেটে দিলো। আমার ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। সব দোষ তোমার।"

আচমকা একটা অদ্ভুৎ কাজ করে নিশি। কফির কাপ তুলে আলীর শরীরে অনেকগুলো কফি ঢেলে দেয়। গরম কফি গড়িয়ে আলীর শার্টে, প্যান্টে পড়ে, নগ্ন চামড়ায় উষ্ণতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে জুতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। আলী নড়ে না। এটা হয়তো তার পাওনা ছিলো।

নিশি দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। "আমি সবাইকে শুধু কষ্ট দেই। আমাকে কেউ চায় না। কেউ না।"

কম বয়সী একটা মেয়ে কাজ করছিলো। সে অনেকগুলো ন্যাপকিন নিয়ে দৌড়ে এলো। আলী তার হাত থেকে ন্যাপকিনগুলো নিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। মেয়েটি অবাক চোখে নিশিকে দেখলো। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলো না। আলী ন্যাপকিনগুলো হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বসে থাকে। নিশি অচিরেই নিজেকে সামলে নেয়। ওর হাত থেকে ন্যাপকিনগুলো নিয়ে যতখানি সম্ভব মুছে দেয় তরলীয় ছাপ। "চলো ফিরি। আমার পিছু নেবে আর। সুন্দর জামা-কাপড়গুলোর বারোটা বাজলো।"

আলী নীচু গলায় বললো, "আমার সময়ও এমন কিছু ভালো কাটে নি। বিয়ে করলেও সংসার হয় নি। সব ভাসা ভাসা। ধরা যায় না। ছোঁয়া য়ায় না।"

"ভালো। খুব ভালো । শুধু আমি একাই কষ্ট পাবো কেন? "

হাতের ভেজা ন্যাপকিনগুলো ট্র্যাস ক্যানে ফেলে ফিরতি পথ ধরে নিশি। আলী পিছু নেয়। "রাগ পড়েছে?"

"না।" বাকী পথটুকু আর কোন কথা হয় না।

১৭

বানু খুব নাটক করে আলীকে তার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য করেছে সে ক্যাডেট কলেজে পড়াশুনা ছাড়া আর কিছু করবে না। বছরখানেক পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা বানুর অনেক আশা আলী ভয়াবহ একটা রেজাল্ট করবে। শুধু ষ্ট্যান্ড করাই যথেষ্ট নয়। প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকতে হবে। মায়ের স্বপ্নভঙ্গ হোক আলী চায় না। কিন্তু নিজের উপর তার তেমন ভরসা নেই। পড়াশুনায় সে মন্দ নয়। কিন্তু একেবারে প্রথম সারির নয়। হতে চায়ও নি। ইদানিং লেখালেখিতে ভয়ানক আগ্রহ বোধ করে। গান, কবিতার পাশাপাশি গল্প-টল্প লেখার চেষ্টা করে। সাহস করে কাউকে দেখায় না। কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখে বিখ্যাত লেখক-টেখক জাতীয় কিছু হবার। মাকে এসব বলে না। শুনলে হয়তো ভড়কেই যাবে। ছেলে পড়াশুনা বাদ দিয়ে হাবি জাবি লিখছে জানলে তার হার্ট এটাক হয়ে যেতে পারে।

সময় কেটে গেছে দ্রুত। বেশ কয়েকটি জুনিয়র ক্লাশ এসেছে। বয়স কিঞ্চিৎ বেড়েছে। পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। এখনও ক্যাডেট জীবন খুব পছন্দ করে তা নয়। কিন্তু প্রথম দিকের সেই অনীহা এবং বন্দীত্বের অনুভূতি আর নেই। চার দেয়ালের মাঝে থেকেও নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখার মতো এক হাজার একটা উপায় বের করা যায়। আলী নিজেকে সব কিছুতে জড়ায় না। চেষ্টা করে ঝামেলা বাঁচিয়ে চলতে। অন্যরাও জানে সেটা। সব কিছুতে আলীকে ডাকা হয় না। দুই সহপাঠিকে সমকামীতায় হাতে নাতে ধরে ফেলে দল বেঁধে পেটানো হলো। আলী সেই খবর জানলো সপ্তাহ খানেক পরে। জুনিয়র পেটানোর ব্যাপারটাও বেশ জলভাত হয়ে গেছে। কেউ বেয়াদপি করলেই ডাক পড়ে, চড় থাপপড় কিল চলে। সেভেন-এইটে থাকতে কয়েকবার সেই ভীতিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে আলী। একদল সিনিয়রের মাঝে ইঁদুরের মতো দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার মধ্যে শুধু শারীরিক ব্যথা নয়, মানষিক নির্যাতনটাও অসহনীয়। সে নিজে জুনিয়রদেরকে শাসন-টাসন করা থেকে বিরত থাকে। সেই জন্যে বহু প্রিফেক্ট এবং নেতা গোছের সিনিয়ররা আছে। অধিকাংশ জুনিয়ররাই তার এই আলগা ভাব পছন্দ করে। তাকে নিয়ে ভয়

পাবার কিছু নেই বোঝে। কেউ কেউ হয়তো এটাকে দুর্বলতা হিসাবেও দেখে। আলী বোঝে কিন্তু মাথা ঘামায় না।

ছুটিতে নিশির সাথে দেখা হয়েছে। সেলাইয়ে তার হাত খুব পেকেছে। রুমাল ছেড়ে সে এখন সালোয়ার-কামিজে হাত দিয়েছে। তার মনে হয় লজ্জাও আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। আলীকে দেখলে সে এখন রক্তিম হয়ে ওঠে। কথাবার্তা অল্পই হয়। তবে নিয়মিত চিঠি লিখে যায় সে। ইদানিং আলী জমিয়ে রাখে। ছেলেমানুষী চিঠি। সাধারণত ছোট খাটো ঘটনা নিয়ে লেখা। প্রথম দিকে রুবীর কথা কিছু থাকতো। ধীরে ধীরে রুবী একেবারেই বাদ পড়ে গেছে। ডজন খানেক জমেছে। কাউকে দেখাতেও পারে না। ফেলে দিতেও পারে না। রুবীর সাথে খুব কমই দেখা হয়। লাবলূর সাথে তার হৃদ্যতা নাকি বেশ বেড়েছে। তবে তার আরও কয়েকজন অসমবয়সী বন্ধু হয়েছে। সকলেই যুবক, বিত্তবান। রুবীর পছন্দ বুঝতে অসুবিধা হয় না। আলীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় হৃদয়ের গভীরে ওর জন্য রুবীর দুর্বলতা আছে। কিন্তু বছর ঘুরে গেছে। তার কোন ইঙ্গিত সে পায়নি। পথে ঘাটে দেখা হলে হেসে হাত নেড়েছে, তার বেশী নয়। কখন মনে হয় সে যেন ইচ্ছে করেই আলীকে অবহেলা করে। তাকে ছোট করতে চায়।

গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে কলেজে ফিরবার মাসখানেক পরেই হঠাৎ বানু প্রথম বারের মতো তার কলেজে এসে হাজির হলো। মাকে এমন অযাচিতভাবে সেখানে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে আলী। কোন দূর্ঘটনা ঘটলো কি? দেশের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। কদিন আগেই, মে মাসে চট্টগ্রামে সার্কিট হাউসে জিয়াউর রহমানকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে টলমল অবস্থা। সবখানেই তার কম বেশী প্রকোপ পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। কেউ কি এই সুযোগ নিয়ে বানুকে উত্যক্ত করছে? আলীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। দুনিয়া জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে সে। কিন্তু বাস্তবে বানুর মুখে যা শুনলো সেটা খুবই অভাবিত। এতোদিন পর হঠাৎ এমন একটা কিছু শুনবার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না।

ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে আলীকে সঙ্গী করে সাতক্ষীরাগামী একটা বাসে উঠে বসে বানু। যশোর হয়ে সাতক্ষীরা যাবে। সাতক্ষীরা শহর থেকে আরোও মাইল বিশেক দক্ষিণে গেলে কালিগঞ্জ । সেখানেই তাদের গন্তব্য। আলী জানে তার নানুরা সেখানে বাস করে। নানু গত দশ বছরে হয়তো বার দুই-তিন এসেছেন। বানুর সাথে সে একবারই নানু বাড়ীতে যায়। নানীর

মৃত্যুর পর। দাদুর কথা সে কিছুই জানে না। কৌতুহল হয়েছে কিন্তু জিজ্ঞেস করে বানুকে অকারণে ক্ষেপিয়ে দিতে চায় নি। এসব না জানলেও তার জীবন থেমে থাকে নি।

বাসে থমথমে মুখে বসে থাকে বানু। আলী দ্বিধা-দ্বন্দের দোলায় দুলতে দুলতে চুপ করে থাকারই সিদ্ধান্ত নেই। বানুর যখন সময় হবে সে নিজেই খোলাসা করে বলবে। প্রিন্সিপালকে জানানো হয়েছে আলীর বাবার সঙ্গীন অবস্থা। বড়সড় হার্ট এটাক হয়েছে। বাঁচা মরার ঠিক নেই। আলীকে দেখতে চায়। তার যে বাবা আজও বেঁচে আছে সেটাই জানা ছিলো না আলীর।

কালিগঞ্জ পৌছাতে গোধুলী বেলা হয়। নদী পেরিয়ে একটা ভ্যান রিক্সা নেয় ওরা। ব্যস্ত হাটের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যায় ভ্যান । বানু ঘোমটা মুড়ি দিয়ে ছইয়ের নীচে আড়ষ্ঠ ভঙ্গীতে বসে থাকে। কেউ কেউ কৌতুহলী দৃষ্টি ফেলে বারে বারে ফিরে চায়। মুখখানা তাদের কাছে নিশ্চয় পরিচিত লাগে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেও বসে, "কে যায় গো?"

বানু কোন উত্তর দেয় না। তখন লাগোয়া প্রশ্ন আসে, "কোন বাড়ী যাও রিক্সায়ালা?"

তরুণ রিক্সাওয়ালা জবাব দেয়, "মীর্যা বাড়ী।"

"ওহ, মীর্যা বাড়ী। ছোট মীর্যারতো যখন তখন অবস্থা। যাও যাও।

কিছু পিচ ঢালা আর কিছু মেঠো পথ পেরিয়ে নদীর পাশে চারদিকে ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিশাল এক লাল দালানের সামনে এসে দাঁড়ায় ভ্যান রিক্সা। বানু তরুণ রিক্সায়ালার হাতে ভাড়ার টাকা গুনে দিয়ে নরম গলায় বলে, "বাবা, একটু দাঁড়াও। আমাদের ফিরে যেতে হতে পারে।"

"ঠিক আছে আপা। দাঁড়াবো।" ছেলেটা গামছা দিয়ে মুখ, মাথা মুছতে মুছতে একটা গাছের নীচে হাটুমুড়ে বসে। বানু আলীর হাত চেপে ধরে বিশাল গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। লম্বা মোচয়ালা বিশালদেহী দারোয়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করে।

"ভাবীসাব?" তার কণ্ঠে স্পষ্ট বিস্ময়।

"গেটটা খোলো, বিমল দা।" বানুর কণ্ঠে মিনতি।

বিমল দারোয়ান কয়েকটা মুহুর্ত থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বিস্ময় কাটতে বলে, "মীর্যা সাবকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে ভাবীসাব। নইলে আমার চাকরী খতম হয়ে যাবে।"

"ওনার অবস্থা কেমন এখন?" বানুর কণ্ঠে উদ্বেগ।

"ভালো না। এখন তখন অবস্থা। কথা নাই। কিছু খাইতে পারেন না। ছোট মীর্যা সাবে হয়তো বাঁচবে না। ভালো করছেন, আসছেন। আমি মীর্যা সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি। উনি অনুমতি দিলে দরজা খুলে দেবো।"

বিমল দারোয়ান দৌড়ে লাল দালানের ভেতরে ঢোকে। বেশ কিছু ছেলে মেয়ে এবং কয়েকজন ঘোমটাধারী মহিলা মুহূর্তের মধ্যে সামনের উঠোনে এসে হাজির হয়। গভীর আগ্রহ নিয়ে ওদেরকে পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মধ্যে থেকে বারো তের বছরের একটা মায়াময় চেহারার মেয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে। "তুমি বানু মা?"

বানু মাথা নাড়ে। "তুমি কে?"

"আমি কলি।" মেয়েটি গভীর আগ্রহ নিয়ে আলীকে পর্যবেক্ষণ করে। "

"আলী। তোমার ভাই।"

"জানি।"

আলীর সাথে তার চোখাচোখি হয়। উজ্জল এক জোড়া চোখ। সেখানে কৌতুহল ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তাদের চেহারায় মিল আছে। বুঝতে পারে আলী। কলি বিষন্ন হয়ে ওঠে মুহূর্ত পরেই। "দাদু তোমাদের ঢুকতে দেবে না। তোমাদের নাম শুনলেও সে ভয়ানক ক্ষেপে যায়।"

"কেন?" প্রশ্নটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই করে ফেলে আলী।

"তোমার জানতে হবে না।" ধমকে ওঠে বানু। "আমরা এসেছি তোমার বাবাকে শেষ দেখা দেখতে। দেখা হলে চলে যাবো। এইসব কিছু জানার কোন দরকার নেই।"

কলি বললো, "আমি কিছু জানি না। কেউ কিছু বলে না। কতবার আলী ভাইয়ের ঠিকানা চেয়েছি। কেউ দেয় না। এবার দেখা হয়ে গেলো। খুব ভালো হলো। আমার নাম কলি। ভুলে যেও না আমাকে।"

বিমল দারোয়ান মলিন মুখে ফিরে এলো। মাথা দোলালো সে।

"সটান না করে দিলো। চলে যাও ভাবীসাব। উল্টো পাল্টা কথা বলছে। গুলী-টুলি করবে নাকি। চলে যাও। কলির মা তোমাকে দেখতে চায়। সে তোমাকে খবর দেবে। মীর্যা সাব বন্দুক বের করতে গেছে। তুমি চলে যাও। এই রিক্সাওয়ালা, জলদি ওঠ"।

বানু সময় নষ্ট করে না। দ্রুত ভ্যানে উঠে বসে আলীকে নিয়ে। "হেডমাষ্টারের বাড়ী চলো।"

ভ্যানচালক আর কোন প্রশ্ন করে না। আলী বুঝতে পারে তার নানুর বাড়ীর দিকে চলেছে। তার নানু শিক্ষক মানুষ, সে জানে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকদের বেশ পরিচিতি থাকে। মিনিট পনেরো পরেই ছোটখাটো একটা দোচালা ভিটা-বাড়ীর সামনে এসে ভ্যান থামলো তরুণ চালক। ভিটে-বাড়ীর পাশের গোয়ালে চার-পাঁচটা গরু জাবর কাটছে। ছোটখাটো উঠোনে হারিকেন জ্বালিয়ে কিছুটা আলোকিত করা হয়েছে। একজন বয়স্ক মহিলা উঠোনে কাজ করছিলো। বানুকে দেখেই সে জমে গেলো। "বানু?" কাঁপা কণ্ঠে ডেকে উঠে সে।

"হ্যাঁ ফুপি।"

"কেন এলি? মীর্যা সাহেব তোকে কখনো ওবাড়ীতে ঢুকতে দেবে না।"

"গেছিলাম। ঢুকতে পারি নি।"

বয়েসী মহিলাটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জরিপ করে। "কতদিন পরে দেখলাম। ভালো আছিস? আয়। ভেতরে আয়। তোর বাবা গেছে হাটে। চলে আসবে। একা মানুষ। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাই । "

একটু পরেই ফিরে আসে হেডমাষ্টার সাহেব। মেয়েকে দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয় না সে। যেন জানতই বানু আসবে। তবে আলীকে দেখে সে একটু অবাক হয়। "ওকে আনবি ভাবি নি।"

"বাবার সাথে ওর দেখা হবে না?"

"কেমন করে হবে ? মীর্যা সাহেব বেঁচে থাকতে মনে হয় না ছোট মীর্যার কাছে যেতে পারবি।"

"বেঁচে তো আছে এখনো?"

"আছে। গেছিলাম দেখতে। আমার যেতে নিষেধ নেই।"

"কলির মা কেমন মেয়ে?"

"ভালো। বড় ঘরের মেয়ে। দূর গ্রামের; কিন্তু বড় গেরস্থ। তোকে দেখতে চায় সর্বক্ষণ।"

"বিমল দা বললো সে আমাকে ঢুকতে দেবে। ব্যবস্থা করবে বাবা? আলী ওর বাবাকে একবারের জন্যও দেখবে না সেটা কি করে হয়? "

"আচ্ছা দেখি। খবর দেবো।"

একটাই ঘর। নানুর সাথে বিছানায় শোয় আলী। বানু তার ফুপির সাথে মেঝেতে মাদুর পেতে শোয়। হেডমাষ্টার নানু কিছু পরেই নাক ডাকাতে শুরু করে। আলী ঘুমাতে পারে না। এতো বছর পর হঠাৎ এই অযাচিত ঘটনাস্রোত তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ চমকে দিয়েছে। বাবাকে দেখার কখনও কোন আগ্রহ হয় নি তা নয়। কিন্তু এতো কাছে এসে না দেখে ফিরে যেতে হলে আফসোস থেকে যাবে। বানু এবং ফুপি অনেকক্ষণ নীচু গলায় আলাপ করে। ঝগড়া, অভিমান, কান্না সবই চলে। এক পর্যায়ে দু'জনাই ফুঁপিয়ে কাঁদে। আলী তাদের সংলাপ সব বুঝতে পারে না। কিন্তু এটুকু ধরতে পারে ফুপির উপর বানুর রাগ আছে । তাকে এতো বছর একবারের জন্যেও দেখতে না যাবার জন্য বানু তার উপর ক্ষীপ্ত। একসময় নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে আলী।

গ্রামের ঝকঝকে সকাল দেখে মুগ্ধ হলো আলী। পাখ-পাখালীর কলকাকলীতে মুখরিত চারদিক। মানুষজনের চলাচল, হাঁক-ডাক শোনা যায় কিন্তু তাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোন বিঘ্ন ঘটে না। হেডমাষ্টারের ভিটে-বাড়ি মুল সড়ক থেকে কিছু দূরে, পাচিল দিয়ে একাংশ ঘেরা। এক পাশে মাটির দেয়াল ঘেরা ছনের চালের রান্নাঘর। আলীকে নিয়ে সেখানেই ঘাপটি মেরে বসে থাকলো বানু, তার ফুপির সাথে রান্নাবান্নায় মাঝে মাঝে হাত লাগালো। সে কারো সাথে দেখা করতে চায় না, আলীকেও কারো মুখোমুখি হতে দিতে চায় না। আলী গ্রামের রাস্তা ধরে হাটতে হাটতে হাটে যেতে চেয়েছিলো, মায়ের কড়া ধমকে একেবারে চুপসে গেছে। মায়ের মতিগতি তার কাছে একেবারেই পরিষ্কার হয় না।

হেডমাষ্টার নানু মীর্যা বাড়ীতে কলির মায়ের সাথে আলাপ করার জন্য ক্ষেতমজুরদের একজনকে পাঠিয়ে ছিলো। সে ফিরলো দুপুর পেরুতে। খবর ভালো। কলির মা দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে যেতে হবে সন্ধ্যার পর। মীর্যা সাহেবের চোখে ছানি পড়েছে। রাতে খুব একটা ভালো দেখেন না। বয়সও হয়েছে। তাড়াতাড়িই বিছানায় চলে যান। স্বামীকে দেখতে যাবার সেটাই মোক্ষম সময় বানুর।

সন্ধ্যা পেরিয়ে আঁধার আসতে হেডমাষ্টার নানুকে সঙ্গী করে তারা দু'জন বেশ ঘূর পথে নদীর ধারে ঘন করে গজিয়ে ওঠা কাশ বনের ঝাড় পেরিয়ে মীর্যা বাড়ীর পেছনের দরজায় হাজির হয়। দু'বার কড়া

নাড়তে নিঃশব্দে দরজা খুলে যায়। ধবধবে ফর্সা, ত্রিশ বত্রিশ বছরের সুন্দর একজন মহিলা দরজা খুলে দেয়। তাদের দু'জনকে কৌতুহল ভরে নিরীক্ষণ করে। তার পেছনে কলি। আলীকে দেখে তার মুখ হাসিতে ভরে যায়। আলীর লজ্জাই লাগে। তার যে একটা বোন আছে সে ব্যাপারে তার কোন ধারনাই ছিলো না। তার চেয়েও বড় কথা, কলির ব্যবহারে মনে হচ্ছে সে তাকে জনম জনম ধরে চেনে।

"এসো বুবু।" সুন্দর মহিলাটি বানুর হাত ধরে ভেতরে ঢোকায়। "আসো আলী। লজ্জার কিছু নেই। এটা তোমারও বাড়ী।"

বানু ভীতচকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। "উনি ঘুমিয়েছেন?"

"আব্বার শরীরটা ভালো নেই। তোমাকে দেখার পর থেকেই খুব উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। ডাক্তার এসেছিলো। ঘুমের অষুধ দিয়ে গেছে। অল্প কিছু খেয়ে সেই বড়ি খান দুয়েক খেয়ে বিছানায় গেছেন। অনেকক্ষণ ধরেই মড়ার মতো ঘুমাচ্ছেন।"

"আর ও কেমন আছে?" বানু কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

মহিলাটির মুখের হাসি মুছে যায় নিমেষে। "ভালো না। বেশী সময় বাকী নেই বুবু। কিন্তু তার তো অবস্থা বহুদিন ধরেই মন্দ। চিকিৎসা করানো হয়েছে। ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোন লাভ হয় নি।"

"একটু দেখতে পারবো, বুবু? একবার?" বানুর কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ে।

"একশ বার। সে তো তোমারও স্বামী। রাগ করে দূরে ছিলে তাতে কি? আসো। আমার সাথে আসো।" মহিলা লম্বা বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকে। বানু আলীর হাত শক্ত করে চেপে ধরে তার পিছু নেয়। কলি সবার পেছেনে। পিছু তাকাতেই চোখাচোখি হয়। হাসির ঝলকটুকু চোখে পড়ে। এমন নির্মল ভালোবাসা নিয়ে তার দিকে এর আগে কোন মেয়ে তাকায়নি। তার খুব ইচ্ছে হয় কলিকে সুন্দর কিছু বলে। কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারে না। কিছু বলাও হয় না। শুধু মুচকি হাসে। কলি ফিসফিসিয়ে বলে, "ভাইয়া, তুমি একেবারে বাবার মতো হাসো।"

মীর্যা বাড়ীর যে একসময় অনেক জৌলুশ ছিলো বোঝা যায়। পনেরো বিশ কামরার দোতলা ইটের দালান। এই এলাকায় এখন কারো এতো বড় বাড়ী নেই। বিশাল উঠোনে সাত-আটটা গোলা। বারান্দা ঘেষে দাঁড় করানো মটর সাইকেল। তবে সমস্যা একটাই, সব কিছুই পুরানো। বয়সের ছাপ পড়েছে

সবখানে। দালানের ইট খসে পড়ছে এখানে সেখানে, সারানো হয় নি। গোলাগুলোর কিছু সারাই করা প্রযোজন। মটর সাইকেলের দৈন্য দশা।

বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ঘরের বন্ধ দরজা সতর্কভাবে খুলে প্রায় নিঃশব্দে ভেতরে পা রাখে কলির মা। হাতছানি দিয়ে ওদেরকে ডাকে। আলীর বুকের মধ্যে অকারণেই হাতুড়ির বাড়ি পড়তে থাকে। এই মুহূর্ত কখনও আসবে সে ভাবেনি। মাঝারি আকারের কামরার মধ্যে কাঠের বিশাল আলমারী, রাজকীয় প্রশস্ত এবং উঁচু খাট, হাতের কাজ করা মেহগনি কাঠের চেয়ার-টেবিল। খাটের মাঝখানে একজন অস্থিসার মানুষ দুর্বল ভাবে শুয়ে ছিলো। ওদেরকে ঢুকতে দেখে সে ধীর গতিতে ফিরে তাকালো। তার দৃষ্টি আবদ্ধ হলো প্রথমে বানুর উপর, পরে আলীর উপর এবং সেখানেই আটকে থাকলো। আলী কি করবে বুঝতে পারে না। এমন একটি কংকাল দেখবার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। চেহারা দেখলে বোঝা যায় লোকটি একসময় বেশ লম্বা ছিলো, চেহারায় জৌলুশ ছিলো। আজ কোটরাগত চোখ আর থোবড়ানো গালে তাকে বৃদ্ধই মনে হয়। "আয় বাবা। আমার পাশে বয়।" আলীকে ম্লান কণ্ঠে ডাকে লোকটি। আলী যায় না। বানু ইঙ্গিতে তাকে যেতে বলে। আলী যায় না। জানা নেই। শোনা নেই। ঝট করে কি এতো কাছের মানুষ হওয়া যায়।

"যাও বাবা, যাও। উনি তোমার হাতটা ধরতে চান।" কলির মা নরম গলায় বলেন। এবার আর উপেক্ষা করতে পারে না আলী। দু'পা এগিয়ে খাটের পাশে দাড়ায়। লোকটি দূর্বল একটা হাত বাড়িযে তার হাত ধরে, তার চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নামে।

কলির মা নরম গলায় বলে, "কেঁদো না। কান্নার কিছু নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

লোকটি ভেজা কণ্ঠে বলে। "বানু, তুই ফিরে আয়। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা মেনে নেবে। চলে আয় তুই।"

"সে কথা থাক। তুমি আমাকে মাফ করেছো কিনা তাই বলো। বলো মাফ করেছো। বলো।" বানু জোর দিয়ে বলে।

"করেছি। অনেক আগেই করেছি। আমার দোষ। তুই অন্যায় কিছু করিস নি। সব আমার দোষ। আমার ক্ষমা নাই।"

কলির মা শান্ত কণ্ঠে বললো, "আল্লার কাছে সবার ক্ষমা আছে। তুমি শান্ত হও। দেখো, আলী তোমার মতই হয়েছে। হাসলে একদম তোমর মতো লাগে। নারে কলি?"

কলি একগাল হাসি নিয়ে মাথা নাড়ে - হ্যাঁ।

বিমল দারোয়ান দরজার সামনে এসে দাড়ায়। "মীর্যা সাব নড়াচড়া করছেন। অষুধের ভাব মনে হয় কেটে যাচ্ছে। টের পেলে খুব কেলেংকারী হবে। কি করবেন কে জানে।"

"আমরা এখুনিই চলে যাবে।" বানু ব্যস্ত কণ্ঠে বলে। "বাবা-ছেলেতে অন্তত একবারের জন্য দেখা করাতে চেয়েছিলাম। সেটা হয়েছে। এবার শান্তিতে মরতে পারো আলীর বাবা।"

লোকটি অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললো, "এখনও তোর রাগ পড়েনি, বানু। আর কতকাল রাগ পুষে রাখবি?"

"রাগ নেই। মন নেইতো রাগ কোথা থেকে থাকবে। যাই আমরা। ভালো হয়ে যাবে তুমি।"

"যদি ভালো হই, তোদেরকে দেখতে আসবো?"

"না।" কঠিন কণ্ঠে ঝট করে উত্তর দেয় বানু। "আর ঝামেলা বাড়িও না। ভালো হলে ভালো। কিন্তু আমার জীবনে যন্ত্রণা বাড়াবে না। চল আলী। আজ রাতেই ফিরতে হবে। কাল সকালে তোকে কলেজে নামিয়ে দেবো। আলী ক্যাডেট কলেজে পড়ে। অনেক বড় হবে। স্ট্যান্ড করবে। ঠিক স্ট্যান্ড করবে। অনেক ভালো মাথা।"

কলি চোখমুখ উজ্জল করে বললো, "ভাইয়া স্ট্যান্ড করবে। আমি জানি। আমি সবাইকে মিষ্টি বানিয়ে খাওয়াবো।"

আলী হেসে ফেলে। বানু তার হাত চেপে ধরে দ্রুতপায়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। "বিমল দা, একটা ভ্যান ডাকো তো। এখনও বাস চলছে।"

বিমলদা চলে যায় হন্ত দন্ত হয়ে। কলির মা বললো, "বুবু, তোমার বাবার সাথে দেখা করে যাবে না?"

"দেখা হয়েছে। আর দেখা হবার দরকার নেই। বাবা আমাকে পৌছে দিয়ে ফিরে গেছে। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। এখন যেতে হবে। আজ রাতেই যেতে হবে।"

সেই রাতে ভ্যান গাড়ী পাওয়া গেলো না। মীর্যা সাহেবের ঘুম ভাঙার উপক্রম হতে বিমল ওদেরকে পথ দেখিয়ে হেডমাষ্টারের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলো। বিদায়ের আগে কলির মা বললো। "আবার আসবে না বুবু? ও মরে গেলে কি হবে বুবু? বড় একা হয়ে যাবো। আর রাগ করে থেকো না।"

বানু নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সে আসবে না।

কলি হাত নেড়ে বিদায় দেয়। "ভাইয়া, আমি চিঠি লিখবো। জবাব দিও। দেবে তো?"

আলী নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। দেবো।

পরদিন ভোরবেলা কাক পক্ষী ডাকার আগে নদী পার করে তাদের দু'জনকে বাসে তুলে দিয়ে গেলো বানুর বাবা। বাসে দীর্ঘক্ষণ কোন কথা হয় না। শেষে নীরবতা ভাঙে বানুই। "বাচঁবে না। অবস্থা ভালো না।"

"আমার কি আরোও ভাই বোন আছে?" হঠাত জানতে চায় আলী ।

"আছে। ছোট মীর্যার আরেক বউ আছে । তার চার পাচটা ছেলেমেয়ে । বাপের বাড়ী থাকে । ভুলে যা ওসব। ভালো করে পড়। বড় হবি। অনেক বড় হবি। এসব কিছু না।"

আরোও অনেকক্ষণ নীরবতার পর আলী জানতে চায়। " কি হয়েছিলো মা? বলবে আমাকে?"

"কিছু হয় নি।" ফুঁপিয়ে ওঠে বানু। "বলেছি না এসব নিয়ে ভাববি না। বাবাকে চোখের দেখা দেখেছিস। ব্যস। ও পর্ব চুকে গেলো। কি হয়েছিলো, না হয়েছিলো এসব জেনে কি লাভ?"

তারপর আর আলাপ জমে না। ক্যাডেট কলেজে ওকে রেখে খুলনায় ফিরে যায় বানু। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততায় হারিয়ে যায় আলী্ পিটি, প্যারেড, পড়াশুনা, খেলাধুলা, আড্ডা ..... । দিন চলে যায় ওর।

১৮

মিঠু খোঁজ নিতে এসেছিলো। শুনেছে বানু এসে ওকে কলেজ থেকে বাইরে নিয়ে গেছে। আলী মিঠুর কাছে তেমন কিছুই লুকায় না। সে সত্যটাই প্রকাশ করে। মিঠূরও ওকে দেবার মতো খবর ছিলো। রুবীর

সাথে লাবলুর বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। মনের দুঃখে চার পাতার লম্বা চিঠি লিখেছে মিঠুকে। সব পুরুষদের প্রতি তার ঘৃনা ধরে যাচ্ছে। লাবলু অন্য একটি বয়সী মেয়ের জন্য রুবীকে ছেড়ে গেছে। সে বিয়ে করে সংসার করতে চায়। রুবীর সেই বয়েস হতে এখনও যথেষ্ট বাকী।

"ও একদিন আমারই হবে।" দৃঢ় কণ্ঠে বলে মিঠু। "দেখে নিস তুই।"

আলীর সন্দেহ আছে কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না। মিঠু তার হিংসার উদ্রেক করার জন্যই কথাটা বলেছে কিনা কে জানে। কিন্তু কোন এক অভাবনীয় কারণে হৃদয়ের গভীরে সে বিশেষ একটা উত্তেজনা অনুভব করে না। সেখানে শান্ত লালিমা মাখানো একটা কিশোরীর মুখ ঝট করে উঁকি দিয়ে চলে যায়। আলীর বুক কেঁপে ওঠে। কি হচ্ছে এসব। সঙ্গোপনে একসময় জমিয়ে রাখা চিঠিগুলো বের করে আবার পড়ে। হেলা ফেলায় রাখা বস্তুগুলোর কদর যেন হঠাৎ করেই বেড়ে যায়। মিঠুকে সে আজও এগুলো দেখায় নি। কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা কারো সাথেই ভাগ করে নেয়া যায় না।

কিন্তু দুর্ঘটনা একটা ঘটেই যায়। আচমকা কাউকে কোন পূর্ব সংকেত না দিয়েই তার হাউসের শিক্ষকরা কেবিনেট চেক করার ঘোষনা দিলেন। সবার জিনিষপত্র চেক করা হবে। বেআইনি অথবা অনাকাংখিত কোন ধরনের বস্তু আছে কিনা দেখার জন্য। প্রেম পত্রের ব্যাপারে শিক্ষকরা বিশেষ অনুভূতিশীল নন। আলীকে ডেকে দল বেঁধে জেরা করা হলো। মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে গেলো। মিঠু সুযোগ পেয়েই ছুটে এলো। "কে তোকে চিঠি লিখেছে?"

"রুবী না। তোর ভাবনার কিছু নেই।"

"জানি। রুবী তোকে চিঠি লিখবে না। কার চিঠি ওগুলো? নিশি?"

আলী অস্বীকার করে। হাজার হোক মিঠু ওদের সম্পর্কের ভাই। জানলে হয়তো খালা-খালুর কানে লাগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মিঠু হটে যাবার ছেলে নয়। আলীর অনুমতি ছাড়াই সুযোগ বুঝে ডর্মে গিয়ে কেবিনেট খুলে চিঠির বান্ডিল বের করে পড়ে। আলীর উপর রাগ দেখায়। নিশির এখনও এসবের বয়স হয় নি। আলী কিভাবে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছে, তার লজ্জা হওয়া উচিৎ। আলী প্রমাদ গোনে। মিঠু আবার কি ঝড়ের সৃষ্টি করবে কে জানে। এই ঝামেলার কোন অর্থ হয়?

ছুটিতে খুলনায় ফিরে দুটো ব্যাপার জানা গেলো। ছোট মীর্যা সাহেব এই যাত্রা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। কিভাবে এটা সম্ভব হলো কে জানে? কিন্তু কোন এক পীরের দোয়ার নাকি ভয়ানক জোর।

দ্বিতীয় খবরটা আলীকে বেশী নাড়িয়ে যায়। নিশির বাবার অন্য জায়গায় পোষ্টিং হয়েছে। মাস খানেকের মধ্যেই যেতে হবে। যশোর। সবাইকে নিয়েই চলে যাবেন তিনি। হঠাৎই বুকের মধ্যে একটা অবুঝ শূন্যতা অনুভব করে আলী। ফিরে আসা অবধি নিশির সাথে দেখা হয়নি। সপ্তাহ ঘুরে গেলো। "মেয়েটা আর সেলাই শিখছে না?" লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলে আলী।

"নিশির মন ভালো নেই। গত সপ্তাহে এসেছিলো।" বানু সংক্ষেপে বলে। তার নিজেরও মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। লক্ষ্য করেছে আলী। সম্ভবত ছোট মীর্যার চিন্তাতেই। বাবাকে দেখতে মীর্যা বাড়ী থেকে ঘুরে আসার পর সেটা নিয়ে আর কোন আলাপ করেনি আলী। করার মতো কারণ হয়নি। বানুও সেই প্রসঙ্গ আর তোলেনি। রহস্য জট না ছাড়িয়ে আরোও ঘনিভূত হয়েছে। কিন্তু এই এক রহস্য নিয়ে আলীর হৃদয়ে তীব্র কোন উদ্বেগ নেই। সে বানুকে চেনে, বানুর ভালোবাসা বোঝে। মীর্যা বাড়ীর ছেলে হবার তার কোন বিশেষ আগ্রহ নেই। তবে কলি নামের মেয়েটি তাকে দু পাতার একটা চিঠি লিখেছে। ভাইয়াকে তার খুবই পছন্দ হয়েছে। সে খুব আগ্রহ ভরে জানিয়েছে। তার ভাইয়াকে দেখতে সে একবার অন্তত খুলনায় আসবে। বাবা অথবা দাদা সেটা পছন্দ করবেন না; কিন্তু ভাই-বোনের সম্পর্কে তারা বাধা দেবার কে?

আলীর ইচ্ছা হয় নিশিদের বাসায় একবার যায়। কিন্তু সাহস পায় না। রুবীকে নিয়ে সমস্যা হবার পর নিশির বাবা-মা ওকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া রুবীর মতি গতির কোন ঠিক নেই। লাবলুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর সে এখন কেমন মানসিক অবস্থায় আছে কে জানে? মিঠুকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মিঠুর মনেও দুর্বলতা। তাছাড়া নিশির চিঠি সে পড়েছে। আবার মুখ ফসকে কিছু বলে বসলে খুবই ফ্যাকড়া হবে। তবে মিঠুর উপর ওর বিশ্বাস আছে। সে নিশ্চয় এসব কাউকে বলবে না। নাকি বলবে? হাসি ঠাট্টা করতে গিয়ে বলে না দিলেই হয়। আর কোন ঝামেলা চায় না আলী। রুবীকে নিয়ে একবার হয়েছে, এখন নিশিকে নিয়ে হলে ওদের বাবা-মা বাড়ী এসে জুতা মেরে যাবেন।

দু'দিন বাদে মিঠু নিজেই এলো। রুবীদের চলে যাওয়া উপলক্ষ্যে ওদের বাসায় বিরাট পার্টি হবে। ওদেও সব আত্মীয়-স্বজনেরাই আসবে। আলীও সেখানে নিমন্ত্রিত। মিঠু বানুকে বিশেষ করে যেতে বললো। বানু পারতপক্ষে এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যায় না। বহু বছর সে স্বামীছাড়া কিন্তু তাতে এই প্রসঙ্গের মুখরোচতা

কমে যায় না। তার দর্শনেই সকলের যেন এই এক চিন্তাই মাথায় ভন ভন করে ঘুরতে থাকে। অযাচিত আগ্রহ এবং অনাকাংখিত প্রশ্ন তার পছন্দ নয়।

মিঠুর বাসায় কখনও সেজে-গুজে যাবার কারণ দেখেনি আলী। কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই পার্টিতে যাবার সময় সে তার সবচেয়ে ভালো প্যান্ট এবং শার্টটি পরলো। জুতা পালিশ করলো। সবসময় চটি পরেই গেছে। আজ জুতা পরলো। অন্য সময় হেঁটে যায়। আজ রিক্সা নিলো। খুব সম্ভবত কারো চোখে পড়তে চায় নি। মন্দের ভালো যে রাতে অনুষ্ঠান। খুব বেশী মানুষের চোখে পড়ে নি। যে কয়েকজন দেখেছে তারা বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থেকেছে। ক্যাডেট কলেজের সুবাদে আর্মিদের মতো খাকী পোশাকে তাকে অনেকেই দেখেছে কিন্তু এমন সুবেশে কখন দেখেনি।

সবচেয়ে হৈ চৈ করে উঠলো মিঠু। "আয়, তোকে তো একবোরে রাজপুত্রের মতো লাগছে রে!" সবার সামনেই চীৎকার করে ওঠে সে। ওর বাসার ভেতরে পুরুষ, নারী, ছেলে-মেয়েতে গিজ গিজ করছে। তার মধ্যে রুবী ও নিশিকেও দেখলো আলী। রুবী এগিয়ে এলো।

"দারুণ লাগছে! এতো লজ্জা পাচ্ছো কেন?" রুবী খিল খিল করে হাসে।

আলী পরিষ্কার বুঝতে পারে সে লাল হয়ে উঠেছে। বোকার মতো মাথা চুলকায়। "কেমন আছো, রুবী?"

"ভালো। শুনেছো তো, আমরা যশোর চলে যাচ্ছি।"

"শুনলাম।"

ওরা তিনজন ভীড় থেকে সরে এসে মিঠুর রুমে এসে বসে। নিশিকে কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু দেখতে ইচ্ছা হয়। নিজের উপরেই বিরক্ত হয় আলী। এসব কি হচ্ছে? হঠাৎ এই একরক্তি মেয়েটাকে দেখার জন্য তার মন এতা উতলা হলো কেন? রুবীকে অনেক উচ্ছল দেখায়, সুন্দর লাগে। সে যেন আরোও সুন্দুর হয়েছে। তার শরীরে তারুন্যের দীপ্ত আগমন। আটোসাটো সালোয়ার-কামিজের নীচে যৌবন ঘন্টি পিটিয়ে টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে। নয়নাভিরাম একটা দৃশ্য। আলীর খুব কষ্ট হয় চোখ ফিরিয়ে নিতে। রুবীর প্রতি তার আকর্ষণ যে এখনও জাগরুক এবং দৃঢ় সেটা বুঝতে পেরে একরকম অপরাধ বোধই হয়। সে যদি আজও রুবীকেই পছন্দ করে তাহলে নিশিকে দেখার জন্য এই আগ্রহ কেন? নিজের অন্তরকেই সে আর যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

মিঠু বরাবরই রুবীর প্রতি আসক্ত ছিলো। কিন্তু এবারের মতো এতো আগ্রহ দেখাতে আলী তাকে কখনও দেখেনি। সম্ভবত লাবলুর সাথে বিচ্ছেদের পর তারা দু'জন হয়তো আরোও কাছাকাছি এসেছে। অন্যসময় হলে ওদের দুজনকে একা রেখে মিঠু হয়তো অন্য কাজে চলে যেতো। আজ গেলো না। রুবীর পাশ ঘেঁষে বসে থাকলো। তার আবিষ্ট ভাব দেখেই আলী বুঝলো মিঠু এবার সত্যিকারের প্রেমে পড়েছে। এতোদিনকার ভালো লাগা এবার যে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হচ্ছে তা বোঝার জন্য প্রতিভাবান হতে হয় না। আলী চেষ্টা করে একটা ভদ্র দুরত্ব বজায় রাখতে, রুবীর কাছ থেকে। মিঠুর মনে সে আর কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে চায় না। রুবীকে সে খুবই পছন্দ করে। কিন্তু তার প্রতি আলীর আগ্রহ মিঠুর মতো ব্যাপক নয়। সে মিঠুর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। মিঠু যেন এই ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ না দেখে। মিঠু কি বুঝলো কে জানে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সবাই যখন ওদের প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে সমবেত হলো গান-বাজনা শোনার জন্য তখন সে একটা অভাবনীয় কাজ করে বসলো। আলী এটা আশা করেনি।

মিঠু নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে হুংকার দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ওর বাবা-মা, রুবীর বাবা-মা সহ কম করে হলেও ডজন খানেক মুরব্বী গোছের মানুষ সেখানে জমায়েত হয়েছিলো। ছেলেমেয়েরা মিলিয়ে আরোও ডজনখানেক। ওদের বৃহত্তর পরিবারে মিঠুর বাবার বিশেষ সম্মান রয়েছে। মিঠুকেও সকলেই স্নেহের এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে, তার ভদ্র আচার আচরণ এবং ক্যাডেট পরিচয়ের জন্য। মেধাবী ছেলেরাই সেখানে যাবার সুযোগ পায় সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ক্যাডেটরা কিঞ্চিৎ বেশী মনোযোগ পেয়ে থাকে। ক্যাডেট কলেজে সুযোগ পাবার পর থেকে আলীও এই সমাজে আগের চেয়ে অনেক বেশী মুল্য পেয়ে থাকে। আগে তাকে দেখলে সবাই নাক সিটকাতো, এখন হেসে দু'একটা কথা বলে। মিঠুর নাটকীয়তা দেখেই বুক কেঁপে ওঠে আলীর। এই মানুষগুলির সামনে সে যেন এমন কিছু না করে যাতে আলীর যে সামান্য সম্মানটুকু আছে সেটাও চলে যায়।

সবাই থামতে মিঠু হাসি মুখে বললো, "আমি একটা চিঠি পড়ে শোনাবো। শোনার পর বলতে হবে- কে কাকে লিখেছে।" সে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে জোর গলায় পড়তে শুরু করলো। "আজ-সকালে ঘুম থেকে উঠেই খুব ভালো লাগছে। স্কুল নেই। বাইরে উজ্জল রোদ। জানালার পর্দা দিয়ে দু-তিনটে টুকরো উকি দিচ্ছে আমার ঘরে। যেন লুকোচুরি খেলছে। আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই। উষ্ণতা পাই। উজ্জলতা দেখি। কিন্তু ধরতে পারি না। আমার মনটা আজকাল খুব চঞ্চল লাগে। কেন জানি না। ভাবছি আরোও অনেকক্ষণ চুপটি করে বিছানায় শুয়ে থাকবো। মা ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে। আমি উঠবো না। শুয়ে শুয়ে শুধু ভাববো। কি ভাববো জানি না।"

আলী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। মিঠু তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু। কিন্তু মাঝে মাঝে তাকেও সে বোঝে না। কখন সে চিঠির বান্ডিল থেকে একটা সরিয়ে ফেলেছিলো আলী জানতো না। নিশিকে আশে পাশে কোথাও দেখা যায় না। রুবী খিল খিল করে হাসিতে ভেঙে পড়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না এই নাটকে তার একটা বড় ভূমিকা আছে। হয়তো মিঠু তাকে দেখিয়েছে। সে তখন এই প্ল্যান করে মিঠুকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। মিঠুর মনের মধ্যে প্রেমের আগুণ জ্বলতে শুরু করেছে। সে এখন সব কিছুই করতে পারে। আলী দ্রুতপায়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। মিঠু তাকে পেছন থেকে হৈ চৈ করে ডাকলো কিন্তু কানে নিলো না আলী। মিঠুর সাথে সে সহজভাবে আর কখনো কথা বলতে পারবে কিনা কে জানে। বন্ধুত্বের কিছু অলিখিত নিয়ম আছে। আলীর ধারণা মিঠু আজ তার সবগুলোই ভেঙেছে। রুবীকে পাবার জন্য আলী কিংবা নিশিকে লজ্জায় ফেলার তার কোন দরকার ছিলো না। ভালোবাসার জন্য নিজস্ব স্বত্তাকে বিলিয়ে দেবার কোন কারণ নেই।

বাকী যে কটা দিন খুলনায় থাকলো বাসা থেকে খুব একটা বের হলো না আলী। সেই রাতে নাটক কতখানি এগিয়েছিলো, কিভাবে সেই নাটক শেষ হয়েছিলো, আলী জানে না। জানতে ইচ্ছা হয় নি তা নয়। নিশির জন্য তার ভয়ানত খারাপ লেগেছে। নিজেকে ভয়াবহ অপরাধী মনে হয়। মেয়েটা নিশ্চয় ভেবেছে সেই মিঠুকে চিঠিটা দিয়েছে। ক্যাডেট কলেজের ভেতরের খবর তার তো জানার কথা নয়। নিশিদের বাসায় গিয়ে নিজের মুখে নিশিকে জানাতে ইচ্ছে হয় সত্যটা, কিন্তু সাহস হয় না। মিঠুর সাথেও কোন যোগাযোগ করেনি। মিঠু বাসায় আসুক, তাও চায়নি। মিঠুর সাথে সে খারাপ ব্যবহার করতে চায় না। মিঠু বন্ধুত্বের মূল্য না দিতে পারে, সে দেয়। সময়ের সাথে সাথে মানুষ সবই ভুলে যায়। এসব কিছুই ক'দিন বাদে স্মৃতি হয়ে যাবে। নিশিরা যশোর চলে যাবে। আলী জানবেও না কোথায়। নিশি যদি তাকে আর কখনও চিঠি না লেখে তাহলে তার সাথে যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। সব কিছুই ক'দিন বাদে অতীত হয়ে যাবে। নিশি তাকে ভুলে যাবে। সেটা তার সহ্য হবে। কিন্তু নিশি যদি মনের মাঝে কোন রাগ কিংবা ঘৃণা পুষে রাখে সেটা সে কখনই মেনে নিতে পারবে না। কোনভাবে যদি নিশিকে সে জানাতে পারতো সত্যটা।

মিঠুও কলেজে ফেরার আগে আর দেখা করতে এলো না। সে নিশ্চয় বুঝেছে আলী ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি। নেবার কথাও নয়। রিপন এবং রফি ইতিমধ্যে একবার বাসায় এসে ওর সাথে দেখা করে গেছে। যাবার দিন তাদের সাথেই এক বাসে উঠলো আলী। বাসে সিনিয়র, জুনিয়র আরো বেশ কয়েকজনকে পাওয়া গেলো। ছুটির পরে কখনই কলেজে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না আলীর। এটাই প্রথম

যখন খুলনা থেকে পালাতে পেরে ওর ভালো লাগছে। ঝিনাইদাহ গিয়ে এসব ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে থাকা যাবে। সেটাই ভালো। ভালো হয়েছে নিশিরাও দূরে চলে যাবে। রুবীও তার সমস্ত সৌন্দর্য আর মুর্ছনা নিয়ে অন্য কোথাও আলো ছড়াবে। সে তার বন্ধু মিঠুকে ফিরে পাবে। একটি মেয়ের হাতের খেলনা মিঠুকে নয়, দিলখোলা, সৎ স্বভাবের সত্যিকারের মিঠুকে। তার জন্যে অনেক কিছু করেছে মিঠু, ভাইয়ের মতো নানা সময়ে আগলে রেখেছে, নিরাপদ রেখেছে। মিঠুর উপর রাগ করে থাকা সম্ভব নয়।

ক্যাডেট কলেজে ফেরার সপ্তাহ দুয়েক পর নিশির ছোট্ট একটা চিঠি এলো।

"কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলেন, লজ্জা করলো না? আর জীবনে কখনো আমার মুখ দেখবেন না। জীবনে না। যা ইচ্ছা করেন আমার চিঠিগুলো নিয়ে। আমার কিছু আসে যায় না। কিছু না। শয়তান।"

আলী সেই চিঠি কয়েকদিন পকেটে নিয়ে ঘুরলো। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেই বের করে বার বার পড়লো। প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি শব্দ তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেলো। সে দিব্যচোখে নিশির ক্ষীপ্ত লাবন্য মাখা মুখখানা দেখার চেষ্টা করে। কত অদ্ভুৎ সব চিন্তা মাথায় ঘোরাফেরা করে। এই দুষ্টু মেয়েটার জন্য কখন, কিভাবে তার ভেতরে এতো আগ্রহ, মায়া এবং ভালোলাগা তৈরী হয়ে গেলো সে বুঝতেও পারে না। ম্যাট্রিকের জন্য উঠে পড়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেছে সবাই। অথচ আলী তখনও যেন এক অন্য ঘোরের মধ্যে বাস করছে। পড়াশুনা সে করছে না তা নয়। কিন্তু তার কাছে সবার যে আশা সেটা পূরণ করবার মত যথেষ্ট নয়।

মিঠুর সাথে আবার সখ্যতা হয়েছে। মিঠুই এসেছিলে। অনেক মাফ চাইলো। স্বীকার করলো রুবীর কথাতেই এমন একটা কাজ সে করেছিলো। চিঠিটা সরিয়েছিলো সবাইকে দেখানোর জন্য নয়। নিশিকে সে খুঁচিয়ে আনন্দ পায়। ভেবেছিলো এটা নিয়ে ক'দিন ওকে খুব লজ্জা দেবে। রুবীকে দুর্বল মুহুর্তে সেটা দেখানোর ফলেই এতো ঝামেলা। তার কাছেই জানা গেলো সে রাতে আলী চলে আসার পর নাটক অনেক জমে উঠেছিলো। রুবীর বাবা-মা ব্যাপারটা মোটেই ভালোভাবে নেননি। নিশিকে সবার সামনেই অনেক গঞ্চনা দেন তারা। নিশি কিছুই বলেনি। মাথা নীচু করে সব শুনেছে। পরে রুবীই নাকি এগিযে এসে তাকে উদ্ধার করে। মেয়েটাকে সে বোঝে না। কেনইবা অকারণে ছোট বোনকে হেনেস্থা করা, আর কেনইবা আবার ত্রাণকর্তা সেজে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা? আলী নিশির শেষ চিঠিটার কথা মিঠুকে বলেনি। আর ঝামেলা বাড়াতে চায় না সে। ভেবেছিলো সব চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু চেষ্টা করেও পারে নি। একটি পুস্পিত মনের সুখ দুঃখের ছোট-খাটো কত কথা লেখা আছে সেই পাতাগুলির

পরতে পরতে- কি করে সেগুলো ধ্বংস করা যায়? হয়তো একদিন নিশির হাতেই ফিরিয়ে দেবে। যদি কখন আবার দেখা হয়।

রাত জেগে পড়ে সবাই। টিভি রুমে দল বেঁধে লাইট অফের পর গভীর রাত পর্যন্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি চলে। একেক জনের একেক স্বভাব। রফি সবকিছু লিখে লিখে মনে রাখে। রিপন বিড় বিড় করে পড়তেই থাকে। সগীর অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকে। বাকের ঘন ঘন মাথা চুলকায়। তার কিছুই মনে থাকে না। ইমন হঠাৎ হঠাৎ খ্যাক খ্যাক করে তীব্র কণ্ঠে হেসে উঠে সবাইকে চমকে দেয়। তার মস্তিস্কের সুস্থতা নিয়েও কেউ কেউ চিন্তিত হয়ে পড়ে। পড়াশুনার চাপে কয়েকজনের নাকি মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে আগে। সুতরাং ভয় পাবার সঙ্গত কারণ আছে। আলী সবার সাথে সারি বেঁধে বই খুলে বসে থাকে। যা পড়ে তা মাথায় ঢোকে না। তার মাথার মধ্যে অন্য সব চিন্তাদের অবাধ আনাগোনা। চোখের সামনে কোমল, নন্দনীয় একখানা মুখ বার বার উঁকি দিয়ে যায়; গম্ভীর, রাগী এক জোড়া কাজল আঁকা চোখ ভেসে ওঠে বইয়ের পাতায়; লকলকে বেনীতে বাঁধা কালো চুলের রাশি যেন হঠাৎ হঠাৎ শরীর ছুঁয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না আলীর। শেষতক বাধ্য হয়েই তাকে খাতা কলম নিয়ে বসতে হয়। দূরে, অন্ধকারে কুহু-ডাকছে। প্রতি রাতেই ডাকে, সেই রাতে রস চুরির পর আর কখনও বাইরে যায় নি আলী। কিন্তু সগীর গেছে। কুহু নাকি তার শরীরের গন্ধ চেনে। তাকে অনুসরণ করে। কুহুকে তার বন্ধুদের অনেকেই চেনে; কিন্তু তারা সবাই সগীরের প্রকৃত টানটুকু ধরতে পারে না। আলী পারে। আগে পুরোপুরি পারতো না। এখন পারে। এই বিশাল, অপরূপ প্রকৃতির সাথে একটা সেতু তৈরি করেছে কুহু। মানবীয় জগতের বাইরে যে অসংখ্য প্রাণীকুল এবং বৃক্ষের রাশি মিলে মিশে সৃষ্টি করেছে এক মনোরম অস্তিত্ব, সারা জীবন তার পাশে থেকেও তাকে ধরা যায় না। সেই জন্য চাই একটা যোগাযোগের মাধ্যম। কুহু সগীরের সেই মাধ্যম। সে তার কবিতার নাম দিলো নিশীথ কুহু।

নিশীথ কুহু

তোমাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া আমার সাজে কি?

এখনও কৈশোর নেচে নেচে যায় তোমার চঞ্চল পায়,

বৈশাখী ঝড় খেলে যায় ঐ এলোমেলে কালো চুলে,

আলো আর আঁধারীর লুকোচুরি চলে ছল ছল কালো চোখে,

খেয়ালী হাসির তরঙ্গে সাগর ছলকে ছলকে ওঠে,

তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা আমার সাজে কি?

একা একা রাত জাগা, রূপসী চাঁদ সাথী,

উঁকি দিয়ে যায় মনের গহীনে অপরূপা মুখখানি,

আশা নিরাশায় দুলেছে এ ক্ষন, ডেকেছে কি কোন পাখী?

হয়েছে কি সাথী নীরব আঁধারে, দেখেছে কি চুপি চুপি?

তোমাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া আমার সাজে কি?

এখনও কৈশোর নেচে নেচে যায়, তোমার চঞ্চল পায় ।

১৯

ম্যাট্রিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়েই আলী খারাপ খবরটা পেলো । বানু তাকে জানতে দিতে চায় নি । কিন্তু মিঠুর কাছে খুলনা থেকে খবর আসে । সেই আলীকে জানালো । ছোট মীর্যা সাহেব মারা গেছেন । বানু অনেক মুষড়ে পড়েছে । খাওয়া-দাওয়া নাকি প্রায় করেই না । প্রতিবেশীরা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তার দেখভাল করতে । তাদেরই একজন মিঠুর মায়ের কাছে এসে খবর দিয়ে যায় । তিনি বানুকে সামান্যই চিনতেন কিন্তু এই বিপদের সময় এগিয়ে যান । মিঠু আশ্বস্ত করে আলীকে । বানু ভালোই থাকবে । আলী যেন কোন চিন্তা না করে । বাবার মৃত্যু আলীকে নাড়া দেয় না । অভাবিতভাবে যার কথা তার মনে পড়ে সে কলি । সেই স্নেহময়ী মেয়েটা তার বাবাকে হারালো ভাবতেও বুকের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করে আলী ।

আলী তার চিঠি আর পায়নি । ক্যাডেট কলেজের ঠিকানায় হয়তো লেখেনি । খুলনার ঠিকানায় পাঠিয়ে থাকলে বানুর হাতে পড়েছে । বানু হয়তো লুকিয়ে ফেলেছে । অসম্ভব নয় । অথবা হয়তো কলি আলীকে ভুলেই গেছে । তার জীবন এগিয়ে চলেছে নিজ গতিতে । বানুকে নিয়ে তার খুব একটা চিন্তা হয় নি । তার

ষোল বছর জীবনে একটা সত্য সে বুঝেছে পরিষ্কার বানু ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। নিজের জীবনের একটা স্পষ্ট লক্ষ্য তৈরী করেছে বানু। কোন কিছুই তাকে সেখান থেকে চ্যুৎ করতে পারবে না। আলীই তার জীয়ন কাঠি, মরণ কাঠি। এই অসম্ভব দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আলী যেন অসহায়ই বোধ করে। ছোট মীর্যার মৃত্যুর চেয়েও বেশী কষ্ট পাবে বানু যদি আলী ভালো ফলাফল না করতে পারে।

কেমন করে যেন অনেকগুলো দিন কেটে যায়। আলী নিজেও ঠিক জানে না। ম্যাট্রিকে সে স্ট্যান্ড করেছিলো। যতখানি ভালো করা উচিৎ ছিলো ততখানি করেনি। তবে তার মায়ের মুখ রক্ষা হয়েছিলো। খুলনায় তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাস্তা-ঘাটে আড্ডা দেয়াটা রেওয়াজ হয়ে ওঠে। মিঠুর সাথে তার বন্ধুত্বে কোন ভাটা পড়েনি। প্রায়ই তারা দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যায় কিংবা জেলা স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলে। রুবীর কথা উঠেছে কিন্তু আলী আগ্রহ দেখায়নি। নিশির কথাও সে জানতে চায় নি। আর কখনও নিশির চিঠিও আসে নি। তার কিশোরী মন হয়তো প্রতিবেশী কোন কিশোরকে দেখে নেচে উঠেছে। আলীর কথা তাকে মনে রাখতেই হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে? আলী ভালো থাকবে। তার দিন চলে যাবে।

নাড়া দিয়ে যাবার মতো কিছু ঘটনাও ঘটলো। তার মধ্যে একটি ছিলো বাকের হত্যাকান্ড। রাতের অন্ধকারে তাদের কুঁড়েঘরে ঢুকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে অবশ করে দূরের মাঠে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা, সেখানে গলা চেপে তাকে হত্যা করা হয়। বাকেরের বাবা সন্দেহ করে আত্মীয় স্বজনদেরকে। জমি-জমা নিয়ে নাকি বহুদিন ধরেই গোলমাল চলছিলো। বছর গড়িয়ে গেলেও তার খুনীরা ধরা পড়ে না। অর্থের কাছে আইন-শৃঙ্খলা জিম্মী। আলী বাকেরকে ভুলতে পারে না। এমন শিশু শুলভ একটি ছেলেকে কেন এমন নিষ্ঠুর পরিনতির শীকার হতে হবে সে বোঝে না।

জসীমকে নিয়েও খুব তোলপাড় হলো। ক্লাশ ইলেভেনে ওঠার পর উপরের ক্লাশের সাথে গোলমালটা অনেক বাড়লো। খিটিমিটি লেগেই থাকে। হাতাহাতি হবার উপক্রম হতে হতে হয় না। জসীম বরাবরই একটু পাগলাটে। তার সাথেই ঝামেলা হয় বেশী। হঠাৎ প্রিফেক্টের মুখে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেবার পর পরিস্থিতি স্বভাবতই ভয়ানক খারাপ দিকে মোড় নিলো। তাকে সেদিনই কলেজ থেকে বের করে দেয়া হলো।

সবাই ভেবেছিলো মিঠু কলেজ প্রিফেক্ট হবে কিন্তু বাস্তবে তাকে তার হাউজের প্রিফেক্টের পদটি নিয়েই ক্ষান্ত হতে হলো। আলীর সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক বরাবরই শীতল। হাতে গোনা যে কয়েকটি ছেলে

কোন পদ পেলো না সে তাদের দলেই থাকলো। কিন্তু সেসব নিয়ে তার কখনই কোন আফসোস ছিলো না। সে লিখতে পছন্দ করে। ক্লাশ টুয়েলভে ওঠার পর নাট্য প্রতিযোগিতায় 'অশুভ সংকেত' নামে তার নিজের লেখা নাটকে সে নিজেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে বেশ হৈ চৈ ফেলে দিলো। যদিও নাটকের শেষ দৃশ্যে যখন খুনী সগীর তার বিশাল রাম দা দিয়ে তাকে কোপ দিলো তখন কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রাখা রঙভর্তি বেলুন সময়মতো না ফাটায় পুরো দৃশ্যটা দর্শকদেরকে অশ্রুসিক্ত না করে হাসোজ্বল করে ফেলায়, সে বেশ অপ্রস্তুতই বোধ করেছিলো। ছাই ভস্মের বেলুন ফাটাতে হলে যে এতো জোরে চাপ দিতে হবে কে জানতো? বার তিনেক চাপা চাপি করার পর তবে ফাটলো হতভাগা।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ভালোই হলো। ছুটিতে বাড়ী ফিরবার পর ভীষণ একটা চমক পেলো। বানুই ওর হাতে তুলে দিলো। নিশির চিঠি। বানু খাম খোলেনি। কি লিখেছে জানতেও চায় না। কিন্তু আলী জানে ভেতরে ভেতরে কৌতুহল উপচে পড়ছে তার। নিশিকে নিয়ে যে তার মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন ছিলো তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আলী চিঠি খুলে একটা ধাক্কা খায়। ছোট দু লাইনের চিঠি।

"দেখতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। মিঠু ভাই বেড়াতে আসছে। আসবেন?"

আলীর বুকের মধ্যে অনেক দিন ধরে চাপা দিয়ে রাখা আবেগটা হু হু করে বইতে শুরু করে। নিশি খুলে কিছুই লেখেনি। কিন্তু আলীকে তার মনে আছে। দেখতে ইচ্ছে করে। আলীর চোখ ভিজে ওঠে। তারও মেয়েটাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই। কবে যেতে হবে সেই দিনক্ষণও নেই। নিশি দেখতে চায় আলীর কত খানি আগ্রহ আছে। মিঠুর কাছেই সব তথ্য আছে। আলী চাইলেই মিঠুকে জিজ্ঞেস করতে পারে। কিংবা মিঠুর সাথে সঙ্গী হয়ে যশোর চলে যেতে পারে। নিশিদের বাসায় হয়তো উঠতে পারবে না কিন্তু সেখানে কি হোটেল-মোটেল কিছু নেই? আলী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। হয়তো এই দুটি লাইনের জন্যেই দুটি বছর সে অপেক্ষা করে ছিলো। তাকে তো যেতেই হবে। নিশি ডাকলে সে কিভাবে দূরে সরে থাকে?

রোববার সকালে নাস্তা-টাস্তার পর্ব সারা হতে সবাই বাক্স পেটরা গুছিয়ে যে যার গাড়ীতে তুলে ফেললো। মোটেল বেলা এগারোটার মধ্যে ছাড়তে হবে। প্ল্যান হচ্ছে ফেরার পথে ডরসেট হয়ে যাওয়া। এই এলাকার একটি প্রধান আকর্ষন হচ্ছে ডরসেট ফায়ার টাওয়ার। সেখানে গিয়ে টাওয়ারে ওঠা এবং কোন একটা ট্রেইলে হাঁটার পরিকল্পনা ওদের। বশীর তার লম্বা লিষ্ট বের করে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ

করে সবাইকে সেভাবেই নির্দেশনা দিয়েছে। এই এলাকায় তাদের মধ্যে কেউই পূর্বে কখন আসেনি। সুতরাং জায়গাটা কেমন হবে সে ব্যাপারে কারোরই কোন ধারনা নেই। সবাই বশীরের উপর আস্তা নিয়েই মোটেলের পর্ব চুকিয়ে আবার পথে নামলো। ডরসেট কাছেই। মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার। মেইন স্ট্রিট ধরে এগিয়ে গিয়ে প্রভিনসিয়াল রোড ৬০। ওরা চলেছে পূর্বে।

নিশি একটা অভাবনীয় কাজ করেছে। সে টিসাকে নুরীদের সাথে দিয়ে নিজে আলীর গাড়ীতে উঠে বসেছে। পলির সাথে টিসার ভয়াবহ খাতির। তারা আনন্দে কাঁদতে যা বাকী রেখেছে। এই ছোট খাটো ব্যাপারেও বাচ্চারা যে কতখানি আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠতে পারে ভেবে অবাকই হয় আলী। তবে তার চেয়েও বেশী অবাক হয় নিশির কান্ড দেখে। মাত্র গতকালই সে কেমন লাজুক ব্যবহার করছিলো। হঠাৎ করেই লাজ-লজ্জা সব উধাও হয়ে গেলো? ব্যাপারটা সে মনে মনে ভীষণ পছন্দ করেছে কিন্তু বাইরে এমন ভাব করতে হয়েছে যেন এটার মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রাস্তাটা আঁকা বাঁকা, চারদিকের অপূর্ব সুন্দর গাছ-গাছালী আর টিলার সারির মাঝ দিয়ে খেয়ালী একটা স্রোতস্বিনীর মতো এগিয়ে গেছে। শারদীয় রঙের বাহার যেন ফেটে পড়ছে চারদিকে। কি মনোরম দৃশ্য! কিন্তু তার চেয়েও মনোরম দেখাচ্ছে তার সঙ্গিনীকে, স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে আলী। একটা হালকা নীল রঙের টপসের সাথে ম্যাচিং করে হাঁটু সমান লম্বা স্কার্ফ পরেছে নিশি, সাদা উলের শাল আলতো করে কাঁধে ঝোলানো। মোটা করে একটা বেনী করেছে আজ, কিশোরী চঞ্চলতায় তার প্রতিটি নড়াচড়ার সাথে ছন্দ মিলিয়ে সাপের মতো দুলছে সেটা। মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে গাড়ীর ভেতরে। কি পারফিউম ধরতে পারলো না আলী। তাকে ঘন ঘন আড় চোখে তাকাতে দেখে কপট রাগে ভ্রু কোঁচকালো নিশি। "কি দেখা হচ্ছে এতো? এক্সিডেন্ট করতে চাও?"

"আজ সূর্য কোন দিক দিয়ে উঠেছে সেটাই ভাবছি।" আলী নিরীহ কণ্ঠে বললো।

মুচকি হাসলো নিশি। ঝট করে কিছু বললো না। আলী নীরবতাটুকু ভাঙলো না। নীরবতাও মাঝে মাঝে খুবই উপভোগ্য।

"কাল রাতে খুব একটা ঘুম হয়নি।" নিশি বললো, দৃষ্টি বাইরে গাছ পালায়। লাল আর হলুদের একটা নন্দনীয় মিশ্রণ পেরিয়ে গেলো ওরা। চির সবুজ এবং পাতা ঝরা গাছের সহাবস্থান চারদিকে। একেক দিকে একেক ধরনের রঙের প্রলেপ। মনে হয় কোন এক খেয়ালী চিত্রকরের তুলির কারসাজি।

"আমারও না।" আলী সরল স্বীকারোক্তি করলো।

"কেন?"

"জানি না।"

"মিথ্যুক!"

"তোমার কেন ঘুম হয়নি?"

"আবোল তাবোল ভাবছিলাম। পুরোনো দিনের কথা।"

"আমিও।"

"জানতাম।"

হেসে ফেললো আলী। "আমাকে তোমার চেয়ে ভালো আর কে চেনে?"

"কত সব ছেলেমানুষী কান্ড করেছি আমরা। তাই না? কত চিঠি লিখেছি তোমাকে। চল্লিশ পঞ্চাশটাতো হবেই। কি করেছো সে গুলো?"

"বাঁধিয়ে রেখেছি।"

"ফাজলামি হচ্ছে?" তার কাঁধে আলতো করে একটা থাপপড় দিলো নিশি।

"পুড়িয়ে ফেলেছি সব। বিয়ের আগে। পিয়ার হাতে পড়লে আবার কি কান্ড হয়।"

"ভালো করেছো। রুবী আপুকে লেখা তোমার সেই কবিতা নিয়ে কত কান্ড হলো, না! মিঠু ভাই আবার আমার এক চিঠি নিয়ে আরেক কান্ড করলো। কেমন কেমন করে আবার ভার্সিটিতে দেখা। ক'টা দিনের জন্য। কিন্তু সে দিনগুলোর কথা কোনদিন ভুলবো না।"

কিছু ভুলেনি আলী। ভার্সিটি প্রাঙ্গনে নিশিকে পেয়েছিলো বোধহয় মাস খানেকের জন্য। শান্ত নদীর স্রোত হঠাৎ করেই যেন প্রচন্ড বেগে ধেয়ে জলপ্রপাতে পরিণত হতে চলেছিলো। এতো দ্রুত ঘটছিলো সব কিছু যে বাল্যকালের প্রসঙ্গ তোলারও যেন সময় ছিলো না। বর্তমান তাদেরকে আচমকা গ্রাস করেছিলো, হারিয়ে যাওয়া সময়কে ভরিয়ে তোলার জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো। সেই সময়টুকু পেরিয়ে গিয়েছিলো এক লহমায় কিন্তু মনের ভেতরে তার ছাপ এতো দৃঢ় যে সময়ের গন্ডি দিয়ে তাকে বিচার করা নিরর্থক।

নিশি একটা দীর্ঘনিঃস্বাস ছাড়ে। "সব ভুল হয়ে গেলো।"

আলী পাশ ফিরে মেয়েটাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে। নিশিকে বিষন্ন দেখায়। বাইরে তাকিয়ে আছে কিন্তু তার দৃষ্টি সেখানে নেই। সে স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়েছে। ভুল বলে নি সে। এমনটা হবার কথা ছিলো না। আবেগের বশে মানুষ কাছে আসে, উদ্বেগে দূরে সরে যায়। আর আক্ষেপ করে সারা জীবন। ওদের পরিনতি হয়েছে তাই। "তোমাকে নিয়েও কিন্তু আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম।" নিশির মন ভালো করার চেষ্টা করলো আলী।

"বানিয়ে বলছো। আমাকে নিয়ে কেন লিখবে? আমি তো আর রূপকথার রাজকন্যা না।"

"আমিও রূপকথার রাজকুমার নই।"

"না, কোটাল কুমার"

হেসে ফেললো আলী। "সত্যিই লিখেছিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়। তোমাকে শোনানো হয় নি কখনো। দেখাই তো হয় নি কত বছর।" নিশি মলিন হাসলো। "আসতে তো বলেছিলাম। আসনি।"

আলীর মাথায় চিন্তার ঝড় চলে। ভার্সিটির সংক্ষিপ্ত হৃদ্যতার সময়টুকুতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই প্রসঙ্গ তাদের দু'জনার কেউই কখনই তোলেনি। এই একটি রহস্যের কোন কূল কিনারা সে আজও পায়নি। কিন্তু তার খুব জানতে ইচ্ছা হয়।

"গিয়েছিলাম।" সংক্ষেপে বলে আলী। আড়চোখে নিশির প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করে।

নিশি ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। "বাজে কথা।"

"না। সত্যি গিয়েছিলাম।"

"দেখা করনি কেন তাহলে?"

"তুমি অপেক্ষা করেছিলে?"

"তোমার কি মনে হয়?" নিশির চোখ মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। আজ এতো বছর পরেও যেন সেই বেদনাময় স্মৃতি তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

আলী দ্বিধায় পড়ে যায়। বলবে কি বলবে না সে বুঝতে পারে না। এতোকাল সে ধরেই নিয়েছিলো কোন একভাবে নিশিই তাকে যশোর ডেকে নিয়ে গিয়ে হেনেস্থা করেছিলো। পার্টিতে সবার সামনে ওকে ছোট করবার প্রতিশোধ। এ ছাড়া আর কোনভাবে সে সেই ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

২০

ডরসেট খুব দ্রুতই এসে গেলো। আলী ধারনা করে নি গন্তব্য এতো কাছে হবে। ফায়ার টাওয়ার খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। টাউনশিপ অব এলগনকুইন হাইল্যান্ডস ডরসেটের লুক আউট টাওয়ার, টাওয়ার কিয়স্ক এবং পিকনিক স্পটের দেখভাল করে। ধাতব টাওয়ারটা উঁচুতে শ'খানেক ফুট । সেটার শরীর সংলগ্ন একটা ধাতব সিঁড়ি বেয়ে একেবারে চূড়ায় অবজারভেশন ডেকে হেঁটে ওঠা যায়। বিশাল এলাকা নিয়ে ছড়িয়ে থাকা লেক অব বে'র থেকে ৪৬৫ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ডেকটা। এখানে আসার আগেই বশীর ইমেইল করে লুক আউটে টাওয়ারে বেড়াতে যাবার প্ল্যান সবাইকে জানিয়েছিলো। আলী সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে সামান্য খুঁজতেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। ছবিতে টাওয়ারটাকে নিরীহ গোছেরই মনে হয়েছিলো। তেমন উঁচুও দেখায়নি। টিকিট কেটে উতরাই বেয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে পার্কিং লটে যখন ঢুকলো তখন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একটু পুরানো লোহা-লক্কড় মার্কা বস্তুটাকে যথেষ্ট-ভীতিকরই মনে হলো। উপরে তাকিয়ে দেখলো অবজার ভেশন ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে এইটুকু দেখাচ্ছে। আলীর উচ্চতাভীতি আছে; ওঠা দূরের কথা, দেখেই তার গলা শুকিয়ে গেছে। গাড়ী পার্ক করে চারদিকে তাকাতে দলের অন্যদেরকে দেখতে পেলো। সবাই এখনো এসে পৌঁছায় নি। অধিকাংশই এসেছে। বশীর সবাইকে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করছে।

নিশি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে টাওয়ারটাকে দেখলো। তার মধ্যে নীচে নামার তেমন কোন লক্ষণ নেই।

"নামবে না?" আলী নিরীহ কণ্ঠে বললো।

"আমার প্রশ্নের উত্তরতো দিলে না।"

"কি বলবো? জানি না। আজকের ঘটনাতো নয়।"

"কিন্তু মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা। মিতারা পরের লেনে থাকতো। ওদের টিনের চালার বাসা। সন্ধ্যায় সবার চোখে ধুলো দিয়ে ওদের বাসার পেছনের আমগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন খুব মেঘ হয়েছিলো। বিকেলের দিকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই ঝমঝমিয়ে নামলো। মিতাদের টিনের চালে পড়ে মনে হচ্ছিলো যেন হুংকার দিচ্ছে। ভয় লাগছিলো আমার। তবুও দাঁড়িয়েছিলাম। যদি আসো।"

বশীর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আলী কিছু বলার সুযোগ পেলো না। বাধ্য হয়েই দরজা খুলে বাইরে পা রাখতে হলো। তার মাথার মধ্যে ঝড় উঠেছে। সেই সন্ধ্যার কথা তার মনেও এতো স্পষ্ট যে মনে হয় যেন গতকালকের ঘটনা।

স্থানটা একটা টিলার উপর। চারদিকে ঘন বনানী, মাঝখানে বেশ বড়সড় এক টুকরো জমি পরিষ্কার করে তার মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে টাওয়ারটা। কাছ থেকে দেখলে সেটাকে অনেক উঁচুই মনে হয়। আজ প্রচুর মানুষের সমাগম সেখানে। নানান জাতের মানুষ। বাচ্চাদের ছুটাছুটি, কল কাকলীতে মুখরিত চারদিক। দল বেঁধে সারি দিয়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ধীর গতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে মানুষের স্রোত - যুবক যুবতী থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়ী, বাচ্চা-কাচ্চা, এমনকি কিছু শিশুও বাবা-মায়ের হাত ধরে।

আলীদের দল বেশ কয়েকটা ভাগ হয়ে গেলো। সবার আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো বাচ্চারা। তারা নিজেদের মধ্যে একাধিক দল পাকিয়ে কে কতবার একেবারে উপরের প্লাটফর্মে উঠতে পারে সেই প্রতিযোগীতায় নামলো। পুরুষেরা এবং মহিলারাও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে গেলো। নিশি মহিলাদের একটা দলের সাথে ভীড়ে সাবলীল গতিতে উপরে উঠে গেলো। আলী নীচে দাঁড়িয়ে দেখলো সে ভীড় ঠেলে সংকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। সাদা শালটা পরা না থাকলে কিছুতেই চেনা যেতো না। নীচ থেকে তাকে একটা পিঁপড়ার মতো দেখাচ্ছে। বশীর, আসলাম এবং মইনুল যাবার আগে আলীকে ডাকলো। আলী এড়িয়ে গেলো। একটু পরে যাবে। পারতপক্ষে সে ভাবছে আদৌ যাবে কিণা। তার ভয়ানক উচ্চতাভীতি আছে। তিন তলার বেলকনীতে দাঁড়িয়ে নীচে তাকালেও তার মাথা ঘুরতে থাকে। চার-পাঁচ বছরের একটা মেয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওর মুখ দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

"তুমি ভয় পাচ্ছো? আমি ভয় পাই না।"

মেয়েটার বাবা-মাও বেশ দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

আলীর আঁতে লাগলো। তাকে দেখে নিশ্চয় এতো ভীত সন্ত্রস্থ মনে হচ্ছে না যে ছোট ছোট বাচ্চারাও হাসাহাসি করবে। কি আছে জীবনে? লোহা লক্কড়ের মজবুত কাঠামো, হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার তো আর কোন সম্ভাবনা নেই। আরিফ এবং ঝুনুকে এগিয়ে যেতে দেখে সেও পিছু নিলো। সমস্যা হচ্ছে সিঁড়ির ধাপগুলো বেশ খাড়া, তারের জালির মতো, ভেতর দিয়ে নীচে দেখা যায় এবং ধাপগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত নয়। মাঝে শূন্যতা। দু'পাশে বুক সমান তারের জালির রেলিং থাকায় উঠতে সুবিধা কিন্তু কয়েক তলা উঠবার পর নীচে তাকাতেই তার বুকে কাঁপুনী শুরু হয়ে গেলো। বাচ্চাদের একটা দল ওকে কাটিয়ে তর তর করে নীচে নেমে গেলো। "আলী আংকেল, আমরা এক্কেবারে উপরে গিয়েছিলাম। আবার যাবো। ভয় পেও না।"

তারা খিক খিক করে হাসতে হাসতে গেলো। আলী নীরবে হজম করলো অপমানটুকু। সিড়িটা টাওয়ারের কাঠামোর চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গেছে। পথে বেশ কয়েকটা প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম আছে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য। অনেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকের অপূর্ব দৃশ্যের ছবি তুলছে। আলীর তাকাতেই অসুবিধা হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি পা ফসকে একেবারে পপাত ধরনীতল হবে। মাঝামাঝি ওঠার পর পায়ের কাঁপুনী টের পেয়ে ইস্তফা দিতে হলো আলীকে। সাহস করে চারদিকের মনোরম দৃশ্যটায় চোখ বুলিয়ে ফিরতি পথ ধরলো। টিলার উপরে অবস্থিত হওয়ায় দূরে তাকালে মনে হচ্ছে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চাশ ফুট উচ্চতাই রূপ নিচ্ছে দু'শ তিন শ' ফুটে। দিগন্ত ব্যাপি প্রসারিত দৃশ্য সেই অনুভূতিকে আরোও প্রখর করে দেয়। এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

নীচে নেমে এসেও শান্তি নেই। দলের বাচ্চাগুলো তাকে নিয়ে এবার খোলা মনে হাসাহাসি শুরু করলো। এতো ভয় পাবার কি আছে? এটা তো কোন ব্যাপারই নয়। তারা নাকি ইতিমধ্যেই দু'বার গিয়েছে। একটু বিরতি নিয়ে আবার যাবে। কি বেইজ্জতি।

তবে দেখা গেলো ব্যর্থদের দলে সে একা নয়। একটু পরে শুষ্ক মুখে তার পাশে এসে দাঁড়ালো টিসা। "আংকেল, আমার সাথে যাবে?"

"ভয় করছে?"

"হ্যাঁ। কিছুদূর গিয়ে আটকে যাচ্ছি। মাকেও কোথাও দেখছি না।"

"উপরে। অনেক আগে গেছে। মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে। নামতে দেখিনি।"

"চলো যাই ।" টিসা বেশ দৃঢ়তা দেখানোর চেষ্টা করলো । "তুমি আমার হাত ধরলে আমি পারবো ।"

উত্তম প্রস্তাব । মনে মনে ভাবলো আলী । টিসা সাথে থাকলে হয়তো সে নিজেও কিছুটা সাহস পাবে । অন্যকে সাহস দেবার তাগিদ থাকলে নিজেকেও সাধারণত সাহসী হয়ে উঠতে হয় । তাছাড়া নিশি উপরে, নিশ্চয় অপেক্ষা করছে ওর জন্য ।

দু'জনে গুটি গুটি পায়ে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ উঠে গেলো আলীরা । টিসা চুপচাপ । দেখা গেলো তারও আলীর মতই উচ্চতাভীতি প্রকট । তার দৃষ্টি সিড়িতে নিবদ্ধ । চার দিকের শূন্যতায় ভুলেও তাকাচ্ছে না । আলীর এটা দ্বিতীয় প্রয়াস । তার সাহস খানিকটা বেড়েছে । মনে জোর পাচ্ছে । তাছাড়া টিসার কাছে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করবারও একটা তাগিদ অনুভব করছে । শেষের অংশটুকু অবশ্য দ্বিগুণ ভীতিকর । সিঁড়ির ধাপগুলো মনে হয় সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে, আরোও খাড়া, ফাঁকা ফাঁকা, চারদিকের শূন্যতা রীতিমতো গলা চেপে ধরছে । অনেকেই ভীত কণ্ঠে হাসছে, ঠাট্টা করে ভয় কাটানোর চেষ্টা করছে । আরেক দল পটাপট ক্যামেরার শার্টার টিপছে । এক পর্যায়ে গিয়ে রেলিং ঘেষে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো । সংকীর্ণ সিড়ি বেয়ে পাশাপশি দু'টি সারি চলাচলের মতো যথেষ্ট জায়গা নেই । উপর থেকে একদল নেমে আসার পর নীচ থেকে আরেকদল উপরে উঠছে । এই শেষের অংশটুকু বাস্তবিকই ভীতিকর । নিজেকে ক্ষুদ্র, অসহায় মনে হয় । উপরের প্ল্যাটফর্মটা চারদিকে তারজালি দিয়ে ঢাকা, ভেতরে পা দেবার পর আস্থা ফিরে আসে । ভয়টা অনেকখানি কেটে যায় । নিশি শিলা এবং নুরীর সাথে দাঁড়িযে ছিলো একটা কোণ ঘেঁষে । ওদেরকে দেখে ঠোট টিপে হাসলো । "পেরেছো আসতে?"

টিসা মাকে জড়িয়ে ধরলো । "যা ভয় লেগেছে মা । আলী আংকেল না থাকলে আসতেই পারতাম না ।"

নিশি বক্র কণ্ঠে বললো, "উল্টো বললে মা । তুমি না থাকলে তোমার আলী আংকেল আসতে পারতো না । ভীতুর ডিম ।"

শিলা এবং নুরী মন খোলা হাসিতে ফেটে পড়লো । আলীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো । ওঠাই ভুল হয়েছে । বাইরে তাকিয়ে তার কিছুটা অস্বঃস্তিও হচ্ছে । লেকের লেভেল থেকে সাড়ে চার'শ ফুট উপরে দাঁড়িয়ে তারা । পঞ্চাশ তলা উচু একটা দালানের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকার মতো । নীচে মাটিতে না নামা পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছে না । সে ম্লান একটা হাসি দিয়ে নিম্নমুখী যাত্রা শুরু করছিলো, নিশি থামালো । "যেও না ।"

শিলারা বোধহয় কিছু একটার ইঙ্গিত পেলো। তারা ফিরতি পথ ধরলো। নিশি টিসাকেও তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলো। আলী কিঞ্চিৎ অবাক হলো। নিশি বললো, "অবাক হচ্ছো কেন? কথা তখন শেষ হয় নি। যশোরে সেই রাতে কি হয়েছিলো জানতে চাই। তুমি গিয়েছিলে কিন্তু আমার সাথে কেন দেখা করনি?"

চারদিকের মানুষের ভীড়ে চোখ বোলালো আলী। "গাড়ীতে আলাপ করলে ভালো হতো না?"

"ফেরার পথে তোমার গাড়ীতে উঠছি না আমি। এখন থেকে যে যার বাসায় ফিরছি, খেয়াল আছে?"

"পরে আবার দেখা হলে ..... হবে তো বটেই....."

"অনেক অপেক্ষা করেছি, আর না। সবকিছুতেই তোমার দেরী আর ভয়। আজকে আমার জানতে হবে। এখুনিই বলো। কি হয়েছিলো?"

শ্রাগ করলো আলী। সে নিজেও কি সঠিকভাবে জানে কি হয়েছিলো। মিঠুর সাথে যশোর গিয়ে দু'জন একই মোটেলে উঠেছিলো। পাশাপাশি রুমে। সেদিন সন্ধ্যায় মিঠু অন্য কারো সাথে দেখা করতে হবে অজুহাত দিয়ে উধাও হয়ে যায়। আলী বোঝে সে তাকে নিশির সাথে একাকী দেখা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছে। যশোর আলী ভালো চেনে না। কিন্তু রিক্সায়ালাকে ঠিকানা দিতে নিয়ে যায়। চিকন একটা গলির ভেতর মিতাদের টিনের চালা। তার পেছনে আম গাছের নিচে নিশির থাকার কথা। স্থানটা একটু নির্জন, ঝট করে কারো চোখে পড়বে না। গলির মুখে রিক্সা থেকে নেমে পায়ে হাঁটছিলো আলী, নিশ্চিত হবার চেষ্টা করছিলো সে সঠিক স্থানে এসেছে কিনা। রাস্তার পাশে কয়েকটা তরুণ দল পাকিয়ে সিগ্রেট ফুকছে, কিছু একটা নিয়ে খুব হৈ চৈ করছে। তাদের নজরে পড়তে চায়নি আলী। এই বয়সী ছেলেরা অকারণে ঝামেলায় জড়ায়।

তাদের পাশ কাটিয়ে দশ কদমও যেতে পারেনি একটি তরুণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলো, "এই, কোথায় যাও?"

আলী দাঁড়িয়ে যায়। "কোথাও না।" মুখ ফসকেই বেরিয়ে যায়।

ছেলেটা ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। একহারা, হাড্ডিসার দেহ, রুক্ষ মুখ, তীক্ষ্ণ চোখ। "কোথাও না মানে?"

আলী এই পর্যায়ে একটু ভয় পেয়ে যায়। ক্যাডেট কলেজের ভেতরের শান্তিময় পরিবেশে বসবাস করে বাইরের সব ব্যাপারে তার সমান দক্ষতা অর্জিত হয় নি। মস্তানদের কিভাবে সামলাতে হয় সে জানে না। তার গলা শুকিয়ে গেলো। সে তোতলাতে তোতলাতে বললো, "এই তো সামনেই যাবো।"

"সামনে কোথায়? কার বাড়ীতে?" তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। বাকীরাও ধীর পায়ে এগিয়ে এসেছে। ওকে একরকম ঘিরেই দাঁড়িয়েছে।

"মিতাদের বাসায়।" মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় আলীর। পরক্ষণেই বুঝতে পারে বলাটা ঠিক হয় নি। মিতাকে সে চেনেও না।

"মিতাকে চেনো তুমি?" আরেকটি তরুণ কণ্ঠ প্রশ্ন করলো। "আমি মিতার ভাই।"

আলীর বুক দুর দুর করে কাঁপছে। সে ঘামতে শুরু করেছে। সত্য সে প্রকাশ করতে চায় না। নিশিকে নতুন করে কোন ঝামেলায় ফেলতে চায় না। সে কাঁপা কণ্ঠে বললো, "আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।"

একজন তার জামার কলার চেপে ধরে। "না, যাওয়া যাবে না।"

মিতার ভাই মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। "মিতার বাসায় কেন যাচ্ছিলে?"

কোন উত্তর দেয় না আলী। উত্তর দেবার প্রয়োজনও হয় না। তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণদের একজন হঠাৎ লাথি চালায়, হুড়মুড়িয়ে একজনের গায়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ে সে। পরবর্তি কয়েক মিনিট তরুণেরা তাকে বেধড়ক পেটালো। মুখের বিভিন্ন ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে ওর জামা ভিজে গেলো, দৃষ্টি ঘোলা হয়ে উঠলো। যখন মাটি থেকে নিজেকে ঠেলে তুলবার ক্ষমতা লোপ পেলো ওর তখন ক্ষান্ত দিলো ছেলেগুলো। একটা রিক্সা ডেকে তুলে দিলো ওকে।

মোটেলে ফিরে মিঠুকে পেলো না আলী। ওর জন্য অপেক্ষাও করলো না। বাসে উঠে খুলনা ফিরে গেলো। আর নয়। ভাগ্যের লিখন তাকে নিশির সাথে জড়াতে দিতে চায় না। সেই নিয়তিকেই সে মেনে নেবে।

সব শুনে ভ্রু কুঁচকালো নিশি। "সত্যি বলছো!"

মাথা নাড়লো আলী। "সম্পূর্ণ।"

"তোমার ধারণা মিতার ভাইকে দিয়ে আমিই তোমাকে মার খাইয়েছিলাম?"

"অনেক কিছুই ভেবেছি। এটাও একটা।"

নিশি ঠোট টিপে হাসলো। "শুনে খুব ভালো লাগছে। আমাকে যেভাবে অপমান করেছো তোমার এটা পাওনা ছিলো।"

"চিঠির ব্যাপারটা মিঠুর কাজ। রুবীই ওকে উস্কে দিয়েছিলো। আমি কিছু জানতামও না।"

"জানি। রুবী আপা আর মিঠু ভাই পরে স্বীকার করেছে। কিন্তু তোমার এই ঘটনাতো আমি কখনো শুননি?"

"মিতাও তোমাকে কিছু বলেনি?" আলীর অবাক হবার পালা।

"নাহ। কারো মুখেই কিছু শুনি নি। আশ্চর্য।"

আলী বাস্তবিকই ভেবেছে এটা নিশিরই কাজ ছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ধারণা পাল্টে যেতে বাধ্য হলো। এতোকাল পর এসব অস্বীকার করার পেছনে নিশির কি কারণ থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো নিশির যদি সেই ঘটনার পেছনে কোন হাত না থাকে তাহলে নাটের গুরু কে ছিলো? মিতার ভাইদের দল বেঁধে ঠিক তখনই ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানো, বেধড়ক মেরে রিক্সায় তুলে দেয়া সব কিছুর মধ্যেই একটা সুপরিকল্পনার ছাপ আছে। মাঝে মাঝে, দুর্বল মুহূর্তে, তার মিঠুকেও সন্দেহ হয়েছে। রুবীর সাথে হাত মিলিয়ে সে কি এমন একটা কিছু করতে পারে? কিন্তু কেন করবে? সেইতো তাকে জোর করে নিয়ে গেলো।

নিশি বললো, "চলেন, নিচে নামি।"

আলী বললো, "ছবি তুলে দেবো কয়েকটা?"

"কে দেখবে? নিজের ছবি নিজেই দেখবো?"

আলী শ্রাগ করলো। " নিজের ছবি কি নিজে দেখতে মানা?"

"আমি দেখি না। চলো।" নিশি ওকে পাশ কাটিয়ে চিকন খাড়া সিড়ির ধাপ বেয়ে সাবধানে নামতে থাকে। ভীড়টা যেন আরো বেড়েছে। পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ এখনও ওঠা নামা করছে। আলী চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বোলায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেকের রূপালী পানিতে রোদের ঝিলিক আর দিগন্ত বিস্তৃত বনানীতে সর্বাঙ্গে শারদীয় বর্ণের খেলা। নয়নাভিরাম একটা দৃশ্য। ভালোবাসার মানুষের হাত ধরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। নিশি বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। আলী দ্রুত তাকে অনুসরণ করে।

টাওয়ারের আধাআধি নেমে বেশ ভীড়ে পড়ে গেলো ওরা। একটু দাঁড়াতে হলো। ঠেলাঠেলিতে নিশির শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে। পারফিউমের গন্ধটা ভালো লাগছে। আলী ইচ্ছে করেই আরেকটু চেপে থাকলো।

নিশির যদি আপত্তি থাকে নিজেই সরে যাবে। নিশি সরলো না। আলীর হৃৎকম্পন বাড়ছে। ভার্সিটির কথা মনে পড়ছে। এই মেয়েটার হাত ধরে সে অনেক হেঁটেছে। সেই অধিকারে কি আবার এতো দিন পর হাত বাড়িয়ে ওর কোমল হাতটা ও নিজের হাতে তুলে নিতে পারে? খুব ইচ্ছে হয় কিন্তু একটু ভয়ও করে। নিশি যদি হাত ছাড়িয়ে নেয়? যদি কটু কিছু বলে? সেই লজ্জা রাখার কোন জায়গা থাকবে না।

নিশি হঠাৎ পিছু ফিরে বললো। "মিঠু ভাই টরোন্টোতে থাকে, জানো তুমি?"

"শুনেছি।"

"খোঁজ নেবার চেষ্টা করনি?"

"নাহ। ভার্সিটিতে যা হলো, তার পর কারো সাথেই আর দেখা করতে ইচ্ছে হয় নি।"

"মিঠু ভাইয়ের কি দোষ?"

"কারো কোন দোষ নেই। সব দোষ আমার।"

ঠোট টিপে হাসলো নিশি। "খুব অভিমান আছে দেখছি।"

"তুমি ভেবেছো শুধু তোমার একারই অভিমান আছে?"

"আমার অভিমান নেই। আমার ভয়াবহ রাগ আছে। সত্যি কথা বলি। মিতার ভাইকে দিয়ে আমিই যদি তোমাকে পিট্টি খাওয়াতাম তাহলে মনে সত্যিই শান্তি হতো। কিন্তু কে এই কাজটা করলো মাথায় আসছে না।"

"মিঠু আর রুবী কোথায় ছিলো সেই সময়?"

"ওদের কোথায় যেন যাবার কথা ছিলো। মিঠু ভাই আমাকে আগেই জানিয়েছিলো তুমি আসতে পারো। কিন্তু তুমি যে তার সাথেই দল বেঁধে আসছো সেটা বলে নি। রুবী আপুও কিছু জানতো বলে মনে হয় নি। যাক গিযে, ওসব এখন ভেবে কি লাভ। যা হবার হয়ে গেছে। এমনতো না যে তার পর আর দেখা হয় নি।"

"দেখা হয়ে তো আরোও ঝামেলা হলো।"

নিশি হঠাৎই খিল খিল করে হেসে উঠলো। "আমি হচ্ছি তোমার জন্য অপয়া। এখন আবার দেখা হয়েছে। দেখো কি ঝামেলা হয়। এতো চাপছো কেন?" সে কনুই দিয়ে ঠেলা দিলো। "ভাবীরা নীচ থেকে দেখছে।"

"না দেখলে কি হতো?"

"কিছুই হতো না।"

"টরোন্টো ফিরে গিয়ে দেখা পাবো আবার?"

"কি বললাম? আমি হচ্ছি অপয়া। আমার দেখা না পেলেই তোমার জন্যে ভালো। আমার সাথে যখনই জড়িয়েছো তখনই তোমার সমস্যা হয়েছে।"

ভীড়টা একটু হালকা হয়েছে। আবার এগুতে শুরু করেছে ওরা। আলী বললো, "আমি ফোন দেবো। দু'জনে বেড়াতে যাবো। অনেক অপেক্ষা করেছি।"

"অপেক্ষা করেছো না ছাই। ঠিকই তো বিয়ে করে বসেছিলে। খবর নিয়েছিলে আমার?"

"তুমিওতো করেছিলে। শুধু আমার একার দোষ?"

নিশি হঠাৎই চুপ করে গেলো। "বাদ দাও। তাড়াতাড়ি চলো। সবাই অপেক্ষা করছে।"

বাকী পথটুকু আর কোন কথা হলো না। বশীর সবাইকে জড়ো করে টাওয়ারের নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা নামতেই হাত ছানি দিয়ে ডাকলেন। এখানে বেশ কয়েকটা ট্রেইল আছে। হাঁটার জন্য। দলে হাঁটার মানুষের কোন অভাব নেই। কয়েকজন গাঁই গুঁই করছিলো কিন্তু বাকীদের জোরাজুরিতে রাজী হতে হলো। দু'পাশে বিশাল গাছের সারির মাঝ দিয়ে চিকন পায়ে চলা পথ, কোথাও উত্তল কোথাও অবতল। এক পর্যায়ে বেশ দুর্গম হয়ে উঠলো। বড় বড় পাথরের চাঙড় পেরিয়ে পঞ্চাশ-ষাট ফিটের প্রায় খাড়া পিচ্ছিল ঢাল, খুটিতে দড়ি বেঁধে ধরে ধরে ওঠার ব্যবস্থা করা রয়েছে। পা ফসকালে নীচে কঠিন পাথরের পাটাতনে গিয়ে পড়তে হবে। বাচ্চারা ইতিমধ্যেই এসব ব্যাপারে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। তারা সবাইকে পেছনে ফেলে তরতর করে সব বাধা পেরিয়ে পার্কিং লটে ফিরে গেছে। পুরুষেরা এবং মহিলারা ছোট ছোট দল বেধে এগিয়ে যাচ্ছে। আলী একাই যাচ্ছিলো। দূর থেকে টিসাকে খাড়া ঢালের নীচে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পা চালালো। নিশি অনেক পেছনে। টিসাকে সে অন্য বাচ্চাদের সাথে দৌড়ে এগিয়ে যেতে দেখেছিলো। ওকে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু উদ্বিগ্নতা বোধ করলো।

টিসা ওকে দেখে ম্লান হাসলো। " আংকেল আমাকে ধরবে? একা যেতে ভয় করছে।"

"তোমার বন্ধুরা তোমাকে একা ফেলে চলে গেলো?"

"ওরা থামতে চেয়েছিলো। আমি দূর থেকে দেখলাম তুমি আসছো। তাই ওদেরকে চলে যেতে বললাম।"

আলী টিসার হাত ধরলো। অন্য হাতে দড়ি ধরে ঠেলে ঠেলে ধীর পায়ে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। কোন অবলম্বন ছাড়া এই ঢাল বেয়ে ওঠা অসম্ভব হবে। মহিলাদের কেউ কেউ শাড়ী পরে এসেছে। তারা এই পথ বেয়ে উঠতে পারবে সেই ভরসা খুবই কম।

টিসা হঠাৎ বললো, "মা কিন্তু খুব একলা।"

আলী একটু অবাক হয়। "তুমি তো আছো।"

"আমি তো তার মেয়ে। তার সঙ্গী দরকার। ওর জন্য আমার খুব খারাপ লাগে।"

আলী কি বলবে বুঝতে পারে না। এই ছোট মেয়েটাকে কতখানি বলাটা যথাযথ হবে সে জানে না। তাকে সে অকারণে ধাঁধাঁয় ফেলে দিতে চায় না।

ঢালের উপরে উঠে একটা পাথরের উপরে বসলো টিসা।

"মার জন্য অপেক্ষা করি।"

আলীও দাঁড়ালো। তাকে একা রেখে সে চলে যেতে চায় না।

"একটা কথা বলি আংকেল?"

"বলো।"

"তোমরা দু'জন যদি বিয়ে কর আমার একটুও খারাপ লাগবে না। আমি একদম হিংসা করবো না তোমাকে। আমি খুব ভালো মেয়ে হয়ে থাকবো। কসম।"

আলীর চোখে পানি এসে গেলো। টিসার পাশে বসে এক হাতে আলতো করে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, "পাগলী মেয়ে, এভাবে কেন কথা বলছো? তুমি একটা লক্ষী মেয়ে। তোমার মা হচ্ছে বদ, শুধু গোলমাল বাঁধায়।"

হেসে ফেললো টিসা। "তোমরা টাওয়ারে একসাথে দাঁড়িয়েছিলো আমি দেখেছি। খুব ভালো লাগছিলো। ছবিও তুলেছি। তোমরা খেয়াল করনি। টরোন্টো ফিরে গিয়ে মাকে নিয়ে ডেটিং করতে যেও। খুব ভালো হবে।"

"তোমাকে নিয়েই যাবো।"

"আমি যেতে চাই না। আমি গেলে তোমরা মন খুলে কথা বলতে পারবে না।"

আলী হেসে ফেললো। "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। এটার মানে জানো।"

"জানি।" হাসলো টিসা। "আমিতো আর এখানে বড় হই নি।"

"তোমার মা ডেটিং করতে চায় না।"

"চাইবে। তুমি বার বার বলবে। ও লজ্জা পায়।"

"তোমার মাকে আমি বুঝতে পারি না।"

নিশিরা ওদেরকে ধরে ফেলেছে। ঢালের নীচে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাদের দুই তিনজন ইস্তফা দিয়ে একটা সাইড ট্রেইল নিয়ে পাশের রাস্তায় নেমে গেছে। তাদেরকে ফিরে যাবার সময় গাড়ীতে তুলে নিতে হবে। নিশি মিলা এবং বেলীর সাথে জোট পাকিয়ে বেশ কসরৎ করে উপরে উঠে এলো। টিসার সাথে আলীকে বসে থাকতে দেখে তার ঠোটের ডগায় একটা হাসি ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেলো। "এই মেয়েটা সারাক্ষণ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।"

টিসা আপত্তি করলো। "আমি কিছু বলিনি। তুমি খামাখা আমাকে দোষ দিচ্ছো।"

"তোমার মতলব আমি জানি। দুষ্টু মেয়ে। চলো।"

"সত্যিই। কিছু বলি নি। আমরা গাছ পালা নিয়ে কথা বলছিলাম। ঠিক না, আলী আংকেল?"

আলী লম্বা করে ঘাড় দোলালো। শিলা এবং বেলী মন খুলে হাসতে লাগলো। মেয়ের হাত ধরে ট্রেইল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো নিশি। এখানে ঢালটা অনেক কম। আলী পেছন থেকে দলটাকে অনুসরণ করলো। তার মনের মধ্যে নতুন আশার হাওয়া লেগেছে। দু'চোখে নতুন স্বপ্নের দোলা। ক'দিনের জীবন! কেন এভাবে নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে তাদেরকে। যেভাবেই হোক নিশির সাথে যেটুকু দুরত্ব এখনও

আছে সেটা সে দূর করবে। তারা দু'জনে টিসাকে নিয়ে সত্যিকারের একটা সংসার পাতবে। ভয়াবহ ভালো লাগায় আলীর সমস্ত চেতনা উদ্ভুদ্ধ হয়ে উঠলো। অনেক ভুল করেছে জীবনে। আর নয়।

টাওয়ারের পার্কিং লট থেকেই সবাই বিদায় পর্ব চুকিয়ে ফেলছে। বাচ্চারা যে যার বাবা মায়ের সাথে গাড়ীতে উঠলো। মায়েদের মধ্যে কয়েকজন রাস্তায় অপেক্ষা করছে। তাদেরকে ফিরতি পথে তুলে নেয়া হবে। নিশি টিসাকে নিয়ে মামার গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। মামা আলীর সাথে হাত মিলিয়ে অর্থবহ একটা হাসি দিলো। ভয়ে কিছু বললো না।

সবাই চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ একাকী গাড়ীতে বসে থাকলো আলী। চারদিকের মানুষের ব্যস্ত চলাচল দেখলো। বহুকাল পর যেন নতুন করে আবার জীবনের ছোঁয়া পেলো আজ ও। যশোরের সেই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা অনেক দিনের অতীত। কিন্তু তারপর মনের গভীরে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো সবসময় খচখচ করছিলো। আজ যেন হঠাৎ করেই সেই ক্ষতটা অনেক খানি শুকিয়ে গেলো। নিশির যে সেই ঘটনায় কোন হাত ছিলো না এই টুকু জেনেই সে খুশী। হয়তো কারোরই কোন হাত ছিলো না। হয়তো পুরো ঘটনাটাই একটা দূর্ঘটনা। পাড়ার বখাটে ছেলেদের কান্ড। কিন্তু মিঠু এবং রুবীকে সে পুরোপুরি নির্দোষ ভাবতে পারে না। তাদের দু'জনের সম্মিলিত শক্তিতে অনেক কিছুই সম্ভব।

ভার্সিটিতে যখন আবার তাদের দেখা হলো তখনও তার প্রমাণ পেয়েছে আলী। সারাটা জীবন রুবীর পেছনে ঘুরে কাটিয়েছিলো মিঠু। রুবীর জন্য সে অনেক কিছুই করতে পারতো। মিঠুকে হঠাৎই খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। রুবীকে সে শেষতক পায় নি। বোঝাই যায়। তেমন কিছু হলে নিশি নিশ্চয় বলতো যদিও সে পরিষ্কার করে জানতে চায় নি। কিন্তু মিঠুর সাথে মুখোমুখি বসে আবার ঘনিষ্ট দুই বন্ধুর মতো কথা বলতে খুব ইচ্ছা হয়। এবার টরোন্টো ফিরে গিয়ে সে মিঠুর সাথে দেখা করবে সিদ্ধান্ত নেয় আলী।

ফিরতি পথে কয়েক ঘন্টা সময় কিভাবে কেটে যায় টেরও পায় না। অনেক দিনের দূরে সরিয়ে রাখা স্বপ্নের সারিগুলো সুযোগ পেয়ে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা ঘোরের মধ্যে কেটে যায়।

২১

ফল ট্রিপ থেকে ফিরে আসার পর একটা সপ্তাহ জাবর কাটতে কাটতে পার করলো আলী। কাজে ব্যস্ততা থাকলেও তার মন পড়ে থাকলো ভিন্ন স্থানে। অনেক দিন পর তার মনের মধ্যে আবার জোয়ার এসেছে। অকারণে চঞ্চল লাগে, কোন কিছুতেই মন বসে না। নিশিকে তার চাই। টিসাকে এবং নিশিকে নিয়ে আবার সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে। অনেক জল্পনা-কল্পনা করে। মনে মনে সে অনেকদুর এগিয়ে যায়।

রাতে ঘুম ভেঙে যায় আচমকা। উঠে ঘরময় পায়চারী করে। পুরোনো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সেসব কথা ভাবতে ভালো লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। সামান্য যে টুকু সময় সে নিশিকে সত্যিকারভাবে নিকটে পেয়েছিলো, ভাবের আদান প্রদান করার সুযোগ হয়েছিলো।

১৯৯০ এর প্রথম দিকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন খুব জোরে সোরে শুরু হলো। জিয়াউর রহমানের অকাল মৃত্যুর বছর খানেক পর তৎকালীন আর্মি চিফ এরশাদ ১৯৮২ তে মার্শাল ল জারি করেন দেশে। পরে জাতীয় পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দলগঠন করে ১৯৮৬ তে ইলেকশন দেন। আওয়ামী লীগ তাতে অংশগ্রহণ করলেও জিয়ার পার্টি বি.এন.পি. করে না। তারপর থেকেই নানান সময়ে নানান ভাবে এরশাদ বিরোধী কর্মকান্ড সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রায়ই ভার্সিটির দরজায় তালা ঝুলে যেতো। পরীক্ষা পিছিয়ে যেতো। ধুকতে ধুকতে কোন রকমে ফলিত পদার্থ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স শেষ করে এসেছিলো আলী। দু'বছরের মতো অকারণে নষ্ট হয়েছে রাজনৈতিক গোলমালে পড়ে; কিন্তু তবুও যে শেষ হচ্ছে এটা ভেবে ভালো লাগছিলো। মাষ্টার্স তার দেশের বাইরে গিয়ে করার ইচ্ছা।

ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে ছিলো আলী। ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হতে চেয়েছিলো বুয়েটে, কিন্তু পরীক্ষা খুব ভালো হলো না। চান্স পেলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে নাম থাকায় ফলিত পদার্থেই ঢুকে পড়লো। তার ঢাকায় থেকে পড়ার ইচ্ছা। বিদেশে যাবে। ঢাকা থেকে ব্যবস্থা করা সহজ। প্রথমে কিছুদিন বানু খুলনাতেই ছিলো। আলী ঢাকায় একটা মেস জাতীয় জায়গায় অল্প খরচে থেকে ক্লাশ করছিলো। প্রায় একই সময়েই সে ছেলেমেয়ে পড়াতে শুরু করে। অনেকেই করছিলো। ভালো পয়সা। দুটি বাচ্চাকে পড়ালে হাত খরচ সহ আরোও কিছু বেশী চলে আসে। প্রথমে দুটি টিউশনি দিয়ে শুরু করলেও শীঘ্রই তার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে মুখে নাম ছড়ায়। তারও বেশ সুনাম হয়ে যায়। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার আয় এমন একটা পর্যায়ে এলো যে সে

স্থির করলো মাকে ঢাকায় তার কাছে নিয়ে আসবে। বানুর শরীরও একটু ভেঙে পড়েছে। নিজের দিকে প্রায় কখনই খুব একটা তাকায়নি। অল্পতেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা দেখা শোনা করে। কিন্তু সেভাবে কত দিন চলবে? তাছাড়া বানু নিঃসঙ্গ। ছোট মীর্যা মারা যাবার পর বানুর জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নি। নতুন করে সংসার করবার চিন্তাও তার মাথায় কখনই আসে নি। স্তাবকের অভাব কখনই ছিলো না। কিন্তু সেই মন বানুর ছিলো না। মায়ের জন্য অসম্ভব খারাপ বোধ করতো আলী। বলা যায় আলীর জন্যেই তার সমগ্র জীবন বিসর্জন দিয়েছে বানু। পরিবর্তে সে তাকে কি দিয়েছে?

বানু আসতে চায় নি। বলেছে অযথা খরচ বাড়বে। ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া করে থাকা কি সহজ কথা। শুধু ছাত্র পড়িয়ে কি চলবে? আলীর পড়াশুনাওতো আছে। সারাক্ষণ ছাত্র পড়ালে সে পড়বে কখন? বানুই বা সেখানে কি ধরনের কাজ করবে? আলী তার কোন যুক্তিই গায়ে মাখেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরিবাগে সে একটা বাসার দু'টি কামরা মোটামুটি কম ভাড়াতেই পেয়ে গেলো। নিজস্ব বাথরুম। রান্নাঘরটা ভাগাভাগি করতে হবে। কিন্তু সেটা কোন সমস্যা নয়। আসার পর বানু নিজেই সেলাই শেখাতে শুরু করলো। টাকা পয়সা সামান্যই আসে, কিন্তু তার সময় কাটে। কিছু মেয়ে কিছু মহিলার সাথে পরিচয় হয়। তার শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ঘটনা বন্ধ হয়ে যায়। আলীর অসম্ভব ভালো লাগে। তার মনে হয় সে মায়ের জন্য কিছু একটা করতে পেরেছে। পড়াশুনার চাপ বাড়লেও একই সাথে কাজের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। টিউশনির পাশাপাশি স্কুলে পড়াতেও শুরু করে। বানু আপত্তি করে। সে শোনে না। হায়ার স্টাডির জন্য দেশের বাইরে যাবার ভয়ানক ইচ্ছা তার। সে জন্যে অনেক টাকার প্রয়োজন। স্কলারশীপ যদি কপাল গুনে পেয়েও যায় তারপরও কয়েক লাখ টাকা লাগবেই। অল্প অল্প করে জমাতে শুরু করে সে। মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবারই ইচ্ছা।

রাজনৈতিক গোলমালে পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে থাকায় বিরক্তই লাগে আলীর। মন্দের ভালো যে বন্ধের সময় তার টিউশনির কাজ পূর্ণদমে এগিয়ে চলে। সেখানে সমস্যা হলে বিপদ হয়ে যেতো। ওর বন্ধুরা অনেকেই হলে থাকতো। প্রায়ই হলে গিয়ে আড্ডা হতো। পরীক্ষার আগে মাঝে মাঝে তারা দল বেধে পড়তো। আলী ভালো নোট লিখতো। তার নোটের উপর সবারই লোভ ছিলো। আলীর কাছে অবশ্য বেশী চাইবার প্রয়োজন হতো না। সে সবাইকে সাহায্য করবার জন্য আগ বাড়িয়ে থাকতো। পড়াতে পড়াতে তার মধ্যে একটা শিক্ষক শিক্ষক ভাব চলে আসছিলো।

বাসা থেকে সাধারণত হেঁটেই যাতায়াত করতো আলী। বিশ্ববিদ্যালয় মাইল দুই তিন পথ। তাকে যেতে হতো কার্জন হলে। টি.এস.টি পার হয়ে আরোও মাইল খানেক। কিন্তু হাঁটা অভ্যাস ছিলো। যেখানেই সম্ভব হতো ছাত্রদের বাসায় সে খরচ বাঁচানোর জন্য হেঁটেই যেতো। যেটুকু বাঁচে তাতেই লাভ। তার সঞ্চয় বাড়ে।

ঠিক কোথা থেকে ফিরছিলো মনে নেই আলীর। খুব সম্ববত ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়েছিলো। দেশের বাইরে পড়তে যাবে। তখনই বিভিন্ন স্থানে ঘোরাঘুরি করছিলো বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। শহীদ মিনারের কাছাকাছি আসতে হঠাৎই চারদিকে হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। কিছুদিন ধরেই সরকার বিরোধী আন্দোলন বেশ জোরে সোরে শুরু হয়েছে। সরকারী দলের সাথে প্রায়ই ছোটখাটো গোলমাল লেগে যায়। মারপিট, পাথর ছোড়াছুড়ি থেকে গুলী ছোড়াছুড়িও হয়। নিরীহ মানুষজনই বেশী মারা যায়। এই সব এলাকায় চলা ফেরা করার সময় চোখ কান খোলা রাখাটা খুবই জরুরী। ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারের কাছাকাছি হাঁটছিলো আলী, দূর থেকেই দেখলো লাঠিসোটা নিয়ে একদল ছেলে দৌড়ে আসছে। কোথায় যাচ্ছে, কে তাদের লক্ষ্য বস্ত বোঝার জন্য অপেক্ষা করলো না আলী। তাকে সামনে পেলে দুই বাড়ি দেবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। রাজনীতিতে সে একেবারেই জড়ায় নি। জড়ানোর প্রয়োজনও হয়নি। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকা নিয়েই অধিকাংশের হাতেখড়ি হয় রাজনীতিতে। সে যেহেতু বাইরে থাকতো তাকে জোরাজুরি করে দলে ভেড়ানোর সুযোগ কম ছিলো।

রাস্তা থেকে নেমে গাছ পালার আড়ালে চলে যাচ্ছিলো আলী সেই সময় খেয়াল করলো দু'টি মেয়ে একটা বড় সড় গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো কাঁপছে। তাদেরকে দেখেই বোঝা গেলো তারা প্রথম বর্ষের ছাত্রী। খুব বেশীদিন ঢোকেনি। এসবের সাথে এখনও তেমন পরিচিতি হয় নি। হৈ চৈ শুনে ঘাবড়ে গেছে। পটাপট কয়েকটি গুলীর আওয়াজও কানে এলো। আলীকে দেখে তাদের চোখ মুখ আরোও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আলী হাত উঁচিয়ে ওদেরকে ভরসা দেবার চেষ্টা করলো। "ভয় পাবেন না। আমি ওদের সাথে না।"

একটা মেয়ে বললো, "এদিকটা আমরা ভালো চিনি না। কোন দিক দিয়ে বের হবো?"

অন্য মেয়েটিকে আলীর চেনা চেনা লাগলো। একহারা, অসম্ভব লাবণ্যময় চেহারা, শ্যামলা, ঘন কালো চুল পরিপাটি করে বিনুনী করা । মেয়েটিও তার দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার ভয়টা যেন হঠাৎ করেই কেটে গেছে। আলী বললো, "এদিক দিয়ে বের হবার জায়গা আছে। আপনারা কোথায় যাবেন?"

প্রথম মেয়েটিই বললো। "টি.এস.সিতে। ভাইয়া একটু হেল্প করবেন আমাদেরকে?"

ইতোমধ্যে সমস্যা আরোও বেড়েছে। অন্য একটি দলও কোথা থেকে রে রে করতে করতে তেড়ে আসছে। পাথর, ইট ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়েছে। কাছেই কোথাও একটা জানালা ভাঙলো। আবার গুলীর আওয়াজ। আলী এর মধ্যেই অন্য মেয়েটির উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। "তোমাকে ..... আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।" বলেই ফেললো সে।

মেয়েটা ঠোট বাঁকালো। কোন কথা বললো না।

প্রথম মেয়েটি বললো, "ভাইয়া চলেন। কখন ইট পাথর এসে মাথায় পড়বে।"

"জ্বী, চলেন। আমার পেছন পেছনে আসেন।"

আলীর এদিকের পথ ঘাট, অলি গলি নখ দর্পনে। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ঘোরাঘুরি করছে। না চিনে উপায়ও নেই। সে মেয়ে দু'টিকে পথ দেখিয়ে অন্য একটি রাস্তায় এনে তুললো। "এখান থেকে আপনারা রিক্সা নিয়ে চলে যেতে পারবেন। মনে হয় না এদিকে কোন ঝামেলা হচ্ছে।"

আশে পাশে কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ড চোখে পড়লো না। দূর থেকে গোলমালের শব্দ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এবার সত্যিকারের মারপিট শুরু হয়েছে। আলী নিজেই আগ বাড়িয়ে একটা রিক্সা ডেকে দিলো। "তাড়াতাড়ি চলে যান। একটু পরেই ছোটাছুটি শুরু হবে। এদিকেও মানুষজন আসবে।"

প্রথম মেয়েটি ঝটপট রিক্সায় উঠে বসলো। দ্বিতীয় মেয়েটি উঠলো না। সে ভ্রু কুঁচকে আলীর দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকলো।

"চিনতে পারছেন না? আমি কি অনেক বদলে গেছি?"

আলীর বুকের মধ্যে প্রচন্ড একটা ধাক্কা লাগে। "নিশি?" লম্বা হয়ে গেছে, আরোও শুকিয়েছে, অনেক সুন্দর হয়েছে। সেই বালিকার মুখ সেখানে খুঁজে পাওয়া কষ্ট। সেখানে এখন সুন্দরী এক যুবতীর অবয়ব। নিখুঁত এক রমণী। ও কি বলবে বুঝতে পারে না। তার অভিমান যেন এক মুহূর্তে ঝরে পড়ে যায়। যশোরে মার খাবার পর এই প্রথম দেখা। এর মধ্যে সে আর কোন যোগাযোগ করেনি। মিঠুর সাথেও না। ভবিষ্যৎ গড়ায় মন দিয়েছিলো সে। মেয়েদের চিন্তা মাথাতেও আনে নি। রুবীর কথা না, নিশির কথা না। সেসব অতীত।

"আমি নিশি। ঠিকই ধরেছেন। বড় হয়ে গেছি, চিনতে কষ্ট হচ্ছে?"

আলী কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না। ছোট নিশির সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে জানতো। কিন্তু এই রমনীয় নিশিকে সে কিভাবে সামলাবে জানে না। তার কথায় ঝাঁঝ, মুখে স্পষ্ট উষ্মা। মনে হয় সে যেন রেগে আছে; কিন্তু রাগতো আলীরই হবার কথা। অন্য মেয়েটি রিক্সার ভেতর থেকে তাড়া দিচ্ছে।

আলী নরম গলায় বললো, "যাও। দেরী করলে ঝামেলায় পড়ে যাবে।"

নিশি ঠোঁট টিপে হাসলো। "আমি বোটানিতে।"

আলীর বুকের মধ্যে আরেকটা ধাক্কা লাগে। এমন সুন্দর করে কবে হাসতে শিখলো নিশি? ঘাড়টা সামান্য কাত করে বেনীতে ঢেউ তুলে কিছু যেন বলতে চাইলো সে। কিন্তু বললো না। তবে তার দৃষ্টির রুক্ষতা ম্লান হয়ে সেখানে অন্য কিছু ফুটে উঠলো। আলী ধরতে পারলো না। প্রশ্রয়? আমন্ত্রণ? ব্যঙ্গ? আলীর শান্ত পৃথিবী হঠাৎ করেই আলোড়িত হয়ে উঠেছে। আলীর কিছু বলতে ইচ্ছা হয়, জানতে ইচ্ছা হয় কোথায় থাকে নিশি? ফোন নাম্বার পেতে পারে? দেখা হবে আবার? কিছুই বলতে পারে না। তার বান্ধবী এবার সজোরে ডাকাডাকি করছে। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে গোলমালটা এদিকে এগিয়ে আসছে। নিশি আর কিছু বললো না। গট গট করে হেঁটে রিক্সায় উঠলো। হুড তুলে দিলো। রিক্সায়ালা জোর পায়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে দ্রুত রিক্সা ছোটালো। সে-ও কোন ঝামেলায় পড়তে চায় না। দাঙ্গাবাজদের সামনে পড়লে শুধু তার পিঠেই কিল-থাপ্পড় পড়বে তাই নয়, তার রিক্সাটারও ক্ষতি হতে পারে। সেই ক্ষতিপুরণ তাকেই দিতে হবে।

আলী যতক্ষণ রিক্সাটা বাক না ঘোরে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। কেন সে নিজেও জানে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাটা ব্যর্থ হলো না। মোড় ঘুরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে হুডের পেছনের পর্দা সরিয়ে পিছু ফিরে তাকালো নিশি। হাসলো না। শুধু তাকিয়ে থাকলো কয়েকটা মুহূর্ত। পর্দা পড়ে গেলো। উধাও হয়ে গেলো রিক্সা। আলীর বুকের মধে কাঁপুনি। কেন আবার দেখা হলো? ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে। এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। পরীক্ষার পর বাইরে চলে যাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে আলী। টোফেল, জি আর ই দেবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস তার কোন একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেতে অসুবিধা হবে না। সে মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনায় সবসময় মনোযোগ দিতে পারে না। কিন্তু যখন দেয় তখন ভালো করে। সবই পরিকল্পনা করে রেখেছে সে। তার মধ্যে নিশির কোন স্থান ছিলো না। কিন্তু তখনও সে নিশিকে দেখে নি। নিশি এতো কাছেই আরেকটি ডিপার্টমেন্টে এসে ঢুকেছে জানে নি।

কার্জন হলের এপাশে ফলিত পদার্থ। ওপাশে বোটানি। নিশিরা নিশ্চয় অন্য পাশের গেট দিয়ে ঢোকে। নইলে আলীর সাথে তার আগেই দেখা হতো। ক্লাশ শেষ হয়ে গেলেও গেটের পাশের ছোট চায়ের দোকানে দল বেঁধে আড্ডা দেয় ওরা। এদিক দিয়ে যেই ঢুকুক ওদের চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

পরবর্তি কয়েকটা দিন ভাবুকের মতো কাটলো আলীর। যশোরের পর সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো ঐ তিনজনের কারো সাথেই আর সে কোন সম্পর্ক রাখবে না। গত পাঁচ বছরে কখনও যে নিশির কথা মনে পড়েনি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু সময়ের সাথে সব কিছুই কম বেশী ম্লান হয়। নিশির কথা সে একরকম ভুলেই যাচ্ছিলো। মেয়েটাকে আবার এভাবে দেখার পর তার মনের মধ্যে নতুন করে ঝড় উঠেছে। এতোদিন নিশির কথা ভাবলে বারো তেরো বছরের একটা কিশোরীর মুখ ভেসে উঠতো মানস পটে। সেই খামখেয়ালী কিশোরী যে আজ অপরূপা এক তরুনীতে রূপান্তরিত হয়েছে না দেখলে সে বিশ্বাস করতে পারতো না। এক সময় রুবীর সৌন্দর্যের পাশে ম্রিয়মান দেখাতো নিশিকে। বদলে গেছে সেদিন। তার চেহারায় ক্ষুরধার গাঁথুনী , উজ্জল দৃঢ়তা, পাতলা দু'ঠোটের ফাঁকে খেলে যাওয়া হাসির রামধনু যে কোন পুরুষের মনে বৈশাখী ঝড় তুলে দিতে পারে। আলীর হৃদয়ে ঝড়ের সংকেত অনেক আগেই রোপিত হয়েছিলো। ঘটনাচক্রে এতোদিন তা নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলো। এখন নতুন উদ্যমে মাথা উঁচিয়ে উঠলো।

বানু ছেলের অস্থিরতা লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার জানতে চাইলো। কিছু হয়েছে কিনা। আলী খোলাসা করে বলে না। জানে মা নিশির কথা শুনলে আবার আশায় বুক বাঁধবে। নিশি সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। কোন খবরই রাখেনি গত কয়েকটা বছর। তার জীবনে কি ঘটেছে না ঘটেছে কে জানে? সেখানে কি আলীর আর কোন স্থান আছে? সে দিন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানিয়েছিলো নিশি। শেষ মুহুর্ত একবার পিছু ফিরে তাকিয়েছিলো। সেখানে কি কোন সংকেত ছিলো? সে কি বলতে চেয়েছিলো আলী যেন তাকে দেখতে যায়? মনের চোখে নিশির পিছু ফিরে তাকানোর দৃশ্যটা বহুবার দেখেছে সে। তার চোখের তারায় কি দুর্বলতার ইঙ্গিত ছিলো? পড়াশুনা ফেলে সে কি একবার যাবে বোটানি ডিপার্টমেন্টে?

মানসিকভাবে এমন অস্থির থাকলে কি পড়াশুনা এগোয়? শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই একবার চক্কর দেবার সিদ্ধান্ত নেয় আলী। ভয়ও করে কিছুটা। যদি ওকে দেখে বিশেষ পাত্তা না দেয় নিশি? যদি দায়সারা ভাবে

হাত নেড়ে নিজের পথে চলে যায়? নিশির কাছে নিজেকে সবসময় গুরুত্তপূর্ণ ভেবেছে আলী। তাকে না দেখে থাকা সম্ভব কিন্তু তার অবহেলা কি সহ্য হবে ?

ডিপার্টমেন্টের মুখেই নিশির সাথে দেখা হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য ঠিক ঠাহর করতে পারে না আলী। দুজন বান্ধবীর সাথে পড়াশুনা নিয়ে আলাপ করছিলো হয়তো। কারন নোট শব্দটা কানে এলো আলীর। আলীকে দেখে ঠান্ডা চোখে কয়েক মুহুর্ত তাকিয়ে থাকলো, যেন মাপছে ওকে। বোঝার চেষ্টা করছে হঠাৎ এদিকে আসার পেছনে আলীর সত্যিকারের কারণটা কি? মেয়েরা নাকি এসব ঝট করেই ধরে ফেলে। আলীর বিচলিত ভাব আর নার্ভাস হাসি দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলো সে। বন্ধুদেরকে পেছনে ফেলে ওর দিকে এগিয়ে এলো।

"ভুল করে চলে এলেন?" তার দু'ঠোটের ফাঁকে সবজান্তার হাসি। আলীর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে। কিন্তু ধাক্কাটা ভালো লাগছে। অনেক ভয়ে ভয়ে এসেছে সে।

"এদিকে একটা কাজে এসেছিলোম, ভাবলাম..... তোমার নিশ্চয় ক্লাশ আছে? " আলী তোতলাতে থাকে। নতুন উপসর্গ। নিজেকে এভাবে তোতলাতে এর আগে কখনও শোনেনি সে।

"ক্লাশ নেই এখন। বাসায় চলে যাচ্ছি।" নিশি স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো।

"চলো, তোমাকে রিক্সা ডেকে দেই।"

"আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। বাসায় গিয়ে পড়াশুনা করেন। সামনেই পরীক্ষা।" নিশি মুরুব্বীদের মতো কথা বললো।

হেসে ফেললো আলী। "বদলাওনি।"

"এসেছেন কেন?" চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে নিশি, গম্ভীর।

"না, মানে ..... সেদিন ওভাবে চলে এলে। ভাবলাম একটু খবর নেয়া উচিৎ....."

"চিন্তার কিছু নেই। আমি ঠিকই আছি। কোন বিপদ হয় নি। এবার গিয়ে পড়েন। পরীক্ষার তো বেশী বাকী নেই।"

আলী মুচকি হাসলো। "তুমি দেখি আমার মায়ের মতো কথা বার্তা শুরু করলে।"

নিশির ঠোঁটের ফাঁকে আলতো এক টুকরো হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। "বানু খালা কেমন আছে?"

"ভালো। ঢাকাতেই থাকে আমার সাথে।"

"বলেছেন আমার কথা?"

ঘাড় নাড়ে আলী। সত্যি কথাই বলে। ঘাড়টা কাত করে ওকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে দেখে নিশি। "আমি একদিন দেখতে আসবো তাকে। কোথায় থাকেন?"

"পরিবাগে। ছোট জায়গা। তোমার ভালো লাগবে না।"

"আমি কি জায়গা দেখতে যাবো, আলী ভাই?" নিশি ভ্রু কুঁচকে বললো। ঘড়ি দেখলো। "বাসায় ফিরতে হবে। যাই।" হিলে খটাখট শব্দ তুলে কলেজ রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করে সে। গেটের ওপাশে রিক্সা, ট্যাক্সি পাওয়া যায়। আলী অনুসরণ করবে কিনা বুঝতে পারে না। বেশ কিছু ছেলে মেয়ে কৌতুহলী হয়ে তাকিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এতো মেয়ের মাঝেও চোখ কাড়া সুন্দরী নিশি। তার সাথে কথা বলতে দেখলে অনেকেরই চোখ টাটাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে এমন একটা ভান করলো যেন ডিপার্টমেন্টে তার সত্যিই কোন দরকার ছিলো। ভেতরে ঢুকে এদিক সেদিক হেঁটে ফিরতি পথ ধরলো। নিশি এমন ঝট করে চলে যাবে ভাবে নি সে।

নিশির কথা বানুকে জানাতেই হয়। যা ভেবেছিলো তার অন্যথা হয় না। বানুর চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। "সত্যিই দেখা হয়েছে তোর সাথে? কেমন দেখতে হয়েছে এখন? তোর সাথে কথা বললো? আমার কথা জিজ্ঞেস করেছে? একদিন নিয়ে আয় না।"

সবকিছু খুলে বলে নি আলী। বলার মতো তেমন কিছু আছে বলেও ভাবে নি। নিশি শারীকিভাবে অনেক বদলেছে। মানসিকভাবে কতখানি বদলেছে এখনও বোঝার অবসর হয় নি। কিছুটা যে বদলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অস্বাভাবিক দৃঢ়তা এবং খামখেয়ালীপনা এখনও আছে। সপ্তাহ খানেক অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে আলী। কিন্তু তার মনের মধ্যে ঝড়ের প্রকোপ যেন একাধারে চলতেই থাকে। যতই সে ভাবে মেয়েটার কথা ভাববে না ততই বেশী করে মনে পড়ে। এতোকাল যে শূন্যতাটুকু সে নিঃসাড়ে চাপা দিয়ে রেখেছিলো সেটাই যেন হঠাৎ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে প্রকট রূপ ধারণ করে। তার কিছুই ভালো লাগে না। বানু ছেলেকে চেনে। সে ইঙ্গিতে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বলে। কার্জন হলে চক্কর দিয়ে আসলে ভালো লাগবে। কিন্তু আলীর ভয়টা সে দিনের আলাপের পর কিছুটা বেড়েছে ..... নিশি কথা বলেছে; কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের জের সেখানে কতটুকু ছিলো সেটা পরিষ্কার নয়। এই মেয়েটিই যে তাকে ডজন ডজন চিঠি লিখেছে কৈশোরে তার আচরণে সেটা বোঝা যায় নি। নিশি কি সব

ভুলে গেছে? সে সব চিঠি এখনও আলীর কাছে আছে। আলী বানু ঘুমিয়ে গেলে সেইসব ছেলেমানুষী চিঠি পড়ে একা মনে হাসে। কত কি আবোল তাবোল লিখেছে নিশি। ভালো লাগা, ভালোবাসার কথা কোথাও লেখেনি। কিন্তু সবখানে হৃদ্যতার ছাপ। বিশ্বাসের ছাপ, আস্থার ছাপ। মেয়েটির মানসিক পরিপক্কতার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে সেখানে। একাধারে ছেলেমানুষী এবং পরিনত চিন্তার অপূর্ব সহমিশ্রণ। হাসিও লাগে, ভালোও লাগে।

ঠিক এক সপ্তাহ পর, একই দিনে আবার যায় আলী। এবার আর বোটানি ডিপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় না। গেটের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা ঝুঁকি নেয়। ধরে নেয় নিশি হয়তো ক্লাশ শেষে সেদিনের মতো আজও এখানে এসে রিক্সা নেবে। যদি তার প্ল্যান পাল্টে থাকে তাহলে দেখা হবে না। না হলো। আলীকে একটা চেষ্টা করতেই হতো। আবার নিশিকে দেখার জন্যেই এসেছে এটাও বুঝতে দিতে চায় না। বেশী আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিশির হয়তো ব্যাপারটা ভালো নাও লাগতে পারে। তাছাড়া তার যে ইতিমধ্যেই কোন বন্ধু জোটেনি সেটাই বা আলী কি করে ধরে নেবে? সে হয়তো একটা কড়া কথা বলে বসতে পারে।

নিশি ওকে দূর থেকেই দেখে ফেললো। তার সাথে একজন বান্ধবী ছিলো। সে তাকে কিছু একটা বললো। মেয়েটি মুচকি হেসে অন্য পথে চলে গেলো। সাবলীল গতিতে হেঁটে এলো নিশি। গম্ভীর থাকার চেষ্টা করছে কিন্তু তার চোখে মুখে কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে। আলী ব্যর্থ অভিনয় করবার চেষ্টা করে। "নিশি! বাসায় ফিরছো? এদিকেই একটা কাজে এসেছিলাম।"

ঘাড় কাত করে তাকালো নিশি। "পড়াশুনা কেমন চলছে?"

'ভালো। মোটামুটি গুছিয়ে এনেছি।"

"দেখে তো মনে হয় না গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যেস আছে।"

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। নিশির দু'চোখ হাসছে। আলী মাথা চুলকায়।

"সরি। খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিলো।"

"কেন?" সরলতা নিশির মুখে।

আলী কেশে গলা পরিস্কার করে। তার পুরানো দিনের কথা টেনে আনতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সাহস পায় না। নিশির সেসব কথা হয়তো তেমনভাবে মনে নেই। এতো দ্রুত সব ভুলে যাবার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সেসব কথা আলী যেভাবে বছরের পর বছর জড়িয়ে বসে আছে সে হয়তো সেভাবে তা মনে রাখে নি।

"মা তোমার কথা বলছিলো। যেতে বলেছে।"

"যাবো। এটা বলার জন্যেই এসেছেন?" নিশি নাছোড়বান্দা।

লাজুক হাসি দেয়ে আলী। "খামাখা নাজেহাল করছো কেন? কোথায় থাকো তুমি? হোষ্টেলে? হাঁটবে?"

"হোষ্টেলে থাকি না। হাঁটা পথ নয়।" নিশি সবটুকু তথ্য জোগান দিলো না। আলীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে তার বাসস্থান আলীকে জানাতে চায় না। সেটা নিয়ে আর জোরাজুরি করে না সে।

"তোমরা সবাই কি ঢাকায় থাকো এখন?"

"নাহ। বাবা-মা এখন বগুড়াতে। মিঠু ভাইয়ের সাথে কথা নেই কেন?"

প্রশ্নটা আচমকাই আসে। যশোরের পর মিঠুর সাথেও আর দেখা করেনি আলী। জেনেছে মিঠু বুয়েটে ভর্তি হয়েছে। কার্জন হলের দিকে তার আসা পড়ে না। আলীও গত পাঁচ-ছ বছরে হয়তো দু'তিন বার ওদিকে গেছে। মিঠুর সাথে সে দেখা করতে চায় নি। তার কেন যেন ধারণা মিঠু জানতো যশোরে সেই সন্ধ্যায় কি হবে। সেই জন্যেই সে আগেই সরে পড়ে। সেই ঘটনা তার কাছে আজও রহস্য। কিন্তু রাগ এবং ক্ষোভটুকু এখনও সমানভাবে জাগরুক। আশ্চর্যের কথা মিঠুও তার সাথে যোগাযোগ করার তেমন কোন চেষ্টা করেনি। অপরাধবোধ না থাকলে এমন প্রতিক্রিয়া তার হতো না। আলী তাকে এড়িয়ে চলছে বুঝলে কেন সেটা তার জানার কথা ছিলো না। মিঠু সবই জানতো। নিশ্চয় জানতো।

শ্রাগ করে আলী। "দু'জন দু'জায়গায় পড়াশুনা করেছি। দেখা হবার সুযোগ খুব একটা ছিলো না। কেমন আছে?"

কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিশি। "আপনার বন্ধু আর আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?"

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে আলী। "মার সাথে কবে দেখা করবে? ক'দিন ধরে খুব বলছে তোমার কথা।"

একটা রিক্সা নেয় নিশি। "আসেন।" আলীকে তার পাশে উঠে বসতে বলে।

একটু ভড়কে যায় আলী। "উঠবো? কোথায় যাবে?"

"ওঠেন তো।" বিরক্ত হয় নিশি।

রিক্সার অপ্রশস্ত সিটে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়। হুড তুলে দেয় নিশি। রিক্সায়ালাকে শাহবাগ মোড়ে যেতে বলে। শরীরে শরীরে ছুঁয়ে যায়, মাতাল করা গন্ধে মাথা ঝিম ঝিম করে। মনের মধ্যে বুদবুদ করে অনেক কথার ফুলঝুরি ওঠে। কিন্তু কিছুই বলে না আলী। নিশি কোথায় যাচ্ছে সে জানে না। কিন্তু না জানলেও ক্ষতি নেই। মেয়েটার পাশে বসে থাকতেই তার ভালো লাগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এতা গুলো বছরে কোন মেয়ের দিকেই তেমনভাবে ফিরে তাকায়নি। কারো সাথেই সাধারণের বেশী সখ্যতা গড়ে ওঠেনি। কেউ যে কখন আগ্রহ দেখায় নি তা নয় কিন্তু ভেতর থেকে সে নিজেই কোন আগ্রহ অনুভব করে নি। এসব ব্যাপারে আর জড়াতে চায় নি। কিন্তু নিশির কথা ভিন্ন। যশোরের ঘটনায় যদি নিশির হাত থেকে থাকে তাতেও ক্ষতি নেই। এই মেয়েটার জন্য সে অনেক পথ পাড়ি দিতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা হয় না। রিক্সায়ালা একই ছন্দে রিক্সার প্যাডেল মারে। রাস্তাটা সমতল। রিক্সা সাবলীল গতিতেই এগিয়ে চলে। "খুলনার কথা খুব মনে পড়ে।" শেষ পর্যন্ত কথা বলে নিশি।

"আমারও।"

"মিথ্যে কথা।"

"না। মিথ্যে নয়। সবসময় ভাবি।"

"কিসব ছেলেমানুষী কাজ করেছি।" তরল গলায় হাসে নিশি। "কত্তোগুলো চিঠি লিখেছিলাম আপনাকে। মিঠুভাই আবার সেসব নিয়ে কি সব কান্ড করলো। খুব ক্ষেপে গিয়েছিলাম।"

"মনে হয় গত কালকের ঘটনা।"

"এতো বছর ঢাকায় আছেন। কোন বান্ধবী নেই কেন?" নিশির দু'ঠোটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি।

হঠাৎ এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না আলী। একটু থতমত খেয়ে যায়। "নাহ্। ওসব নিয়ে ভাবিনি। খুলনার পর ওদিকটাতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকায় নিশি। "কেন?"

"জানোইতা। জিজ্ঞেস করছো কেন?"

"জানি? কি জানি? জানি না। আপনি বলেন। আবার দেখা হবে ভাবিনি। দেখা যখন হলোই তখন খোলাসা হওয়াই ভালো। এখনও আমাকে ভালোবাসেন?"

এমন সরাসরি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না আলী। নিশির চোখে চোখ রাখে সে। এতো কাছ থেকে চোখ জোড়াকে খুব তরল মনে হয়। শান্ত হ্রদের মতো লাগে, তলহীন গভীর কালো জল। হৃৎপিন্ডের তড়পড়ানি শুনতে পায় আলী। আজ সকালেও সে ভাবেনি নিশি তার সাথে আবার কথা বলবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার বুঝতে অসুবিধা হয় না গত কয়েকটা বছর তারা দু'জন দু'জনার প্রতীক্ষাতেই বসেছিলো। কেউ কাউকে খোঁজার চেষ্টা করেনি। কিন্তু মনের গভীরে এইটুকুন একটা আশা নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছিলো যদি আবার দেখা হয়। সে কোন উত্তর দিতে পারে না। শুধু মাথা দোলায়। তার দু'চোখ ভিজে ওঠে। এতো অসম্ভব আবেগের উচ্ছ্বাস সে জীবনে কখনও অনুভব করে নি। নিশির দুই ঠোঁট অভিমানে বাঁকা হয়ে ওঠে। তার দু'চোখও ছল ছল করে। তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়।

"খোঁজেন নি কেন আমাকে? কি ভেবেছিলেন? আমিই আপনার কাছে আসবো?"

"খুঁজতে সাহস হয় নি।"

"কেন?"

"আমি সাহসী মানুষ নই। মিঠুদের মতো না। তুমিতো জানো।"

নিঃশব্দে কাঁদছে নিশি। তার চিবুক বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে। "কতদিন ভেবেছি কিছু একটা পাবো - একটা চিঠি, কার্ড, ফোন কল। কিচ্ছু না। মিঠু ভাই তো জানতো আমাদের ঠিকানা। ফোন নাম্বার। পরে জানলাম তার সাথেও যোগাযোগ নেই। ভাবলাম হয়তো ভুলেই গেছে মানুষটা। এখন খুব লাফ ঝাপ দিয়ে এসেছে দেখা করতে।"

সব কথা খুলে বলতে পারে না আলী। যশোরের সেই কাল সন্ধ্যার কথা তোলার কোন যৌক্তিকতা দেখে না। কি আসে যায় তাতে আর? নিশির হৃদয় তার সামনে স্বচ্ছ একটা কাঁচের মতো মেলে রয়েছে। পুরানো দিনের তিক্ত কোন প্রসঙ্গ তুলে সেটা নষ্ট করবার কোন অর্থ হয় না।

"আমার ভুল হয়েছে। তোমার কথা ভেবেছি। যোগাযোগ করতে সাহস হয় নি।"

"এখন খুব সাহস বেড়েছে?"

"আমি তোমাকে আর হারাতে চাই না।"

রিক্সা পি.জি. হাসপাতালের সামনে থেমেছে। চোখ মুছলো নিশি।

"নেমে যান এখানে। দু'দিন পর গেটে আসবেন।"

আলী নেমে যায়। "আমার সাথে একটু বসো কোথাও।"

"না। আজ নয়। বাসায় ফিরতে হবে। আসবেন তো?"

মাথা দোলায় আলী। আসতে না চইলেও তার নিয়তি তাকে টেনে আনবে। চোখ মুছে হাত নাড়ে নিশি। তার কোমল, ভেজা মুখখানা আলীর মনে তোলপাড় তোলে। তার ভেতরে হাহাকার ওঠে। কি ভুল সে করেছে? এই মেয়েটি এতোদিন তার প্রতীক্ষায় দিন গুনেছে আর সে এক অবুঝ অভিমানে নিজেকে অকারণে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তার মাথা চাপড়াতে ইচ্ছা হয়।

নিশির রিক্সা তাকে পাশ কাটিয়ে ফার্মগেটের দিকে চলে যায়। পেছনে পর্দা তুলে আবার তাকায় নিশি। আবার হাত নাড়ে। সর্বহারার মতো দাঁড়িয়ে থাকে আলী। তার কত কি বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো কিছুই বলা হয় নি। ভালো লাগা এবং কষ্টের মাঝামাঝি অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। দুটো দিন কিভাবে কাটবে সে বুঝতে পারে না। দুটা দিন অনেকটা সময়।

২২

শনিবার সকালে নাস্তা সেরে নিশিকে ফোন করলো আলী। মনে মনে ইচ্ছা যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে নিশি এবং টিসাকে নিয়ে দুপুরে কোন ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবে। পরে কোথাও বেড়াতে যাবে। টিসা যেখানে যেতে চায়। গত পাঁচটা দিন কাজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকার চেষ্টা করেছে। খুব শীঘ্রই ফোন করে ফল ট্রিপের প্রেমময় আমেজটাকে নষ্ট করতে চায় নি। তাছাড়া নিশিরও ভাবার সময় দরকার। মানসিকভাবে সে হয়তো এখনও প্রস্তুত নয়।

ফোন ধরলো টিসা। "কেমন আছো আংকেল?"

"ভালো। তুমি কেমন আছো? স্কুল কেমন চলছে?"

"আমি খুব ভালো। স্কুলে যেতে ভালো লাগে না। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে চাকরী করতে চাই। মা আমাকে কিছু কিনে দেয় না। আমারও কোন টাকা পয়সা নেই।" পেছন থেকে কেউ ধমকে উঠলো। খিল খিল করে হাসছে টিসা। "দেখেছো, মা আমাকে বকা দিচ্ছে। তুমি সারা সপ্তাহ কেন ফোন করনি?"

"কাজে খুব ব্যস্ত ছিলাম।" আলী যুতসই কোন জবাব খুঁজে পায় না।

"মাকে দেবো?"

"যদি ব্যস্ত না থাকে।"

"একটু ও ব্যস্ত না। রাগ হয়ে আছে। আগে ফোন করনি তাই।" নিশি চাপা গলায় ধমকে উঠলো। আবার কলকলিয়ে হেসে উঠলো টিসা। টানাটানিতে ফোন ছিটকে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত পর সেটাকে উদ্ধার করে কথা বললো নিশি।

"খুব কাজ ছিলো বুঝি?" কণ্ঠে স্পষ্ট বিদ্রুপ। সে ঠিকই জানে কেন আলী এই ক'দিন ফোন করে নি।

"খামাখা লজ্জা দিচ্ছো কেন? করতে খুব ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু বেশী জ্বালাতে চাই নি।"

"সাহসের অভাব?" নিশি মনে হয় আজ কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে আছে ওকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য।

"চেনইতো আমাকে। একটুও বদলইনি। কয়লা ধুলে কি আর ময়লা যায়?"

একটু নীরবতা। "এটা নতুন। কথা শিখেছো। কি চাই?"

"কোন প্ল্যান না থাকলে কোথাও খেতে যাওয়া যায়।" আমতা আমতা করে বলেই ফেলে আলী। না যেতে চাইলে যাবে না। এতো সংকোচের কি আছে?

নিশি কিছুক্ষণ নীরব থাকে। "মিঠু ভাইকে দেখতে যাবে?"

"মিঠু? কেন? যেতে বলেছে?" একটু অবাকই হয় আলী। নিশির আত্মীয় মিঠু। যত কিছুই ঘটুক যোগাযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক।

"মিঠু ভাইয়ের শরীরটা ভালো না।" নিশি খোলাসা করলো না।

"কি হয়েছে?"

"হার্টের সমস্যা। গত বছর মনে হয় একটা মাইল্ড হার্ট এটাকও হয়ে গেছে। বাসায় মেসেজ রেখেছিলো। যেতে বলেছে। তুমি তো রাগ করে খবরই নাও নি। দুটো ছেলে মেয়ে। যমজ। টিসার বয়সী। জানে তুমি এখানে আছো। খবর দেয় নি। সেই কবেকার কথা এখনও তোমরা ধরে বসে আছো?"

আলী সেই প্রসঙ্গে যায় না। যশোরের ঘটনা সে ভুলতে পারে, ঢাকায় যা ঘটেছিলো সেটা ভোলার কোন সুযোগ নেই। শরীর খারাপ জানলে হয়তো বাল্য বন্ধুর উপর থেকে রাগ ঝেড়ে ফেলে দেখা করতে যেতো। মিঠু যদি জানতোই আলী এখানেই সেই বা কেন খবর নেয়নি? মনে দুর্বলতা। খবর নেবার সাহস পায়নি।

"কোথায় থাকে?" আলী নিশির প্রশ্ন এড়িয়ে যায়।

"নর্থ ইয়র্ক। তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।"

"কথা হয়েছে তোমার সাথে?"

"এই সপ্তাহে হয় নি। যাবে? না রাগ করে বসে থাকবে?"

"আমাকে তো একটা ফোন করতে পারতো?"

"তাকে এখন দেখলে তোমার রাগ পড়ে যাবে। ফেসবুক-এ গিয়ে ছবি দেখো। একেবারে কংকাল হয়ে গেছে।"

আলী ফেসবুক বা ঐ জাতীয় কোন কিছুতে আগ্রহী নয়। কার জীবনে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে জানতে চায় না। কিন্তু মিঠুকে দেখতে ইচ্ছা হয়।

আলী নিশি এবং টিসাকে তার গাড়ীতে তুলে নিতে চেয়েছিলো কিন্তু নিশি রাজী হলো না। সে ট্যাক্সি নিয়ে আগেই চলে গেলো। আলী পৌঁছালো দু'টার দিকে। ইচ্ছে করেই দেরী করেছে। সে চেয়েছে নিশি তার আগে যাক। এতো বছর পর এতো ঘনিষ্ট একজন বন্ধুর মুখোমুখি হতে এতো দ্বিধা থাকাটা ঠিক নয়। সে বোঝে কিন্তু পুরানো অনুভূতি চাইলেই কি নিমিষে মুছে ফেলা যায়?

দোতলা বেশ বড়সড় বাসায় থাকে মিঠুরা। ডাবল পার্কিং। বিশাল চত্বর। গাছপালায় ছেয়ে আছে চারদিক। সুন্দর করে ঘাস চাছা। সবকিছু সাজানো গোছানো। গাড়ী পার্ক করে সিঁড়ি টপকে প্যাটিওতে উঠে আসে আলী। কলিং বেল বাজায়। দরজা খুলতে সময় লাগে। একজোড়া ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়ি করে

দৌড়ে এসে দরজা খোলে। আলীকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভেতরে নিশির গলা শোনা যায়। অন্য একটি নারী কণ্ঠ। টিসা দৌড়ে এলো। "আলী আংকেল! ভেতরে এসো।"

যমজ ছেলেমেয়ে দুটি টিশার চেয়ে সামান্য ছোট হবে। মেয়েটি মিঠুর অবিকল প্রতিবিম্ব, ছেলেটি দেখতে বেশ ভিন্ন। মিঠু ভেতর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। সে আসলেই অনেক রোগা হয়েছে। তার লম্বা শরীরে তাকে আরোও ক্ষীণকায় দেখাচ্ছে। চোখে চশমা। ঠোঁটের ডগায় পাতলা একটা মোচ। জুলফিতে পাক ধরেছে। আলীকে দেখে ম্লান হাসলো। "এসেছিস?" আলীকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে। "ভেতরে আয়। আমার দুই বাচ্চা। রনি আর জিমি। লাইলী, এদিকে এসো। আলী এসেছে।"

লাইলী এবং নিশি একসাথেই লিভিংরুমে এসে ঢোকে। লাইলী খুবই হাসি খুশী। ঝকঝকে দাঁতের সারি, তীক্ষ্ণ চোখ, দেখতে মন্দ নয়। তবে মিঠুর তুলনায় সে বেশ খাটো। রুবীর কথা মনে পড়ে যায়। রুবীর পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা লাইলীর নেই। প্রেমের বিয়ে নাকি পরিবারিক সূত্রে বিয়ে জানে না আলী।

দু মুহূর্তের আলাপেই লাইলীকে ভালো লেগে গেলো আলীর। খুব সহজ ব্যবহার, খোলা মন। বোঝা গেলো ছেলেবেলার অনেক কথাই লাইলীকে বলেছে মিঠু। তবে রুবীর কথা বলেছে কিনা কে জানে? আত্মীয়তার সূত্রে রুবীর সাথে দেখা তো নিশ্চয় হয়েছে। কিন্তু মিঠুর আসক্তির কথা কি জানে? কৌতুহল খুবই খারাপ বস্তু। আলী নিজেকে অপরাধবোধ করে।

ঘন্টা দুয়েক সেখানে থাকলো আলী। ভালোই কাটলো সময়টা। পুরানো দিনের কথা উঠলেও ভালো স্মৃতিগুলো নিয়েই রোমন্থন করলো। ক্যাডেট কলেজের কথা, খুলনার ছোটখাটো স্মৃতি, অন্য বন্ধুদের কথা। লাইলী এবং নিশিও যোগ দেয়। বেশ একটা আড্ডা জমে ওঠে। লাইলী মজা করে কথা বলে। কৌতুক বলে খুব হাসালো। সর্দারজী জোক।

এক সর্দারজী বাসে উঠবে। সে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে দুটি টিকিট চাইলো। ক্লার্ক বললো একটা না কিনে তুমি দুটো কিনছো কেন?" সর্দারজী বুদ্ধিমানের মতো হেসে বললো, "যদি একটা হারিয়ে যায় তখন যেন অসুবিধা না হয়, সেই জন্যে।" যদি দ্বিতীয়টাও হারিয়ে যায়? "ক্লার্ক কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়। সর্দারজী পকেট থেকে বাসের পাস বের করে দেখায়।" তখন এই পাস দেখাবো।"

লাইলীর কৌতুক ভান্ডারে কৌতুকের কমতি নেই। হাসাতে হাসাতে পেটে ব্যথা ধরিয়ে দিলো সে। বহুকাল পর ভয়ানক একটা ভালো লাগার অনুভূতি হলো আলীর। মিঠুর শরীরটা হয়তো খানিকটা কাবু হয়েছে কিন্তু লাইলী তার আর সব শূন্যতা পূর্ণ করেছে। এমন একটি স্ত্রী আর দুটি অপূর্ব সুন্দর সন্তান

থাকতে মিঠুর আর কিসের অভাব। মিঠু পার্টটাইম কাজ করে। লাইলী ফুল টাইম। আর্থিকভাবে তাদের কোন সমস্যা নেই।

রাতে খেয়ে যাবার জন্য খুব জোরাজুরি করলো লাইলী। কিন্তু রাজী হলো না আলী। হঠাৎ এসে পড়ে বিব্রত করেছে। তার উপর রাতেও জাকিয়ে বসে থেকে বেচারীদের সারা দিনটা সে নষ্ট করতে চায় না। শনিবার রাতে সবারই কোন না কোন প্ল্যান থাকে। সে বরং চাইছিলো নিশি এবং টিসাকে নিয়ে কোথাও যাবে। কিন্তু নিশি তেমন আগ্রহ দেখালো না। সে হয়তো তাড়াতাড়ি এগুতে চায় না। ধরে নিলো আলী। জোরাজুরি করলো না। নিশি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেলো। মিঠু আলীকে সাথে নিয়ে ফুটপথে নেমে এলো। ম্লান কণ্ঠে বললো, "পুরানো কথা তুলতে লজ্জা হয়, কিন্তু তবুও কিছু কিছু কথা থাকে যা ভোলার মতো নয়। জানি আমার উপর তোর ক্ষোভ আছে। দোষ আমারই। ক্ষমা করে দিস। কবে চলে যাই। হার্টের অবস্থা ভালো না। চিকিৎসা চলছে। কিন্তু ভরসা পাই না।"

আলী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। "তুই এতো কাছে থাকিস জানতাম না।"

"আমি জানতাম। ইচ্ছে করেই জ্বালাইনি। যত বারই দেখা হয়েছে ততবারই একটা না একটা ঝামেলা হয়েছে।"

"তা ঠিক। এবার হয়তো লাইলীকে নিয়েই লেগে যাবে। এমন একটা দারুণ বউ পেয়েছিস। আমারটা ফুটে গেছে।"

মিঠু হো হো করে হাসলো। "বলবো লাইলীকে। খুব মজা পাবে। পিয়ার কথাও শুনেছি। আমাদের দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের পরিচিতা। দুনিয়াটা বেশী বড় না। নিশিওতো একা। লেগে যা।"

হাসে আলী। "নিশিকে তো চিনিস। আমি তো এক পায়ে খাড়া।"

মিঠু হাসে। "একদম বদলায়নি মেয়েটা।"

কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে দু'জন। কেউই রুবীর কথা তোলে না। আলী অবশেষে বলে, "যাই রে। আসবো আবার।"

ওর কাঁধে আলতো করে হাত রাখে মিঠু। "একটা কথা বলার জন্য তোকে এখানে ডাকলাম। একটা না, দুটো।"

"থাক, পুরানো দিনের কথা আর তুলিস না।"

"আমার নিজের জন্য দরকার। তুই আমার প্রিয় বন্ধু ছিলি। আমি যা করেছিলাম সেটা অন্যায় ছিলো। যশোরের ঘটনার জন্য আমিই দায়ী ছিলাম। রুবীই সাজিয়েছিলো। এতো মারবে বুঝিনি। অন্ধভক্ত ছিলাম রে। যা বলেছে তাই করেছি। নিশির সাথে ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমার তাতে জড়ানোর কোন দরকার ছিলো না।"

"বাদ দে। ওসব নিয়ে আর ভাবি না। সেই কবেকার ঘটনা।"

আলী হেসে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু মনে মনে সে জানে বন্ধুর মুখ থেকে এই সরল স্বীকারোক্তিটুকু পাবার তার দরকার ছিলো। একটা অন্ধকার পর্দা যেন হঠাৎ সরে গেলো। মিঠু বলেছে, ভালো হয়েছে।

মিঠু বিড়বিড়িয়ে বলে, "ভার্সিটিতে তোর গায়ে হাত দিয়েছিলাম। এটা যখনই মনে হয়েছে অনেক কষ্ট পেয়েছি। তোর কোন দোষ ছিলো না।" মিঠুর চোখের কোণ ভিজে ওঠে।

আলী হেসে ওঠে। "কবেকার ঘটনা বলতো? তুই কি ভেবেছিস ওসব এখনও মনে আছে? যা, বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে।"

দু'জনে হেঁটে আলীর গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আলী গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দেয়। জানালায় টোকা দিয়ে খুলতে বলে মিঠু।

"আবার আসবি তো?"

"আসবো। লাইলীকে দেখতে।"

দু'জনেই হাসে। "আবার মার খাবি।" মিঠু ঠাট্টাচ্ছলে বলে। "শোন। লাইলী রুবীর কথা জানে না। ওকে কিছু বলিস না।"

"রুবী? কোন রুবী?" আলী অভিনয় করে।

মুচকি হাসে মিঠু। "আসিস আবার। নিশিকে ছাড়িস না। লেগে থাকিস। এখনও অনেক খামখেয়ালী।"

"ওর সাথে ওর বাবা-মায়ের কি হয়েছে জানিস?"

মিঠু হঠাৎই গম্ভীর হয়ে পড়ে। মাথা নাড়ে। হাত নেড়ে ফিরতি পথ ধরে। আলী একটু অবাক হয়। কিন্তু তার মাথায় সেই চিন্তা জেকে বসার সুযোগ পায় না। ফিরতি পথ ধরে সে।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পরদিন সকালে আবার ফোন করলো আলী। নিশি যদি রাগ করে করুক। নিশিকে ওর খুব একা পেতে ইচ্ছা করছে। টিসা থাকুক, ক্ষতি নেই। ওর সমগ্র জীবনে একটি পরিবার হিসাবে কখনও কোথাও যায় নি ও। ওর ভেতরে একটা অদম্য আগ্রহ আছে সেই ব্যাপারে। কি আর হবে? বড় জোর যেতে রাজী হবে না নিশি। আলীকে তো চেষ্টা করতে হবে। সারাটা জীবনতো কে কি বলবে সেই ভয়েই কাটিয়ে দিলো।

ফোন ধরলো শওকত। সাধারণত খুব প্রাণখোলা সে। বিশেষ করে আলীর সাথে সে খুবই উচ্ছল। হাসি ঠাট্টা চলে সব সময়। আজ আলাপ ঠিক সেভাবে চললো না। শওকতকে মনে হলো সংযত এবং গম্ভীর। "কেমন আছো ভায়া?"

"ভালো। মামা। আপনারা ভালো?"

"আছি এক রকম।" মামা চুপ করে থাকলো। তার জন্য এটা অস্বাভাবিক। আলীর মনে খটকা লাগলো। মামা কি চায় না আলী ফোন করুক। হিসাব মেলে না। হঠাৎ কি হলো?

"নিশি কি বাসায় আছে, মামা?" আলী সাহস করে বলেই ফেলে।

"আছে কিন্তু এখন মনে হয় না কথা বলতে পারবে। একটু ব্যস্ত।" মামা ব্যাখ্যা করে না। আলী নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়।

"আমি তাহলে পরে আবার ফোন করবো।"

"করো। ভালো থেকো।" মামা ফোন রেখে দেয়।

আলী খুবই বিস্মিত হয়। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারে। কিন্তু মাত্র একটা রাতের ব্যবধানে কি এমন হতে পারে? তার মনের মধ্যে খচ খচ করতে থাকে। কিন্তু আবার ফোন করাটা খুবই অভদ্রতা হবে। যদি বলার মতো কিছু হতো তাহলে শওকত তাকে খুলেই বলতো।

পরবর্তি দুটা দিন ভীষণ অস্থিরতার মধ্যে কাটালো আলীর। কাজে মন বসাতে অনেক কষ্ট করতে হলো। তার পৃথিবী হঠাৎ করেই খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে নিশির চিন্তা ঘুরপাক খেয়েছে। সমস্যা হচ্ছে এখানে এমন আর কেউ নেই যাকে ফোন করে সে কিছু জানতে পারবে। জানতে চাইলে তারা অবাকও হবে। শওকত কিংবা লায়লাই তার একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেদিন যদি শওকত তাকে খুলে না বলে থাকে, আবার ফোন করে বিরক্ত করলেই যে বলে দেবে, তেমন মনে করাটা কি সমীচিন? অনেক

ভাবনা চিন্তার পর অফিস থেকেই ফোন করলো আলী। মামা-মামীর তখনও বাসায় ফেরার সময় হয় নি। টিসা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। নিশি যদি ফোন না-ও ধরে টিসা হয়তো ধরবে। টিসা তাকে নিশ্চয় খোলাসা করে বলবে।

দু'বার রিং হতেই টিসা ধরলো। সে যেন জানতই ফোনের অন্যপাশে কে। "কেমন আছো আলী আংকেল?"

"তোমরা কেমন আছো?" আলী তার কণ্ঠের উদ্বেগটা লুকিয়ে রাখতে পারে না। টিসার কাছেও সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

"ভেবো না। আমরা ভালোই আছি।" টিসা গলা নামিয়ে বলে। "রুবী খালা ফোন করেছিলো দু'দিন আগে। তারপর থেকেই মা খুব আপসেট। মাঝে মাঝেই হয় এরকম। আবার ঠিক হয়ে যায়। ডিপ্রেশন।"

আলীর বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। রুবী কেন ফোন করেছিলো? ফোনের ওপাশে নিশির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা যায়। জানতে চাইছে টিসা কার সাথে কথা বলছে। টিসা সতর্ক কণ্ঠে বললো, "আলী আংকেল।" কিছুক্ষণ নীরবতা। ফোন হাত বদল হলো। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। কোন কথা বললো না নিশি। সে আশা করছে আলী কিছু বলবে।

"নিশি?"

"বলো।"

"অসময়ে করলাম। খুব চিন্তা হচ্ছিলো। সেদিন মামার সাথে কথা হয়েছিলো। মনে একটু খটকা লাগলো। কিছু হয়েছে?"

আবার নীরবতা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা যায়। "কি হয়েছে তোমার ধারণাও নেই।"

"আমি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?"

আবার নীরবতা। নীচু কণ্ঠে টিসাকে চলে যেতে বললো নিশি।

দরজা ভেড়ানোর শব্দ পেলো আলী।

"আলী ভাই। আমরা দু'জন সারাজীবন ধরে অনেক খেললাম। এভাবে আর কতদিন? কি চাও তুমি আমার কাছে?" তার কণ্ঠ সংযত, শীতল।

আলী একটু ভড়কে যায়, কিন্তু সেটা বুঝতে দেয় না। আর ভয় পাবে না সে। কিছু চাইলে সেটা দৃপ্ত কণ্ঠে চাওয়াটাই ভালো নইলে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। "আমি নতুন করে জীবন গড়তে চাই।"

"এসব মারফতি কথা বলো না। আমাকে বিয়ে করবে?"

"যদি তুমি চাও।"

"আমি চাই কিনা সেটা পরে বলবো। আগে বলো তুমি কি চাও? টিসার বাবা হতে পারবে?"

"পারবো।" আলীর কণ্ঠে হঠাৎই অসম্ভব দৃঢ়তা চলে আসে।

"কখন কারো বাবা হয়েছো? বাবার কি দায়িত্ব সেটা কি তুমি জানো? তোমার নিজের তো বাবা ছিলো না। টিসা তোমাকে পছন্দ করে। তার অর্থ এই নয় যে সে তোমাকে বাবার মতো দেখবে।"

"তুমি ওকে নিয়ে ভেবো না। ওর সাথে আমার কথা হয়েছে। নিজের বাবা না থাকলেও ভালো বাবা হওয়া যায়। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো। এখন বলো, তুমি কি চাও?"

আবার নীরবতা। "তুমি জানো আমি কি চাই।"

"তাহলে বাধা কোথায়? আমি মামার সাথে কথা বলবো? কিংবা তোমার বাবা-মায়ের সাথে? পিয়ার সাথে ডিভোর্স নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।"

"শুধু নিজের দিকটাই দেখছো?"

আলী থমকে যায়। নিশির কথা পরিষ্কার হয় না। সে ঝট করে কিছু বলে না। নিশির নিশ্চয় আরোও কিছু বলার আছে। সে অপেক্ষা করে। কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত নিঃশব্দ কাটে।

"আমার সাথে ফ্লোরিডা যাবে?" হঠাৎ জানতে চায় নিশি।

"ফ্লোরিডা?"

"হ্যাঁ। মায়ামী। রুবী আপার কাছে। একদিনের জন্য।"

একটু থমকায় আলী। "রুবী ভালো আছে?"

“গেলেই দেখবে। অফিসে ছুটি নিতে পারবে?”

“কবে যেতে চাও?”

“আজ রাতে কিংবা কাল সকালে, রাতে - যখন তোমার সুবিধা হয়ে।”

“অফিসে অসুবিধা হবে না। টিসা এখানেই থাকবে?”

“হ্যাঁ। মামীর কাছে থাকবে।”

নিশি যে খুলে কিছু বলবে না সেটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে আলীর কাছে। সে আর জোরাজুরি করলো না। অফিসে ছুটি নেয়াটা খুব সমস্যা হবে না। “ঠিক আছে, আমি টিকিট কেটে জানাচ্ছি।”

“আমিই কাটবো। তোমার কোন খরচ হবে না।”

“খরচের কথা তুলছো কেন?”

নিশি কিছু বলে না। তার নিজের কাছে অনেক টাকা পয়সা থাকার কথা নয়। এখানে এসে এখনও কাজ কর্ম শুরু করেনি।

শওকতের কাছেই হাত পাততে হতো।

আলী ফোন রেখে দিয়ে মায়ামীর দু'টি টিকিট কাটে, পরদিন সকালে। অফিসে তার বসকে ফোন করে পারিবারিক ইমার্জেন্সী জানিয়ে দু'দিনের মৌখিক ছুটি নিয়ে নেয়। ইমেইল করে তার টিমকে জানিয়ে দিলো সে একটু বাইরে যাচ্ছে, তারা যেন দু-একটা দিন কোন রকমে চালিযে নেয়। নিশিকে ফোন করে ফ্লাইটের সময় জানিয়ে দিলো। ঠিক হলো টিসা সময় মতই স্কুলে যাবে। আলী নিশিকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টে চলে যাবে। মামী হাফ ডে অফিস করবে। টিসার স্কুল শেষ হবার আগেই মামী বাসায় ফিরে আসবে।

রাতে ছটফট করে কাটালো আলী। নিশি কিছুই খোলাসা করে নি। কোন ইঙ্গিতও দেয়নি। রুবীর কি কিছু হয়েছে? বহুদিন তার কোন খবরই রাখে নি আলী। রাখার প্রশ্নও ওঠেনি। এই মেয়েটা তার জীবনের প্রথম ভালোবাসা। খুব সম্ভবত তাকে সে অল্প কিছুটা হলেও ঘৃনা করে। ঘৃনা শব্দটা ভাবতে চায় না আলী। রুবীকে ঘৃনা করা যায় না। তার আলোময় উপস্থিতির সামনে মহাবীরও তরল হয়ে যেতে পারে। তবে রুবীর প্রতি তার উষ্মা আছে। পিয়ার সাথে তার সংসার করা হয় নি। মান অভিমানেই সময় কেটে

গেছে; কিন্তু তার প্রতিও কখনো এমন উষ্ণা সে বোধ করে নি। মায়ামীতে আবার কি হবে কে জানে? কিন্তু নিশি যদি চায় সে যাবে। পুরানো দিনের কথা আবার ঘুরতে থাকে মাথায়।

২৩

নিশির কথা মতো দু'দিন বাদে কলেজ রোডের গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো আলী। অনেকক্ষণ। নিশি এলো না। তার খটকা লাগলো। নিশি কি ভুলে গেলো? অন্য কোথাও চলে গেলো? কোন বিপদে তো পড়েনি? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করে বোটানি ডিপার্টমেন্টে গেলো। অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে জানা গেলো প্রথম বর্ষের এখন কোন ক্লাশ নেই। তবুও চারদিকে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করলো সে। যদি নিশির বান্ধবীদের কারো সাথে দেখা হয়। দুটি মেয়েকে সে চেনে। ঘোরাঘুরিতে কাজ হলো। গোলমালের দিন যে মেয়েটা নিশির সাথে ছিলো তাকে মাঠে পাওয়া গেলো। অনেকগুলি ছেলে মেয়ে মিলে ঘাসের উপর গোল হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিলো। আলীকে বোধহয় সে চিনতে পারলো। কারণ দৌড় দিয়ে এলো।

"নিশিকে খুঁজছেন?"

আলী মাথা নাড়ে। নিশি তার সম্বন্ধে বন্ধুদেরকে কি বলেছে সে জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হৃদয় সংক্রান্ত ব্যাপার সবসময়েই মুখরোচক আলাপে পরিণত হয়। সে এখন যথেষ্ট সিনিয়র। প্রথম বর্ষের ছেলে মেয়েরা হাসাহাসি শুরু করলে বেইজ্জতিই হবে।

"ওর তো একটা এক্সিডেন্ট হয়েছিলো। দু'দিন আগে। তেমন খারাপ কিছু না। একটা কার ওর রিক্সাকে ধাক্কা দেয়। রাস্তায় পড়ে হাতে পায়ে ব্যথা পেয়েছে নিশি। আপনি ভাববেন না।"

আলী চোখে অন্ধকার দেখে। ওকে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময়েই হয়েছে। মন্দের ভালো বেশী ক্ষতি হয় নি। কিন্তু নিজ চোখে একবার দেখা দরকার।

"ওর ঠিকানাটা আছে তোমার কাছে?" চক্ষুলজ্জা ভুলে জিজ্ঞেস করে বসে আলী।

একটু থমকায় মেয়েটা। "আপনার কাছে নেই?"

"দিতে ভুলে গেছে। ফোন নাম্বারটাও হারিয়ে ফেলেছি।"

মিথ্যে বলে। বোঝাই যায় মেয়েটি ধরেই নিয়েছে আলী এবং নিশির মধ্যে একটা হৃদ্যতা আছে।

মেয়েটি উদারতার পরিচয় দিয়ে নিশির ঠিকানাটা লিখে দিলো। ফার্মগেট পেরিয়ে একটা আবাসিক এলাকায় এসে রিক্সা থামে। ভাড়া মিটিয়ে দেয়। বাসা খুঁজে পেতে অসুবিধা হয়ে না। দোতলায় উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে। কলিং বেল বাজায়। তার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপানি। নিশি রাগ করবে না তো? বার দুয়েক বেল বাজানোর পর দরজা খুলে গেলো। রুবী। নীল শাড়ী পরনে, ঘন কালো চুল পিঠময় নিটোল ভঙ্গীতে ছড়ানো, সেই অপূর্ব সুন্দর মুখ, ঝকঝকে হাসি, পাগল করা শরীরের বাঁক। অনেকদিন পর দেখলো তাকে আলী। নয়নাভিরাম একটি দৃশ্য। স্বীকার করতেই হয়। যৌবন রুবীকে আরোও রূপসী করেছে, প্রদীপ্ত করেছে।

"আলী।" স্পষ্টতই অবাক হয় রুবী। "তুমি?"

"শুনলাম নিশির এক্সিডেন্ট হয়েছে।" আলী আমতা আমতা করে। স্পষ্টতই নিশি রুবীকে বলেনি আলীর সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে।

"ও ঠিক আছে। ভেবো না। এসো।" রুবী উচ্ছল কণ্ঠে বলে। "কতদিন পর দেখা হলো? নিশির সাথে কোথায় দেখা হলো? আমাকে কিছু বলে নি। কেমন পাজী মেয়ে দেখেছো?"

রুবীকে না জানানোর কারণটা পরিষ্কার হয় না আলীর কাছে। "এমন ঘাবড়ে আছো কেন?" হাসতে হাসতে বলে রুবী। "আমি জানি তোমাদের কথা। এতোদিন তুমি কি করে দূরে দূরে ছিলে সেটাই ভাবি। চুপি চুপি যোগাযোগ রেখেছিলে সেটা অবশ্য জানতাম না।

"আসলে সেদিন ভার্সিটিতে দেখা হলো।" আলী সত্যটা প্রকাশ করে।

"তাই? নিশি খুব চাঁপা। কিছু বলে না আমাকে। বসো। ও মনে হয় ঘুমাচ্ছে। আমি তোমার জন্য চা বানিয়ে আনি।"

বাসাটা ছোট। লিভিংরুমে কোন রকমে একটা সোফা এটেছে। আলী সেখানেই বসে। তার আপত্তি না শুনেই চা আনতে চলে যায় রুবী। রান্না ঘরে খুট খাট শব্দ হচ্ছে। দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা ভ্যানগগের

তৈলচিত্রের কপি। আনমনে সেগুলোই দেখছিলো আলী। নিশি কখন নিঃশব্দে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি।

"কে আপনাকে এখানে আসতে বলেছে?" চাঁপা গলায় ধমকে ওঠে সে। আলী থতমত খেয়ে যায়।

"শুনলাম তোমার এক্সিডেন্ট হয়েছে....." ঘাবড়ে যায় আলী। নিশির রাগের কারণটা পরিষ্কার হয় না।

"মরে যাইনি। বহাল তবিয়তে আছি। হাতে পায়ে কেটেছে একটু। এবার যান।" নিশির কণ্ঠে অযাচিত রুক্ষতা।

"যাবো?" অসহায় বোধ করে আলী। সেদিনের সেই আবেগময় কথাবার্তার পর নিশির এই রূপের কারণ সে বুঝতে পারে না।

"যান। ডিপার্টমেন্টে আসবেন।"

আলীর অবশ্য যাওয়া হয় না। রুবী চা নিয়ে ফিরে এসেছে। সাথে অনেক খাবার দাবার। নিশিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে খুব হৈ চৈ করলো। "কেমন মেয়ে তুই? আলীর সাথে তোর যোগাযোগ আছে আমাকে একবারও বলিস নি।"

"তোমাকে সব বলতে হবে কেন?" নিশি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে।

"রাগ করছিস কেন? বলতে না চাইলে বলবি না।" আলীর দিকে তাকিয়ে হাসে রুবী। "আমি ওর বড় বোন আর আমাকেই সারাক্ষণ শাসন করছে। হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? চা খাও। তুইও বয় না নিশি।

"আমার বসতে হবে না। তুমিই বসো।" নিশি রাগ দেখিয়ে চলে যায়।

রুবী চোখ ওল্টালো। "ও একদম বদলায় নি। সবসময় শুধু রাগ। তুমি বসো। একটু কথা বলি।"

বসতেই হয়। রুবীও বসে পাশে। অনেকক্ষণ কথা হয়। খুটিয়ে খুটিয়ে সবকিছু জানতে চায় রুবী। কি পড়ছে? কোথায় থাকে? বানু কেমন আছে? ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি? আলীর মন্দ লাগে না।

ছোটবেলায় এই মেয়েটার সাথে দুটো কথা বলার জন্য মরীয়া হয়ে থাকতো সে। আজ কত স্বাচ্ছন্দ্যে দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারছে। তার বুকের মধ্যে সেই অজানা আলোড়ন নেই, মনের মধ্যে অকারণ দোলা নেই। দু'টি সমবয়সী বন্ধুর মতো মন খুলে কথা বলতে পারছে। তার মনের মধ্যে জমে

থাকা একটা মেঘ যেন হঠাৎ করেই সরে যেতে থাকে। ঘন্টা খানেক পর বিদায় নেয় সে। নিশি দেখা দেয় না। অদর্শনেই বিদায় জানিয়ে চলে আসে আলী। এই মেয়েটি একটা দুর্বোধ্য ধাঁধাঁর মতো। কখনো মনে হয় এতো পরিচিত আবার পর মুহূর্তেই ঘন কুয়াশা, দৃষ্টি চলে না।

আলীদের বাসায় ফোন নেই। বাড়ীওয়ালার ফোন নাম্বারই ব্যবহার করে। একদিন পরেই রাতে বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে এসে খবর দিলো তার একটা ফোন এসেছে। খুব কম মানুষই ফোন করে আলীকে এখানে। আলীই ফোন নাম্বার দেয় না। অন্যের বাসার মধ্যে ঢুকে ফোন ধরতে লজ্জা হয়। ফোন করেছিলো নিশি।

"সরি। ঐদিন খারাপ ব্যবহার করার জন্য।" নিশির কণ্ঠে দুঃখের কোন রেশ নেই।

"ভালো আছো এখন?" আলী কথা এড়িযে যায়।

"হ্যাঁ। কাল আসবেন। গেটে। দু'টায়।"

"ঠিক আছে।"

"দেরী হলে চলে যাবেন না। ক্লাশ শেষ হতে মাঝে মাঝে দেরী হয়।"

"যাবো না।"

ফোন রেখে দেয় নিশি। এই নিশিকে আলী বোঝে। সে স্বস্তি বোধ করে। রুবীর সামনে এতো রাগ দেখিয়েছিলো কেন কে জানে? রুবীর উপর কি ওর কোন হিংসা আছে? চায় না রুবী আলীর সাথে আলাপ করুক? ছেলে বেলার সেই রেষ কি দুই বোনের মধ্যে এখনও জাগরুক? জানতে চায় না আলী। একটা কথাই সে স্পষ্ট জানে, নিশিকে সে আর হারাতে চায় না।

সময় মতই হাজিরা দিয়েছিলো আলী। নিশিও দেরী করে নি। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে গিয়ে ঢোকে। বেশ খানিকটা পথ, কিন্তু ঝট করেই চলে যায়। সেদিনের ব্যবহারের কোন ব্যাখ্যা দেয় না নিশি। আলীী চাপাচাপি করে না। তবে কথাচ্ছলে কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে। রুবী অনেকের সাথে বন্ধুত্ব করলেও শেষতক কেউই টেকে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংলিশে অনার্স শেষ করেছে। মাষ্টার্স করবার ইচ্ছা। তার সেসন জট কিঞ্চিৎ কম থাকায় সে আলীর থেকে সামান্য এগিয়ে গেছে। মিঠুর কথাও চলে আসে। তার বাবা-মা খুলনাতেই থাকে। সে হলে থাকে। প্রায়ই নিশিদের বাসায় গিয়ে হানা

দেয়। তিনজনে আড্ডা চলে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে বাইরে খেতে যায়, মুভি দেখে। রুবীর প্রতি মিঠুর আগ্রহ যে বেড়েছে বৈ কমে নি তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উদ্যানের ভেতরে ঢুকে একটু-বিব্রত হয় আলী। শুধু যে বেশ কিছু কপোত-কপোতি এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে তাই না। এখানে কিছু বারবনিতাও তাদের নীড় বেঁধেছে। কম বয়েসী দরিদ্র মেয়েরা কোন একভাবে ঢুকে পড়েছে এই পেশায়। অধিকাংশ মানুষই যারা উদ্যানের ভেতর দিয়ে চলা ফেরা করছে অগ্রাহ্য করে এসব। আলী পারে না। তার চোখের সামনে এই দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের চিত্র ভেসে ওঠে। উচ্চপদস্থ একটা দল অসম্ভব অর্থের মালিক হয়ে চলেছে নানান কৌশল খাটিয়ে। আর দুঃস্থরা গরীব থেকে সর্বহারা হচ্ছে।

ছায়াঘেরা একটা গাছের নীচে নরম ঘাসে পাশাপাশি বসে দু'জন। আলীর জীবনে এটাই প্রথম কোন যুবতীর সাথে এতো নিকটে এভাবে বসা। তার একটু লজ্জাই করে। কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে। কতগুলো বছর এই প্রাঙ্গনে কেটে গেলো, বন্ধু বান্ধব, পরিচিতরা প্রেমিকার হাত ধরে হেঁটেছে, আবেগ ভরে কত কথা বলেছে, কল কলিয়ে হেসে উঠেছে সামান্য কথায়। আলীর মনের ভেতরে একটা শূন্যতা, একটা অভাব বোধ সবসময়েই পীড়া দিয়েছে। আকাশী নীল সালোয়ার কামিজ মোড়া এই অপূর্ব সুন্দর মেয়েটিকে তার স্বপ্নের মতো মনে হয়। কতকাল এই স্বপ্নটুকু বুকে নিয়ে প্রতীক্ষাতে ছিলো সে ভেবে অবাক লাগে। আলীকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে লাল হয়ে ওঠে নিশি। "কি দেখছেন ওভাবে?"

"সরি! তাকিয়েছিলাম নাকি?" বিব্রত হয় আলী নিজেও।

"গিলছিলেন।"

হেসে ফেলে দু'জন। আলী চোখ সরিয়ে নেয়।

"পরীক্ষার পর কি প্ল্যান?" নিশি জানতে চায়।

"বিদেশে পড়তে যাবো। আমেরিকায়।"

নিশি ম্লান হয়ে যায়। "ও!"

হেসে ফেলে আলী। "মানুষের প্ল্যান মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে যায়, তাই না?"

"নতুন প্ল্যান কি?" ঠোঁটের ডগায় একটুকরো হাসি বুলে যায় নিশির। দু'চোখে উজ্জলতা ফিরে আসে।

"জানি না। তবে ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। মাষ্টার্স করবো। চাকরি করবো।"

পছন্দ হয় নিশির। দু'জনে কেউই সরাসরি অন্যজনকে জড়িয়ে কিছু বলে না। কিন্তু সেটা দু'জনেই বুঝে নেয়। বহু বছর আগে যে সঙ্গীতের শুরু হয়েছিলো তার মূর্ছনা শেষ পর্যন্ত ওদের হৃদয়কে সমানভাবে ছুঁয়ে যায়। দু'জনাই সেটা বোঝে। সেটা নিয়ে কোন ছেলেমানুষী আলাপে জড়ায় না।

নিশির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যাতায়াত আছে। জানায় পরবর্তি সপ্তাহে ভার্সিটির একটা অনুষ্ঠানে গান গাইবে। নিশি গান গায় আলী জানতো না। ছোটবেলায় কখনও গাইতে শোনে নি। সে শোনার জন্য আব্দার ধরে। নিশি গায় না। খোলা জায়গায় গান গাইতে তার দ্বিধা হয়। তবে সে পাল্টা অনুরোধ করে। আলী যদি তার জন্যে একটা গান লিখে দেয় তাহলে সে অনুষ্ঠানে সেই গান গাইবে। আলী কি এখনও লেখে? আলী প্রতিশ্রুতি দেয়। তার ইচ্ছা হয় "নিশীথ কুহু" কবিতাটি সে নিশিকে শোনায়। কিন্তু দ্বিধা দন্দ্বে পড়ে চেপে যায়। পুরানো অনুভূতির প্রসঙ্গ তুলে এখন কি লাভ? নিশির হয়তো ভালো লাগবে না।

ফেরার পথে একই রিক্সায় চাপে দু'জন। শরীরে শরীরে ছুঁয়ে যায়। হাতে হাতে। সামান্য স্পর্শই এতো ভালো লাগে। ইচ্ছা হয় নিশির হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বসে। কিন্তু সাহস হয় না। বেশী দ্রুত এগুতে গিয়ে সব কিছু হারাতে চায় না আলী। শাহবাগের মোড়ে ওকে নামিয়ে দেয় নিশি। আলীর অস্থির লাগে। একাধারে সুস্থিরতা এবং অস্থিরতা। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। নিশিকে ফেলে আর কোথাও সে যাবে না। কিন্তু নিশিকে নিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে সেটাও সে জানে না। ঘর বাঁধার স্বপ্ন কি দেখা যায়? ভালো কাজ না পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নিশির পরিবার থেকে কি সবাই এটা মেনে নেবে? সে জানে না। কিন্তু আপাতত সেসব নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে চায় না। আপাতত নিশির জন্য একটা গান লিখতে হবে। পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। ভালো একটা চাকরী পেতে হবে..... তারপর..... অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

টি.এস.সি-তে হাজার মানুষের সামনে গান গাইলো নিশি। আলীর লেখা গান।

মন বলে কিছু নেই আছে শুধু যাতনা

ভালাবাসার কথা বলো অভিমান বোঝ না

মন বলে কিছু নেই

নিশি নিজেই সুর করেছিলো। মুগ্ধ হয়ে শুনলো আলী। কথার মালা গাঁথা এক কথা আর তাকে সুরের মূর্ছনায় জড়িয়ে হৃদয় প্লাবিত করে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নিশির এমন চমৎকার গানের গলা আছে তার

জানা ছিলো না। আনন্দে তার চোখের কোণে পানি জমে ওঠে। রুবী এবং মিঠুও এসেছিলো। বহুদিন পর আবার দেখা হয় মিঠুর সাথে। পুরানো কথা কেউই তোলে না। তোলার প্রয়োজন দেখে না। হাত মেলায়।

"কেমন আছিসরে?" জানতে চায় মিঠু।

"ভালো। তুই?" আলী সহজ কণ্ঠে বলে।

"ভালো। শুনেছি তুই কার্জন হলে পড়িস। ওদিকে খুব একটা যাওয়া হয় না।"

"আমারও বুয়েটের দিকে কালে ভদ্রে যাওয়া হয়।"

শীতল কথোপকথন দিয়ে শুরু হলেও তাদের বন্ধুত্বের উষ্ণতা চলে আসতে সময় লাগে না। নিশির গান শেষ হতে ওদের সাথে এসে জোট পাকায়। ঘাসের চত্বরে বসে ঝালমুড়ি খেতে খেতে আড্ডা চলে। অধিকাংশ কথাবার্তা চালায় মিঠু এবং রুবীই। মিঠু নানান ধরনের কৌতুক বলে হাসায়। রুবী উচ্ছল, প্রাণবন্ত। যে কোন কথাতেই হাসছে। নিজেও দু'একটা কৌতুক বলার চেষ্টা করছে। আলীর খুব ভালো লাগে। এই দৃশ্যটা সে কখনও সাহস করে কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু বাস্তব কখনো কখনো যে কল্পনাকেও হার মানায় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ সে পায়। কে জানতো বাল্যকালের চার বন্ধু আবার এভাবে একসাথে জড়ো হয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে হাসবে ওরা? সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা চলে। আলীকে ফিরতে হয়। পরীক্ষার প্রস্তুতি আছে।

পরবর্তি কয়েকটা দিন ফুর ফুর করে চলে যায়। নিশির সাথে আবার দেখা হয়। দু'জনার কেউই স্পষ্ট করে কিছু বলে নি। কিন্তু আপনি থেকে ঝট করেই তুমিতে নেমে যায় নিশি। রিক্সায় হাতে হাত ধরে বসে। অস্বাভাবিক মনে হয় না। অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না। বরং এক ধরনের পরিপূর্ণতা অনুভব করে আলী। প্রকৃতি জানতো এমনটা হবে, তার নিয়তি জানতো এমনটা হবে। সাময়িক দূরত্বের বাঁধা পেরিয়ে তাদের দু'টি অস্তিত্ব এক সুতায় গাঁথা হয়েছে। এটাই শুধু সত্য। অতীত অপ্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ অর্থহীন। হাজারো চিন্তার এলোমেলো স্রোত তার হৃদয় এবং মস্তিষ্ককে আলোড়িত করে, বিচলিত করে। কিন্তু তার মধ্যেও সে বুঝতে পারে তার অস্থিরতা কমছে, সুস্থিরতা বাড়ছে।

২৪

ক'দিন পরে রুবী হঠাৎ যখন বাসায় এসে হাজির হলো বেশ অবাক হলো আলী। সে একাই এসেছিলো। রাস্তার বখাটে ছেলেদের দলটা বড় বড় চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। বাড়ীয়ালা লোকটা মাঝবয়সী। সে পর্যন্ত খোঁজ নিতে এলো কিছু লাগবে কিনা। আশে পাশের বাড়ীর ছাদে বেশ কিছু তরুণের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলো। রুবীর চৌম্বকীয় শক্তির প্রমাণ নতুন করে পেলো আলী। অনেক কষ্টে হাসি দমন করলো। রুবীর শুধু সৌন্দর্যই নেই, সেই সৌন্দর্যকে ছড়িয়ে দেবার এক বিরল ক্ষমতা আছে। বানুকে আলী আগেই জানিয়েছিলো ওদের কথা। বানু বিশেষ অবাক হয় নি। তবে সে হয়তো নিশিকেই আশা করেছিলো। রুবী অবশ্য বেশীক্ষণ বসে নি। আলীকে নিয়ে বের হয়েছিলো। কি নাকি দরকার। একই রিক্সায় চাপাচাপি করে বসে এলিফ্যান্ট রোডে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলো ওরা। ভেতরে ঢুকে একটা নির্জন কোণে আসন নিলো। এমনটা আশা করেনি আলী। সে বেশ অবাকই হয়। নিজেই খাবার অর্ডার দেয় রুবী। ম্লান আলোয় তার মুখভাব পরিষ্কার ধরা যায় না কিন্তু ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকা রহস্যময় হাসিটা দৃষ্টি এড়ায় না ।

"খুব অবাক হচ্ছো?" শেষ পর্যন্ত বলে রুবী।

"কি হয়েছে?" আলী কৌতুহল চাপতে পারে না।

রুবী মুচকি হাসে। "কিছুই হয় নি। ইচ্ছে হলো তাই এলাম। কেন, আমার সঙ্গ তোমার ভালো লাগছে না?"

হাসে আলী। "নাটক করো না। মিঠুর সাথে কিছু হয়েছে?"

"নাহ্। কি হবে?"

"জানি না। এমনিই বললাম। তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?"

"আমাদের?"

আলী একটু হতবিহবল হয়। তার ধারণা হয়েছিলো মিঠু এবং রুবীর মাঝে একটা হৃদয়ের যোগাযোগ তৈরী হয়েছে। ওদের ঘনিষ্টতা দেখে তেমনই মনে হয়েছে। রুবী একটু গম্ভীর হয়ে পড়লো।

"আলী, মিঠু আমার আত্মীয়। আমরা বন্ধু। তার চেয়ে বেশী কিছু নই।" একটু নীরবতার পর যোগ করলো। "জানি মঠু হয়তো সেভাবে দেখছে না। কিন্তু মিঠুকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আলী অবাকই হয়। মিঠু ছয় ফুট লম্বা, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, ... । তার ভবিষ্যৎ নক্ষত্রের মতো উজ্জল। তাকে রুবীর অবহেলা করার কারণটা পরিষ্কার হয় না।

"কেন?" প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই বেরিয়ে যায়।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে রুবী। "তোমরা ছেলেরা কিছু বোঝ না। যাকে সারা জীবন ভাই, বন্ধু বলে জেনেছি শারীরিক ভাবে তার জন্যে কোন কিছু অনুভব করা যায়? জানি ওর জন্যে অনেক মেয়ে পাগল। কিন্তু তারা তো ওর আত্মীয় নয়। ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলেও আমার কোন উত্তেজনা হবে না।"

এই অদ্ভুত ব্যাখ্যার জন্য আলী প্রস্তুত ছিলো না। অদ্ভুত কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। মেনে নিতে আলীর অসুবিধা হয় না।

"আমাকে কি করতে বলো? মিঠুর সাথে কথা বলবো?"

"নাহ্। মিঠুকে আমিই বলবো। ও বুঝবে। জানি আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে কিন্তু এটাতো একপক্ষীয় হতে পারে না। দু'জনারই সমান অনুভূতি থাকা দরকার। তাই না?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রুবী। আলী নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। খাবার আসে। দু'জনে চুপচাপ কিছুক্ষণ খায়।

"তুমি তো একসময় আমাকে খুব পছন্দ করতে।" হঠাৎ হাসতে হাসতে বললো রুবী। "তোমার কবিতাটা আমার আজও মনে আছে।"

আলী বিস্মিত হয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ টেনে তুলতে চায় না। কেন রুবী হঠাৎ এসব নিয়ে কথা বলছে ভেবে পায় না। কিন্তু তার অস্বঃস্তিটুকু ধরতে অসুবিধা হয় না রুবীর। সে প্রসঙ্গ পাল্টায়। তারা বই, মুভি,

এমনকি রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে আলাপ করে। রুবী আলাপী। কখন দু'ঘন্টা কেটে যায় টেরও পায় না আলী। ওকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে অগনিত তরুণের হৃদয়ে প্রেমের হুল ফুটিয়ে চলে যায় রুবী।

পরবর্তি এক সপ্তাহে আরো দু'বার এলো রুবী। খটকা লাগলো আলীর। কিন্তু কি করবে জানে না। রুবীর সঙ্গ ভালো লাগবে না এমন পুরুষ কেউ আছে কিনা কে জানে। একাই এসেছে। আলীকে নিয়ে বেরিয়েছে। একবার গেলো নিউ মার্কেটে, দোকানে দোকানে ঘুরলো। পরেরবার নিয়ে গেলো সংসদ ভবনে। খুলে কিছু বলে না কিন্তু তার অস্থিরতাটুকু নজর এড়ায় না। নিজেদেরকে নিয়ে খুব একটা কথা বলে না রুবী। অধিকাংশ কথাই হয় বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে। আলী মনে মনে শংকা অনুভব করে। নিশি জানতে পারলে কিভাবে নেবে কে জানে? প্রথম বারের সেই অভিজ্ঞতা তার মনে এখনও সজীব। বাসায় গিয়ে হাজির হবার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিলো নিশি। বিপদেই পড়ে গেছে সে। রুবীর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না। এই মেয়েটাকে তার কষ্ট দিতে ইচ্ছে হয় না। দু'জন বন্ধু কি একসাথে ঘুরতে পারে না? নিশি নিশ্চয় বুঝবে। শেষ দিন বিদায় নেবার সময় রুবী হঠাৎ বললো, "নিশিকে দেখে যা মনে হয়, ও কিন্তু ঠিক তেমনটি নয়।"

এমন একটা মন্তব্যের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলো না আলী।"বুঝলাম না।" হতবিহবল কণ্ঠে বলে।

"কিছু না। তবে সাবধান থেকো । অনেক ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে ও। তাদেরকে বুঝতেও দেয় নি। তোমাকে নিশ্চয় পছন্দ করে।"

হঠাৎ করেই সেই আলাপে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নিয়েছে রুবী। আলীর মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে চাইলো কি? কেন? তার কি লাভ? আলী বিপাকে পড়ে যায়। নিশিকে নিয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু রুবীর কর্মকান্ড, কথাবার্তা সে একেবারেই বুঝতে পারে না। নিজ ছোট বোনের নামে এই ধরণের একটা কথা সে কেন বলবে?

পড়াশুনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলো। ক'দিন ঘর থেকে বেরই হলো না আলী। নিশির সাথেও আলাপ হয় নি। তবে নীল খামে তার চিঠি এসেছে।

'ভুলে গেলে?'

খুব হাসে আলী। চিঠি লিখতে পছন্দ করে নিশি। বাড়ীয়ালার বাসায় ফোন করলেই কথা হয়। কিন্তু সে চিঠি লিখেছে। আলী একবার ভাবে চিঠিতেই উত্তর দেবে। কিন্তু চিঠি যেতে লাগে কম করে হলেও

দু'দিন। সে বাইরে গিয়ে পরিচিত একটা দোকান থেকে ফোন করে। বাড়ীয়ালার সামনে সব কথা বলা যায় না।

ফোন ধরলো রুবী। জানালো নিশি বন্ধুদের সাথে বাইরে গেছে। তার ক্লাশের পাঁচ-ছয়জন ছেলেমেয়ে এসেছিলো। কখন ফিরবে জানে না। ফোন রেখে দিচ্ছিলো, রুবীই রুখলো।

"চলে এসো না। মিঠুও আসবে একটু পরে। তিনজনে মিলে আড্ডা দেয়া যাবে।"

"নিশি কখন ফিরবে?"

"বললামতো বাবা, জানি না। কেন, আমরা কেউ নই?" রুবী আহত হবার ভান করে।

আলী যাবারই সিদ্ধান্ত নেয়। পড়াশুনা থেকে একটু বিরতিও নেয়া হবে। নিশির সাথেও দেখা হবে। দেরী হলেও ফিরবে তো একসময়। বানুকে রাতে একাই খেয়ে নিতে বলে রিক্সায় চাপলো ও। বাইরে বিকেল। ভীড় ভাট্টা বেশ। সবাই ঘরে ফিরছে। রুবীদের বাসায় পৌঁছাতে বেশ খানিকটা সময় লাগলো। সে ধরেই নিলো মিঠু হয়তো ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।

কলিং বেল বাজাতে ঝট করেই দরজা খুলে গেলো। রুবী।

সবুজ জর্জেটের শাড়ী পরেছে, হাত কাটা ব্লাউজ, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, মুখে সযত্ন পরিচর্যার ছাপ। আলীর অবাক হবার পালা। "কোথাও যাচ্ছো?"

"নাহ্।" খিল খিল করে হাসে রুবী। "কেন, আমার সাজতে মানা নাকি?"

লজ্জা পেয়ে যায় আলী। "সুন্দর লাগছে।"

রুবী নিজেও জানে তাকে ছেঁড়া শাড়ীতেও সুন্দর লাগবে।

দু'জন লিভিংরুমে মুখোমুখি বসে। মিঠু এখনও আসে নি। বলেছে দেরী হবে। রুবীকে খুবই প্রাণোচ্ছল লাগে। জানালো সে নিজেই রেঁধেছে আজকে। সাধারণত একটা বুয়া এসে রান্না বান্না করে। সখ করে সে অথবা নিশি মাঝে মাঝে রাঁধে। ছোট কামরাটার মধ্যে সুশোভিত রুবীর মুখোমুখি বসে ঘামতে থাকে আলী। রুবীর উদ্দ্যেশ্য তার কাছে পরিষ্কার হয় না। তার সন্দেহ হয় মিঠুর আজ আসবার কথা নেই।

সুন্দর করে টেবিল সাজিয়ে ওকে খেতে ডাকে রুবী। অনেক কিছু রেঁধেছে। সামনা সামনি চেয়ারে বসে দু'জন। নিজেই বেড়ে দেয় রুবী। খাওয়ায় রুচি হয় না আলীর। কিন্তু বুঝতে দেয় না। রুবীকে অকারণে আঘাত দিতে সে পারবে না।

"মিঠু আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।" হঠাৎ বলে রুবী।"গত রাতে। খুব ঘটা করে। গুলশানে একটা ইটালিয়ান রেষ্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে এত্তোবড় একটা হীরার আংটি বের করলো। হাঁটু গেড়ে বসে নিবেদন। এমন লজ্জা লাগছিলো আমার।"

"কি বললে তুমি?" আলী কৌতুহলে ফেটে পড়ে।

"তুমি তো জানোই। ভাইকে বিয়ে করা যায়? আপন হোক আর দূরের হোক। ভাই-ই তো। না করতে হলো। কাঁদলো। ওর জন্যে খুব কষ্ট লাগছিলো। জানতাম এমনটা হবে। অনেকদিন ধরেই ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। বোঝে না। কালকে এমনও বললাম, ঠাট্টার ছলেই, ৫ বছর পরে আবার জিজ্ঞেস করতে। সবারই পড়াশুনা শেষ হবে। এখন কি বিয়ে করার সময়? তা-ও শোনে না। উত্তর তার চাই-ই। বলতে হলো।"

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে খায়।

"একটা কথা তোমাকে বলি?" রুবী নীচু গলায় বলে।

"বলো।"

"তোমার কথা আমি সবসময় ভেবেছি।" ওর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে রুবী। আলী চোখে চোখ রাখতে পারে না। দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। এসব কথা সে শুনতে চায় না। অস্বস্তিবোধ করে।

কলিং বেলটা বাজছে। একবার। দু'বার। রুবী দরজা খুলতে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার বিস্মিত কণ্ঠ শোনা যায়। "এতো তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?"

"তাড়াতাড়ি? তোমাকে তো বলেই গেলাম দু'ঘন্টা থাকবো। লাইব্রেরীতে বেশীক্ষণ ভালো লাগে না।" নিশির কণ্ঠ।

খটকা লাগে আলীর। রুবী তাকে ভিন্ন কথা বলেছিলো। উঠে আসে সে। তাকে দেখে বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিশি। কোন কথা বলে না। আলীর কাছে সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। রুবী তাকে ফাঁদে ফেলেছে। সে ব্যাখ্যা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। নিশি তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করে

না। কাঁধের বইয়ের ব্যাগটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকে যায়। নিজের ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয়। রুবী শুষ্ক কণ্ঠে বললো, "এতো রাগ করবে বুঝিনি।"

আলী অসহায়ভাবে শ্রাগ করে। এই ধরণের একটা কাজ রুবী করবে এটা সে কল্পনাতেও ভাবে নি। নিশির দরজার সামানে দাঁড়িয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে, ঘটনাটা খুলে বলে, কিন্তু কোন কাজ হয় না। নিশির নীরবতা ভাঙে না। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায় আলী। নিশি কি ভেবেছে সে জানে। সেই ধরণের কোন দুর্বলতা তার মনে নেই। নিশিকে সে কার্জন হলে ধরবে। সে নিশ্চয় বুঝবে। আলীকে যদি সে সত্যিই ভালোবেসে থাকে তাহলে এমন অকারণ সন্দেহের সেখানে কোন অবকাশ থাকা উচিৎ নয়।

২৫

ফ্লাইট পাওয়া গেলো বিকালে। আমেরিকান এয়ারলাইন্স। হাতে ঘন্টা তিনেক সময় নিয়ে বেরিয়েছিলো ওরা। আমেরিকান ফ্লাইটগুলোতে কড়া চেকিং হয়। লম্বা লাইন পড়ে যায়। ওরা যখন বেরিয়েছিলো টিসা তখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। তবে লায়লা কাজ থেকে ফিরে আসে। মেয়ের চিন্তায় স্পষ্টতই মুষড়ে আছে নিশি। আলী টিসাকে রেখে যাবার কারণটা বুঝতে পারলো না। বার কতক জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পাওয়া গেলো না। নিশি সংক্ষেপে জানিয়েছে, তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে টিসার যাবার কোন প্রয়োজন নেই। কোথায় যাচ্ছে তারা? গেলেই জানতে পারবে। মুচকি হেসে চুপ করে গেছে আলী। নিশির হাব-ভাব দেখে মনে হয়েছে তারা কোন নরকে চলেছে। অক্টোবরের শেষ দিকে মায়ামী বিচের আবহাওয়া খুবই চমৎকার হবার কথা। মায়ামীতে সে এর আগে একবার গেছে। কাজে। একা ছিলো। ঘুরে-টুরে দেখবার আগ্রহ পায়নি। এবার যদিও মাত্র একদিনের জন্য যাচ্ছে তবুও নিশিকে নিয়ে বিখ্যাত মায়ামী বিচের পানিতে পা না ডুবিয়ে ফিরছে না। তবে নিশি যেমন গম্ভীর হয়ে আছে তাতে তাকে কোথাও নেয়া যাবে বলে মনে হয় না।

ফ্লাইট সময় মতই ছাড়ে। পাশাপাশি সীট। জানালার পাশে বসেছে নিশি। বাইরে দৃষ্টি। কথাবার্তা বিশেষ হচ্ছে না। তার বেশবাস দেখে বেশ অবাক হয়েছে আলী। জিনসের উপর শার্ট, প্রসাধনহীন। এভাবে সে কোথাও যেতে পারে ভাবেনি আলী। নিশি আলুথালু থাকবার মেয়ে নয়। মনের ভেতরে তার যতই ঝড় উঠুক বাইরে থেকে তার বেশবাস, ব্যবহার দেখে সেটা বোঝা কষ্ট। প্রশ্ন করে লাভ হবে না। সুতরাং আপাতত চুপ করে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আলী। সব মিলিয়ে ঘন্টা ছয়েকের ফ্লাইট। ক্লিভল্যান্ডে অল্প কিছুক্ষণের জন্য থামবে। প্লেনে উঠতে পছন্দ করে না সে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। কিন্তু নিশির সামনে ভীত সন্ত্রস্ত ভাবটা দেখাতে চায় না। যতখানি সম্ভব সহজ মুখে বসে থাকে। নিশির আচরণ দেখে বহু বছর আগের এক কালরাতের কথা মনে পড়ে যায়। দুঃস্বপ্নময় এক রাত। সে কখনো ভাবেও নি এমন কিছু ঘটতে পারে। মাত্র কয়েকটা ঘন্টার ব্যবধানে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। চোখ বুজে স্মৃতি রোমন্থন করে আলী। নতুন কিছু নয় তার কাছে। গত বছরগুলোতে এই বিশেষ ঘটনাটা নিয়ে সে অনেক ভেবেছে। কখনও মনে হয় ভুল করেছে, কখনো মনে হয় এছাড়া তার আর কোন উপায় ছিলো না।

বাসায় রুবীর সাথে ওকে একা দেখার পর দু'দিন কোন দেখা পাওয়া গেলো না নিশির। আলী অনেকবার ফোন করলো। কেউ ধরলো না। বোটানীতে গিয়ে নির্লজ্জের মতো অনেক খোঁজাখুঁজি করলো। নিশিকে পাওয়া গেলো না। শেষে এক বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করতে জানা গেলো দু'দিন ধরে আসছে না নিশি। আলী নিরুপায় হয়ে ওদের বাসায় যাবে বলেও ঠিক করলো। রাগ করলে করুক। কিন্তু আরো ভুল বোঝাবুঝির শীকার সে হতে চায় না। নিশি যা ভেবেছে তা আদৌ সত্য নয়। নিশির সেটা জানা প্রয়োজন। সন্ধ্যার দিকে ওদের বাসায় গিয়ে হাজির হলো সে। অনেক্ষণ কলিং বেল বাজানোর পরও কেউ দরজা খুললো না। তবে নীচতলার ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

"একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি কিছু জানেন না?"

ভদ্রলোকের কথা শুনে জান উড়ে যায় আলীর। আবেগের বশে নিশি তো কোন অঘটন ঘটায়নি?

"জ্বী না। আমি কিছুই জানি না।" সন্ত্রস্থ কণ্ঠে বলে আলী।

"দুপুরে এমবুলেন্স এসেছিলো। ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছে।"

"কাকে?"

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন, "আমি সঠিক জানি না। আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম বড় মেয়েটি বোধহয় আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো। আমি আপনাকে অযথা ভয় পাইয়ে দিতে চাই না। আপনি ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে ওদের খোঁজ করুন।"

আলী দ্রুতপায়ে রাস্তায় নেমে রিক্সা নেয়। ভীড় ভাট্টা ঠেলে ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছাতে সময় লেগে যায়। খুব বেশী খুঁজতে হয় না। করিডোরেই নিশিকে দেখতে পায়। পাশে মিঠু। তার দুই চোখ রক্ত জবার মতো। আলী দৌঁড়ে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নিশিকে সুস্থ দেখে তার মনের একটা বড় শংকা কাটে।

"কি হয়েছে? তোমাদের বাসায় গিয়েছিলোম। নিচের ভদ্রলোক বললেন..... ।"

তার কথা শেষ হবার আগেই তেড়ে আসে মিঠু। বিশাল থাবা বাড়িয়ে ওর কলার চেপে ধরে। "কি করছিলি তুই ওর সাথে? কথা বল।"

হতভম্ব হয়ে পড়ে আলী। মিঠুর এমন অযাচিত ব্যবহারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলো না ও। তাকে কথা বলার সুযোগ দেয় না মিঠু। ধাম করে ঘুষি বসিয়ে দেয় ওর মুখে। গল গল করে উষ্ণ রক্ত গড়িয়ে পড়ে, টের পায় আলী। সে সরে যাবার চেষ্টা করে। পারে না। শক্ত করে ধরে আছে মিঠু। তার সাথে শক্তিতে পারার কোন উপায় নেই আলীর। আবারও ঘুষি চালায় মিঠু। কানের উপর পড়ে ঘুষিটা এবার। মাথা ঘুরে ওঠে আলীর। শব্দ থেমে যায় ক্ষনিকের জন্য। হাঁটু ভেঙে মেঝেতে গড়িযে পড়ে। উন্মাদ রাগে লাথি চালায় মিঠু। পেটে আঘাত পেয়ে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে আলী। এই ভয়াবহ আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার সামর্থ তার নেই। নিশির কণ্ঠ কানে আসে। "থামো মিঠুভাই। থামো।"

মিঠু থেমে যায়। "রুবীর কিছু হলে ওকেও আমি শেষ করবো। আল্লাহর কসম।" তার কান্নাভেজা কণ্ঠ শুনতে পায় আলী।

নিশি সাদা একটা ওড়না পরেছিলো। সেটা ভাজ করে ওর নাকের উপর ধরে। রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করে। রক্তে ওড়না ভিজে যায়। বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে গেছে। আলীকে ধরে নিজ পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে নিশি। ফিসফিসিয়ে বলে, "রুবী আপা অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়েছিলো। পেট পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন ভালো।"

"কেন?" সেই অবস্থাতেও প্রশ্ন করে আলী। তার মাথায় কিছুই ঢোকে না।

"আমার জন্যে।" নিশি শান্ত গলায় বললো। "আমার মাথার ঠিক ছিলো না। আমি তাকে খারাপ কিছু কথা বলেছি।"

কংক্রিটের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় আলী। তার রক্ত পড়া থেমে গেছে। রক্তে ভেজা ওড়নাটা কি করবে সেটা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়। নিশি ওর হাত থেকে সেটা নেয়। "তুমি চলে যাও। এখানে তোমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই।"

আলী ভালো বোধ করছিলো না। সে ফিরতি পথ ধরে। নিশি পিছু ডাকলো। "আলী ভাই।"

আলী থমকে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ায় নিশি। রক্তে ভেজা ওড়নাটা তখনও তার এক হাতে ধরা। সে নীচু কণ্ঠে বললো, "আমাদের সাথে জড়িও না তুমি। তোমার জীবনটা নষ্ট হবে। তুমি যেভাবে প্ল্যান করেছিলে, সেভাবেই এগিয়ে যাও। আমার সাথে আর দেখা করতে এসো না।"

তার কথামতই কাজ করেছে আলী। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। টোফেল, জি-আর-ইতে খুবই ভালো করে স্কলারশীপ নিয়ে পড়তে চলে আসে আমেরিকায়। তার নিজস্ব প্ল্যানমতই এগিয়ে যায়। নিশি, রুবী কিংবা মিঠু কারো খবরই নেয় না। ওদের জীবন অন্য সূত্রে গাঁথা। আলীর সাথে সেটা মেলে না। বার বার এগিয়ে গেছে সে, আবার ধাককা খেয়ে ফিরে এসেছে। আর একই ভুল করতে চায়নি। ভয় হয়েছে। কে জানে এর পরেরবার নিয়তি তাদেরকে কোথায় ঠেলে দেবে।

"কি ভাবছো?" নিশির প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে আলী। কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

কেশে গলা পরিষ্কার করে আলী। "পুরানো দিনের কথা।"

"কার কথা?" নিশির ঠোঁটে এক চিলতে হাসি।

"রুবীর কান্ডটা মনে আছে?"

"ঢাকা মেডিক্যাল?"

"হ্যাঁ, আসলে কি হয়েছিলো?"

"কিছুই না।" নির্বিকারে বলে নিশি। "আমার সাথে ঝগড়া হয়েছিলো তোমাকে নিয়ে। রাগের মাথায় গালটাল দিয়েছিলাম। ব্যস, এতোগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো। ভয় পেয়ে এমবুলেন্স ডাকলাম।

মিঠু ভাইকে খবর দিলাম। পরে বুঝেছি, সব অভিনয়। যে কটা খেয়েছিলো তাতে দুটো দিন নাক ডেকে ঘুমাতো। মরে টরে যাবার কোন চান্স ছিলো না। মাঝখান দিয়ে আমাদের জীবনটা বরবাদ করেছে।"

নিশি মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার মুখে স্পষ্ট উষ্মা। "তুমি আমাকে দেখা করতে মানা করেছিলে।"

"তুমি এমন সুবোধ বালক তাকি জানতাম" বিড়বিড়িয়ে বলে নিশি।

"তুমি নিজেওতো যোগাযোগ করনি।"

"রাগে রাগ বাড়ে। অভিমানে বছর ঘুরে গেছে। যাক। এখন ওসব কথা তুলে লাভ নেই।"

"রুবীর কথা তুমি কিছুই বলনি। "ভালো আছে ও?"

"বেশী ভালো থাকার কথা নয়।" অন্যদিকে ফিরেই বলে নিশি। তাকে আনমনা দেখায়। "এতো সুন্দর হয়ে জন্মেছিলো। সবাইকে পাগল করেছে কিন্তু কারো জন্যে পাগল হয় নি। সারাটা জীবন কোন সুখ পায়নি। কষ্টই লাগে ওর জন্যে। ওর জীবনটা এমন হতে পারে চিন্তাই করা যায় না।"

"বিয়ে করেনি?"

"করেছিলো। খুব বড়লোকের ছেলেকে। কিন্তু বললাম না ওর কপালটাই খারাপ। সেখানেও সমস্যা। বেচারার ব্রেন ক্যান্সার দু'বছর ধরে চিকিৎসা চলছে। কখন ভালো হয় । কখন খারাপ হয়। ক'দিন বাঁচবে কোন ঠিক নেই।"

"এই জন্যে টিসাকে আনতে চাওনি তুমি?"

"এসব ওর দেখার দরকার নেই।" এখনও আনমনা দেখায় নিশিকে। দৃষ্টি বাইরে।

কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙে নিশিই কথা বলে, "মিঠু ভাই ওকে খুব চেয়েছিলো। কতবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। কিছুতেই রাজী হলো না রুবী আপা। শেষ পর্যন্ত খালা-খালু জোর করে লাইলী আপার সাথে মিঠু ভাইকে বিয়ে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিলো। ভাবীটা খুব ভালো হয়েছে। এতো হাসাতে পারে।"

"রুবী কবে বিয়ে করেছিলো?"

"তার বছর দুয়েক পর। প্রেমের বিয়ে নয়। দেখে শুনেই দেয়া।"

"আর তুমি?"

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় নিশি।" আমি তোমার রক্তে মাখা ওড়নাটা অনেকদিন জমিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো ফিরে আসবে। জানি মানা করেছিলাম। কিন্তু তারপরও আশা ছিলো।"

"যখন এলাম না, তারপর?"

"জীবন চলে যায় তাই না? টিসার জন্মের আগে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম ওটাকে। তোমার স্মৃতি বলতে তো ওটাই। তখন তো একটা চিঠিও লেখনি। উপহারও কিছু দাওনি। আবার এভাবে দেখা হবে কে জানতো।"

"তোমার স্বামী কিভাবে মারা গেলেন?"

"ওসব কথা তুলো না। বলতে ভালো লাগে না।"

তারপর আলাপটা হঠাৎ করেই থেমে যায়। যেন আর কিছু বলার নেই, কিংবা বলার প্রয়োজন নেই। নীরবতাটুকুই উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

মায়ামীতে নেমে রাতটুকু এয়ারপোর্টের কাছেই একটা হোটেলে কাটালো ওরা। পাশাপাশি দুটি রুমে। রোমান্টিক হয়ে উঠবার কোন সুযোগ ছিলো না। নিশিকে কিছুটা নিস্পৃহ, গম্ভীর মনে হয়েছে। এখনও তার পরিকল্পনা সে খোলাসা করে কিছুই বলে নি। আলী ধারণা করেছিলো তারা রুবীর বাসাতেই উঠবে। কিন্তু হোটেলে ওঠার পর ধরে নিয়েছিলো অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে রুবী হয়তো বিপাকে আছে। এর মধ্যে আর ঝামেলা বাড়াতে চায় নি নিশি।

পরদিন সকালে ডাইনিংরুমে নিঃশব্দে নাস্তা সারে দু'জন। আলী নিজেকে নিশির হাতেই সঁপে দিয়েছে। সে ওকে যেখানে নিয়ে যায় যাবে। অযথা প্রশ্ন করে জটিলতা বাড়াবে না। সকাল দশটার দিকে একটা ট্যাক্সী নিয়ে মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারে গেলো ওরা। মায়ামী বিচে। রিসেপশনে খোঁজ নিতে ওদেরকে একটা প্রাইভেট রুমে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

"তার অবস্থা ক'দিন ধরে খুবই খারাপ।" নিশি সংক্ষেপে বললো। "বাঁচবে না মনে হয়।"

"রুবী জানে তুমি আসছো?" আলী জানতে চায়।

"কথা হয়েছে।"

দরজায় টোকা দিতে প্রায় নিঃশব্দে খুলে যায় । রুবীকে দেখে অবাকই হয় আলী । তাকে সবসময় দেখেছে ঝকমকে, উচ্ছল, উজ্জ্বল । সাদামাটা একটা সালোয়ার কামিজ এলোমেলো চুল আর প্রসাধনহীন মুলে তাকে একেবারেই অচেনা কেউ মনে হয় । আলীকে দেখে তার মুখে বিষন্ন একটা হাসি ফোটে ।

"ভালো আছো?"

মাথা দোলায় আলী । "তুমি?"

"দেখছইতো ।" বিছানায় শুয়ে থাকা নির্জীব একজন পুরুষকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায় । "নিশি বলেছে নিশ্চয় ।"

"কেমন আছে এখন?" নিশি জানতে চায় ।

"ভালো না । যখন তখন অবস্থা । মেয়েটাকে খুব দেখতে চাচ্ছিলো । টিসাকে নিয়ে এলি না ।"

"দরকার কি?"

লোকটি নির্জীবের মতো পড়ে ছিলো । কথাবার্তা শুনে সে চোখ খুললো । নিশিকে দেখেই তার মুখ খানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । নিশি নীচু গলায় বিড়বিড়িয়ে বললো, "রুবী আপা, তুমি আলী ভাইকে নিয়ে একটু বাইরে দাঁড়াও ।"

তারা দু'জন করিডোরে বেরিয়ে আসতে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো নিশি । আলী বিস্মিত দৃষ্টিতে রুবীর দিকে তাকালো ।

রুরী বললো, "তোমাকে সব কথা বলেনি ও?"

মাথা নাড়ে আলী । " কি বলেনি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে রুবী । "তোমাকে কি বলেছে ও?"

"ওর স্বামী মারা গেছে । কিভাবে সেটা বলে নি । ওসব নিয়ে কথা বলতে চায় না ।"

বিষন্নভাবে হাসে রুবী । "তোমার কপালটাই খারাপ আলী । বার বার আমাদের নোংরামীর মধ্যে জড়িয়ে যাও । নিশি কখনো বিয়ে করেনি । আমি করেছিলাম । আমার স্বামীর সাথে ওর সম্পর্ক হয়েছিলো । শারীরিক । কেন হয়েছিলো, কিভাবে হয়েছিলো, জানতে চেও না । আমি জানি না । হয়তো প্রতিশোধ

নিতে চেয়েছিলো। তুমি চলে যাবার পর অনেকদিন আমার সাথে কথা বলেনি। বাসা ছেড়ে চলে যায়। আমারই দোষ।"

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আলী। জীবনে এটাই তার প্রথম বড় ধাক্কা নয় কিন্তু এমন একটা কিছুর জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। "টিসা?" কৌতুহল চেপে রাখতে পারে না সে।

"ওদের দু'জনের।"

আনমনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে আলী। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসে। একাই। এসবের মধ্যে জড়াতে চায় না। জীবনকে অকারণে জটিল করতে তার ইচ্ছা হয় না। নিঃসঙ্গ আছে। সেভাবেই থাকবে। মাথার মধ্যে একটা ভোতা যন্ত্রণা শুরু হয়। কোন কিছু নিয়ে ভাবতেই আর ভালো লাগে না। এয়ারপোর্টে গিয়ে বিশেষ অনুরোধ করে আগের ফ্লাইটেই ফিরে যায় টরোন্টো। নিশির জন্য অপেক্ষা করে না। জীবনে এতোগুলো বছর এতো বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে সে যদি একাই পথ চলে থাকতে পারে এইটুকু পথও আসতে পারবে। আপাতত আলীর কিছুটা নিঃসঙ্গতা চাই, দূরত্ব চাই, নীরবতা চাই।

২৬

ছুটির দিনগুলোতে সময় একেবারেই থেমে যায় আলীর। ঘুম ভাঙতেই একটা ভয়াবহ উদ্দেশ্যহীনতা ওকে গ্রাস করে। অফিসে গেলে তবুও নানান কাজে কর্মে সময় কেটে যায়। সারাদিন বাসায় বসে সে কি করবে বুঝতে পারে না। একাকী হওয়ায় তার সামাজিক জীবন বলতে তেমন কিছুই নেই। মাঝে মাঝে মুভি দেখতে যায়। রেষ্টুরেন্টে যায়। কিন্তু একা একা কোন কিছুই জমে না। শুধু যে নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগে তাই নয়। মনে হয় সবাই যেন ওর দিকে করুণাভরে তাকিয়ে আছে। বিশ্রী অনুভূতি।

নভেম্বরের মাঝামাঝি। বেশ শীত পড়ে গেছে। রাতে ইতিমধ্যেই শূন্যে নেমে যায় তাপমাত্রা। বাসার মধ্যে হিটার চালাতে হয়। একটু পর পরই ভোস ভোস করে গরম বাতাস উগড়ে দিচ্ছে ফার্নেস। পাতলা চাদরের নীচে আরামদায়ক একটা উষ্ণতায় শুয়ে থেকে আলস্যভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় আলী। রোদ ঝরা সুন্দর একটা সকাল। কিন্তু তার মাঝেই তুষার পড়ছে। লাফ দিয়ে উঠে বসে ও। এ বছর বোধহয় এটাই প্রথম তুষারপাত। বাইরে তাকিয়ে মুগ্ধ হবার পালা। সবুজ ঘাসের উপর ইতিমধ্যেই বেশ পুরু করে শ্বেতধবল তুষারের আস্তর পড়েছে। গাছপালায় তুলোর মতো থাকে থাকে জমছে তুষার। সে দৌড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ঠান্ডা। দ্রুত ভেতরে ঢুকে একটা ফ্লানেলের শার্ট চাপিয়ে আবার বাইরে আসে। হাত বাড়িয়ে তুষারের স্ফটিকগুলো ধরার চেষ্টা করে। ওর হাতের তালুতে পড়ে কিছু গলে যায়, কিছু ঝরে পড়ে। মুখে, মাথায় মায়ের শীতল হাতের ছোঁয়ার মতো পরশ বুলিয়ে যায়। বানুকে মনে পড়ে আলীর। সে-ও তুষার খুব পছন্দ করতো। মাঝে মাঝে খালি পায়েই তুষারে হাঁটতে বেরিয়ে পড়তো। ধমক দিয়ে ফেরাতে হতো। দু'নিমিটেই ঠান্ডা লেগে যাবে। হাইপোথারমিয়া হবে। বুট কিনে দিয়েছিলো আলী। স্নো বুট। মোটা উঁচু বুট, কিন্তু পরতে চাইতো না বানু। রাগ করে পরাতে হতো।

ফোনটা বাজছে। শনিবার সকালে কে তাকে ফোন করবে?

অনেক সময় ওর টিমের লোকজন কাজকর্ম করে। সমস্যায় পড়লে তারা ফোন করে। কিন্তু তারা সবসময় ওর ব্লাকবেরিতে করে। ল্যান্ড লাইনে ফোন করবার মানুষ বেশী নেই আলীর।

পরপর চারবার রিং হয়ে আনসারিং মেশিনে চলে যায়। আলী ধরে না। মেসেজ রাখুক। অনেক সময়েই ফালতু ফোন আসে। এটা সেটা বিক্রি করার চেষ্টা করে। তারা কখনো মেসেজ রাখে না। মেসেজে চলে যেতেই লাইন কেটে গেলো। ফালতু কেউ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরোও কিছুক্ষণ তুষার নিয়ে খেলে আলী। হঠাৎ করেই নিশির কথা মনে হয়। মায়ামী থেকে ফিরে আসার পর একবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি আলী। নিশির অতীত নিয়ে সে যে ভয়ানক আহত, তা নয়। মাঝ বয়সে এসে অনেক কিছুই আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। যা করেছে সেটা কেন করেছিলো নিশিই জানে। আলী তখন তার জীবনে ছিলো না। সুতরাং রাগ, অভিমান কিংবা অনুযোগ করবার কোন কারণ আলীর নেই। তবে সে যতখানি নিশ্চিত মনে এগিয়ে যাচ্ছিলো সেই দৃঢ়তায় তার কিছুটা কমতি হয়েছে। নিজের অজান্তেই নিশিকে সে অনেক উঁচু আসনে বসিয়েছিলো।

ভুলে গিয়েছিলো আর পাঁচজন মানুষের চেয়ে ভিন্ন হবার কোন কারণ নিশির নেই। দুঃখে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় সেও অভাবনীয় কাজ করতে পারে। আলী বোঝে না আবার কিভাবে নিশির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কি কথা বলবে। নিশি যদি নিজ থেকে যোগাযোগ করতো তাহলে সুবিধা হতো। কিন্তু নিশি কিংবা তার মামা-মামী কেউই যোগাযোগ করেনি। সম্ভবত তারা ধরেই নিয়েছে, যা করার আলীকেই করতে হবে। বল এখন তার কোর্টে। কি করবে? আলী জানে না।

ফোনটা আবার বাজছে। একবার, দু'বার, তিনবার। লাইন কেটে গেলো। ধরে নি আলী। কেউ মেসেজ রাখলে সে বুঝতে পারে। গলা শুনে ফোন ধরে।

তুষারের গতি সামান্য বেড়েছে। বেশ কিছু বাচ্চারা মোটা পোশাক শরীরে চড়িয়ে বুট পায়ে বেরিয়ে গেছে। তুষার সব বাচ্চাদের প্রিয়। কয়েকজন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। বাবা-মায়েদের জোর ধমকেও কাজ হচ্ছে না। আপনমনে হাসে আলী। বাতাসে অপূর্ব এক হৃদ্যতার ছোঁয়া। প্রকৃতি কত সহজে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে তুষার হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হঠাৎ করেই যেন তার ভেতর থেকে ক্ষোভ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উবে গেছে। দার্শনিক হয়ে উঠতে ইচ্ছা করছে। জীবনটাকে এতো জটিল করে তোলার কি প্রয়োজন? ক'দিনরেই বা জীবন? তার সমগ্র জীবন এক লহমায় মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে। কত সহজ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেছে, কত সাধারণ পরিস্থিতি অকারণে জটিল হয়ে উঠেছে। জীবন যেমনটি হতে পারতো তেমনটি হয় নি। সময় পেরিয়ে গেছে। অর্থহীন সব জট খুলতে খুলতেই সোনালী দিনগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। ক্যাডেট কলেজের প্রিয় বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ট বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। অনেকেই দেশে আছে, বাকীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুনিয়াময়। ইমেইলে যোগাযোগ হয়। কিন্তু দূরের সেতু ভেঙে সেই আগের মতো ঘনিষ্টতা আর অনুভব করা যায় না। আলী পারে না। তার সগীরকে মনে পড়ে। গভীর রাতে রস চুরি করতে যাবার কথা মনে পড়ে। কুহুর কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে হয় সগীরকে ফোন করে জানতে চায়, "কুহুর কথা মনে আছে রে তোর? তোকে দেখলে ডেকে উঠতো।"

সব মানুষেরই ভালোবাসা চাই; প্রাণ থেকে, জড় হোক, পাখী হোক, পশু হোক-অন্তরঙ্গতার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সত্য আর মিথ্যার যাচাই করবার নিরংকুশ ক্ষমতা কার আছে?

ফোনটা আবার বজছে। নিশ্চয় কেউ আলীকেই চাইছে। ভেতরে ঢুকে ফোনটা ধরলো আলী।

"তুমি ফোন ধরছো না কেন, আংকেল?"

টিসা। নিজের অজান্তেই আলীর সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। "কেমন আছো, মা?"

"অনেক জ্বর হয়েছিলো। সারা সপ্তাহ বাসায়। খুব বোর্ড হয়েছি।"

"আগে জানলে দেখতে আসতাম।"

"চেয়েছিলাম। মামনি মানা করলো।"

"কেন?

"বললো তুমি রাগ করবে। মায়ামীতে কিছু হয়েছিলো?"

"মামনি কিছু বলেছে?" আলী সতর্ক কণ্ঠে বলে।

"নাহ্। তবে ফেরার পর থেকেই প্রত্যেকদিন রাতে খুব কাঁদে। আমি জানি। বুঝতে দেই না। তুমি বলে দিও না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে আলী। কিছু বলে না।

"তুমি জানো মামনি কেন কাঁদে?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। কথা দিচ্ছি।"

অন্যপ্রান্তে ক্ষণিকের নীরবতা। "ঠিক হলেই ভালো। মামনির কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়।"

"তোমার ঘুমটাই বড় হলো?"

খিল খিল করে হাসে টিসা। "তোমরা ঝগড়া করবে আর আমার ঘুম নষ্ট হবে। কেন?"

"তোমার মামনি কোথায়?"

"কাজে গেছে। ওয়াল মার্টে। ফিরতে এখনও ঘন্টা দুয়েক। বাইরে কি সুন্দর তুষার পড়ছে। খুব বের হতে ইচ্ছা করছে। তুমি আসবে আংকেল? আমরা স্লাইডিং করতে যাবো।"

আলী ঝট করেই রাজী হয়ে গেলো। অনেক সুযোগ হারিয়েছে আর নয়। মান-অভিমানের পালা শেষ।

বেরিয়ে যাবার আগে বানুর ঘরে ঢোকে আলী। লোহার আলমারী খোলে। ভেতর থেকে ছোট একটা কাঠের বাক্স সযত্নে বের করে আনে। তালা খুলতে ভেতরে সাজিয়ে রাখা একটা চিরকুট এবং চিকণ একটা রূপার আংটি চোখে পড়ে। চিরকুটটা সে এর আগে বহুবার পড়েছে। আবার পড়ে। বানু চায়নি সে

বেঁচে থাকতে আলী সেটা পড়ুক। রূপার আংটিটা সযত্নে হাতে তুলে নেয় সে। আলতো করে হাতের তালুতে রেখে আবিষ্ট দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পনেরো বছরের এক তরুণী মেয়ের হাতের আংটি। মীর্যা বাড়ীতে কাজ করতে এসেছিলো। বানু ততদিনে ঐ বাড়ীর বউ হয়ে এসেছে। প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েটিকে শয্যাশায়ী করে ছোট মীর্যা। তাকে দ্বিতীয় স্ত্রী করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। সন্তান সম্ভবা হলো মেয়েটি। মীর্যা বাড়ীর বউ হবার স্বপ্ন পুরণ হয় না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মেয়ে বানু। সত্য জানতে তার বাকী থাকে না। মেয়েটাকে নিজ আঁচলের নীচে আড়াল করে রাখে সে। আশ্রয় দেয়, নিরাপত্তা দেয়। প্রসবকালে অকাল মৃত্যুতে ঝরে পড়ে তরুণী মা। মীর্যা বাড়ীর কেউ চায়নি শিশুটিকে। দূর কোন গ্রামে এতিম খানায় ফেলে দিয়ে আসার হুকুম আসে বড় মীর্যার কাছ থেকে। সেই হুকুমের বিরোধীতা করার ক্ষমতা রাখে শুধু একজনই - বানু মীর্যা। বাড়ী সমেত সবাইকে খাবারের সাথে ধুতরার বিষ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে শিশুটিকে নিয়ে বাড়ী ছাড়ে সে। কেন কে জানে? হয়তো তরুণী মাকে সে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। হয়তো শিশুটির দর্শনে তার হৃদয়ে কোন এক অবোধ ভালোবাসায় বুঁদ হয়ে গিয়েছিলো। তার হাত ধরেই শেষ নিঃশ্বাস ছেড়েছে। রূপার এই আংটিটা বানু রেখে দিয়েছিলো আলীর হবু বউয়ের জন্য। পিয়াকে সে কখনও হৃদয় থেকে গ্রহণ করেনি। তার কোন অপরাধ ছিলো না। সে একটু শীতল ছিলো কিন্তু তার হৃদয়ে কোন ক্ষুদ্রতা কিংবা রুঢ়তা ছিলো না। কিন্তু বানুকে সে জয় করতে পারে নি। এই আংটি বানু সরিয়ে রেখেছিলো স্পর্শ কাতর, অভিমানী একটা মেয়ের জন্য। কোথাও বলা নেই, লেখা নেই, কিন্তু আলী জানে।

তুষার ভেজা পথে গাড়ী চলে ধীরে। কিন্তু বিরক্ত হয় না আলী। জীবনে এই প্রথম দ্বিধাহীনভাবে ছুটেছে সে। গন্তব্য তার জানা, উদ্দেশ্য তার পরিষ্কার। নিজেকে তার মুক্ত মনে হচ্ছে। ঠিক বেঠিকের দোলায় দুলতে দুলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ভেতরটা যেন অদ্ভুৎ রকম হাল্কা হয়ে গেছে। গাড়ী ধীরে চলুক, ক্ষতি নেই। গন্তব্যে পৌঁছালেই তার চলবে।

কম করে হলেও ত্রিশ চল্লিশ ফুট উঁচু হবে টিলাটা। তুষার পড়ে তার ঢালু শরীরটা পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। বাচ্চারা নানান জাতের নানান আকারের স্নো স্লেড নিয়ে সাঁই সাঁই করে পিছলে নামছে। বড়রাও মাঝে মাঝে তাদের সাথে জোট পাকাচ্ছে। বাতাসে শৈত্যতা থাকলেও যন্ত্রণাদায়ক নয়। চিৎকার, চেঁচামেচি, উৎফুল্লতায় চারদিক ভরপুর। টিসা একা যেতে রাজী নয়। ফলে আলীকেও তার সাথে পিছলে নামতে হচ্ছে। গতি বাড়ার সাথে সাথে তুষারের কণাগুলো ছিটকে চোখে মুখে এসে পড়ে, শির শিরে একটা

অনুভূতি হয় । ওরা দু'জনে অকারণেই গলা মিলিয়ে হেসে ওঠে । অনেকখানি গড়িয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে স্থির হয় স্লেড । সেটাকে বয়ে হাঁটতে হাঁটতে উপরে উঠে আসতে হয় । আবার পিছলে নেমে যাওয়া ।

নিশিকে দূর থেকেই দেখতে পেলো আলী । ঢালের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে সে । মোটাসোটা জ্যাকেটের নীচেও ঠান্ডায় কাবু হয়ে আছে । ঠান্ডা সবার সহ্য হয় না । ঢাল বেয়ে উপরে উঠে আসে আলী এবং টিসা । নিশির পাশে এসে দাঁড়ায় । চোখে চোখ রাখে না নিশি । আলীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ।

"মামনি আসো । আমরা তিনজনে যাবো ।" টিসা ডাকে ।

নিশি মাথা নাড়ে । "আমার ভয় করে ।"

আলীী যায় না । জোর ঠেলা দিয়ে টিসাকে নিম্নমুখী পাঠিয়ে দিয়ে নিশির পাশে এসে দাঁড়ায় ।

"ওভাবে চলে আসাটা আমার ঠিক হয়নি ।"

নিশি এখনও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় । কিছু বলে না ।

"টিসার বাবা?"

"নেই ।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকে আলী । "রুবী?"

"ও শক্ত মেয়ে । অসুবিধা হবে না । টরোন্টো আসতে চায় ।"

হেসে ফেললো আলী । "আবার চারজন?"

ফিক করে হেসে ফেলে নিশিও । চোখে চোখ রাখে । "তোমার সাথে আবার দেখা হবে, কখনো ভাবিনি । জানলে হয়তো সবকিছু অন্য রকম হতো ।"

শ্রাগ করে আলী । "অন্য রকম হলে ঐ দুষ্ট মেয়েটাকে কোথায় পেতাম?"

টিসা উপরে উঠে আসছে । দূর থেকেই হাত নাড়লো । আলী দু'হাত নাড়লো প্রত্যুত্তরে ।

নিশি নীচু গলায় বললো, "শুধু টিসাকেই চাও?"

মুচকি হেসে পকেট থেকে রূপার আংটিটা বের করলো আলী । "মা এটা তোমার জন্যে রেখে গেছে । চাও?"

নিশির দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে লুকানোর চেষ্টা করে না। হাত বাড়িয়ে দেয়। আলীর দু'কান লাল হয়ে ওঠে আচমকা। ঝট করে নিশির অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দেয় সে। টিসা মাঝ পথে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘটনাটা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে ফোকলা গাল নিয়ে বিশাল এক টুকরো হাসি দেয়। তার সমস্ত মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে আসে এক ঝাঁক শ্বেতশুভ্র হাঁস। সশব্দ আর্তনাদে আর পাখার ছন্দময় কাঁপনে সবাইকে চমকে দিয়ে ব্যস্ত গতিতে উড়ে যায় তারা। নিশ্চয় দক্ষিণে চলেছে। শীত থেকে দূরে, উষ্ণতায়।

মাঝের দূরত্বটুকু পেরিয়ে আলীর শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায় নিশি। ওর কাধে আলতো করে মাথা রাখে। কিছু বলে না। লাজুক হাসিতে উদ্ভাসিত টিসা আবার সওয়ার হয়েছে তার স্নো স্লেডে, সাবলীল গতিতে পিছলে নেমে চলেছে সেটা। দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে সে , বাতাসে তার চুল উড়ছে।

নিশি বললো, "আবার পালাবে না তো?"

আলী আলতো হাসলো। "পালানোর জায়গা নেই। পিঠ ঠেকে গেছে।"

সমাপ্ত